বিষয়।		লেখক।	পৃষ্ঠা

দিনাজপুর পত্রিকা সংক্রান্ত নিয়মাবলি।

১। পত্রিকা প্রতি বাঙ্গালা মাসের মাঝামাঝি মোতাবেক প্রতি ইংরাজী মাসের শেষে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশের ২ সপ্তাহ মধ্যে তাহা না পাওয়া গেলে গ্রাহক মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকা কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

২। পত্রিকাতে দিনাজপুর জেলার সমস্ত দেওয়ানী ও সার্টিফিকেট আদালতের সকল স্থাবর নীলামী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। দেউলিয়া সাব্যস্তের বিজ্ঞাপনও পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়।

৩। পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ ডাকমাশুল সহ ১।৵, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। পত্রিকার মলাটে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে, ব্যারিং বা ইনসাফিসয়েণ্ট পত্র গৃহীত হইবে না। পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের হার প্রকাশককে লিখিয়া জানিতে হইবে। পত্রিকাতে প্রকাশ উদ্দে[illegible] প্রবন্ধাদি ঐ নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীমহাম্মদ ইসহাক
পত্রিকা প্রকাশক।

দিনাজপুর পত্রিকা।

(মাসিক)

২৭শ ভাগ

সপ্তবিংশতি ভাগ { আশ্বিন ১৩২৬। } ১ম সংখ্যা

কণ্ঠহার।

---**---

একমাত্র পুত্রকে লইয়া যখন নবদুর্গা বিধবা হইলেন, তখন ননী গোপালের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। তিনি অকস্মাৎ আপনার গৃহের গৃহিণী এবং বিষয় আশয়ের একমাত্র কর্ত্রী হইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞাতি ভাসুর চন্দ্রনাথ ভ্রাতৃ বিয়োগে ব্যথিত হইয়া বধুমাতার বিষয় সম্পত্তি ও সংসারের তত্ত্বাবধানের ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন, নবদুর্গা তাঁহার পরোপকার ইচ্ছায় উৎসাহিত না হইয়া বলিলেন "আশীর্ব্বাদ করুন আমার ননী বাঁচিয়া থাক, আমার কর্ত্তব্য কার্য্যে যেন ত্রুটী না হয়, তাহাকে যেন মানুষ করিতে পারি, যখন ঠেকিব আপনার পরামর্শ মত কার্য্য ক[illegible] এখন কিছুদিন আমিই চালাইয়া দেখি।" চন্দ্রনাথ সন্তঃ বিধবার [illegible]স এবং আস্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য

বোধ করিলেন, মুখে বলিলেন "তা বেশ তো" মনে মনে বলিলেন " দেখা যাক।"

নবদুর্গার স্বামী কিছুই সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই, তখনকার দিনে সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি কাহারো হইত না, সঞ্চয়ের আবশ্যকতাও তত ছিল না, জমীতে আবশ্যকীয় সমস্ত ফসলই প্রচুর উৎপন্ন হইত, বাগানে তরিতরকারী হইত, পুখুরে মাছ ছিল, গরুর দুগ্ধ ছিল সুতরাং পেটের চিন্তা কাহারো তত ছিল না, যাহা কিছু আয় হইত পূজা পার্ব্বণ, ব্রাহ্মণ সেবা, অতিথি সৎকার, পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেই সমস্ত ব্যয় করা হইত। স্ত্রীকে অলঙ্কারে ভূষিত করার প্রবৃত্তিও কাহারো ছিল না। নবদুর্গার স্বামীর প্রকৃতি এখনকার দিনের লোকের মত হইলে তিনি অনেক সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেন, নবদুর্গার অলঙ্কারও বিস্তর হইত, কিন্তু সঞ্চয় দূরের কথা নবদুর্গা দেখিলেন তাঁহার কিছু দেনাই দাঁড়াইয়াছে, স্বামীর চিকিৎসায় ও শ্রাদ্ধে বিস্তর খরচ হইয়া গিয়াছে। সংসারের বোঝা ঘাড়ে লইয়া নবদুর্গা চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, ছেলেটিকে উপযুক্ত রূপে শিক্ষা দান করিতে হইবে, সংসারের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে এবং দেনাও শোধ দিতে হইবে, অথচ ভাশুর চন্দ্রনাথের চক্রান্তে আর অসম্ভব করিয়া গিয়াছে, ভাগের জমি হইতে আর পূর্ব্বের ন্যায় ফসল পান না, দেখিয়া বুঝিয়া লইবার লোক নাই, ভাগীদার অনুগ্রহ করিয়া যাহা দেয় তাই ভরসা, তাহারা এখন প্রায়ই ভাসুরের বাধ্য। উপায়ন্তর না দেখিয়া নবদুর্গা সংসারের পূর্ব্ব সম্মান রক্ষা করার আশা ত্যাগ করিলেন, কোন মতে পেট চালাইয়া ননী-গোপালের শিক্ষা যাহাতে ভাল রকম হয় তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিলেন।

ননী গোপাল মায়ের চেষ্টা এবং ভবিষ্য[illegible] উপলব্ধি করিয়া অতি

যত্নে এবং নিজের চেষ্টায় এল, এ পাশ করিয়াছে, এ পর্য্যন্ত পড়ার খরচের জন্য সে মাতাকে কোন দিন পীড়ন করে নাই বা ভাবিতেও দেয় নাই। নবদুর্গা এখন সদ্‌বংশজাত মনের মত একটী রাঙ্গা বধূ আনয়নের জন্য বড়ই চেষ্টায় আছেন, বহুদিন হইতেই কন্যাদায়গ্রস্ত অনেক ভদ্রলোক যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন, কোন স্থানেই নবদুর্গার পছন্দ হয় নাই, তিনি ছেলের বিয়েতে অর্থের আকাঙ্খা করেন না মনের মত একটী কন্যারই প্রত্যাশী। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে অনেক চেষ্টায় মনের মত একটী রাঙ্গা বধূ ঘরে আনিয়া ঘর আলো করিলেন। নিজের যে ২।১ খানা অলঙ্কার ছিল তাই একে একে পরাইয়া দিয়া বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, অলঙ্কারই বা এমন কি? সোণার মধ্যে মাত্র একখানি বড় নথ, রূপার বালা, রূপার পৈঁছা, রূপার কাটা তাবিজ, কোমরে রূপার চন্দ্রহার, পায়ে বাঁক, অলঙ্কার অতি সামান্য হইলেও তখনকার দিনে ইহাই মধ্যবিধ ভদ্রলোকের সম্মানিত চিহ্ন, সর্ব্বশেষে নিজ শাশুড়ী যে সোণার কণ্ঠহার ছড়া দিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন সেই কণ্ঠহার ছড়া বধূর গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন "মা ইহা আমার শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ ইহা কখনও ছাড়িও না সর্ব্বদা গলায় রাখিও।" বধূ গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নামেও লক্ষ্মী চেহারা খানিও ঠিক যেন লক্ষ্মীর মত, স্বভাব অতি নম্র, বড়ই মধুর, বড়ই লাজুক, নবদুর্গার যেমন আশা ছিল ভগবান তাহা পুরণ করিয়াছেন, বধূর স্বভাবে নবদুর্গা মুগ্ধা, বধূ সংসারের কাজ কর্ম্মে খুবই পটু বড়ই নিপুণ, শাশুড়ীকে আর কোন কাজেই যাইতে দেয় না, সকল কাজেই সে অগ্রগামিনী, শাশুড়ীর সেবায় সর্ব্বদা ব্যস্ত; কিন্তু লজ্জায় স্বামীর দিক দিয়াও ঘেঁসে না, রাত্রিতে সকলে না ঘুমান পর্য্যন্ত স্বামীর সম্মুখীন

হয় না, এও কি ননীর প্রাণে সয়? সে কালের ঘটনা হইলেও ননীগোপাল কলিকাতায় থাকিয়া অনেকটা বর্ত্তমান রুচির মত দাঁড়াইয়াছে, হাল রুচির পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রাণটী কবিত্বে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ননীগোপাল নিতান্ত অভাবে পড়িয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া অধ্যাপকের সাহায্যে কোন একটী আফিসে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছে, বেতনও ৫০৲ টাকা হইয়াছে, নবদুর্গার দুঃখ দূর হইয়াছে, আশার তৃপ্তি হইয়াছে, তখনকার দিনে ৫০৲ টাকা বেতনের চাকুরী অতি শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত চাকুরী। ননীগোপালের এতই খাটুনী, অবসর মাত্রও পায় নাই, ছুটীও নাই, সুতরাং বাড়ী আইসাও ঘটেনা, দুই বৎসর যাবত ননীগোপাল বাড়ী আসিতে পারে নাই আসিবার তত ইচ্ছাও নাই। বাড়ীতে তাহার শান্তি নাই, স্ত্রী রূপবতী গুণবতী হইলেও তাহার মনের মত হয় নাই, কথা বলিতে জানে না, হাস্ত পরিহাস জানে না, রঙ্গরস নাই, সর্ব্বদাই সঙ্কুচিতা নিতান্ত বোকা, লিখাপড়া শিখাইতে চাহিলে লজ্জায় বইখানা হাতেও লয় না, "ছি মেয়ে লোকের আবার লিখা পড়া কেন? মেয়ে মানুষ কি চাকুরী করিবে?" ইহার উপর দেখা শুনা তো প্রায়ই ঘটে না, রাত্রিতে যথাসময়ে ঘরে আইসে না, আহারান্তে শাশুড়ীর পদ সেবায় অনেক গৌণ হইয়া যায়, কোনদিন ননী-গোপাল ঘুমাইয়া পড়ে, কোনদিন বা জাগ্রত থাকে। এ হেন স্ত্রী লইয়া কি আকাঙ্খা মিটে? স্ত্রীর নির্ব্বাক সেবায় সে তুষ্ট হইতে পারে নাই, কেবল পায়ে তৈল মর্দ্দন, গায়ে মাথায় হাত বুলান পাখার বাতাসে কি তৃপ্তি হয়? এতদিন সে যত প্রকার সুখ স্বপ্ন কল্পনা করিয়া আসিয়াছে, যে রকম আকাঙ্খা পোষণ করিয়া আসিয়াছে এখন তাহার

সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া একটু ঘৃণা একটু বিরক্তিই তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, স্নেহ মমতা ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় বিদেশে বিশেষতঃ কলিকাতায়, যুবকের পক্ষে যাহা ঘটা সম্ভব ননীগোপালের তাহাই ঘটিয়াছে, বন্ধুদিগের স্বাস্থ্য পানের সভায় যোগদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, মনের স্ফুর্ত্তির জন্য, চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য গুপ্ত স্থানেও যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে ; এ সকল সংবাদ কখনও গোপন থাকে না, ক্রমে নবদুর্গার কাণেও এ সকল সংবাদ আসিতে লাগিল সুতরাং লক্ষ্মীর কাণে আসিতেও আর বেশী বিলম্ব হইল না।

নবদুর্গার কাতর সংবাদ পাইয়া ননী ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছে, মাতার সেবা শুশ্রূষায় দিন রাত্রি ব্যস্ত, যথাশক্তি চিকিৎসাও চলিতেছে কিন্তু রোগের বৃদ্ধি বই হ্রাস দেখা যাইতেছে না। নবদুর্গা নিজের অবস্থা ভাল ভাবেই বুঝিলেন, এ যাত্রা আর রক্ষা নাই, বাঁচিবার আর ইচ্ছাও তাঁর নাই, পুত্রের পরিণাম দেখিয়া আদরের বধূর পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি বড়ই চিন্তিত বড়ই শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, একদিন পুত্রের হস্তখানি অবগুণ্ঠনবতী বধূর হাতে রাখিয়া বলিলেন "মা, ননীর ভার সম্পূর্ণ তোমার হাতে দিয়া যাইতেছি, এ যত দোষী হউক যত কলঙ্কিতই হউক তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা, তা কখন ভুলিও না, আমার বিশ্বাস তোমার চেষ্টায় এ সৎপথে নিশ্চয়ই আসিবে।" ননীকে বলিলেন "বাবা, যে ধন তোমাকে দিয়াছি তার অযত্ন কখনও করিও না, তুমি যে কাচের জন্য হীরা ত্যাগ করিতেছ তাহা শুনিয়াছি, যদি সংসারে সুখী হইতে চাও ইহার যত্ন করিও, আমার বড় দুঃখ যে ইহাকে তুমি চিনিতে পারিলে না, তোমাকে 'আমার' আর বলিবার কিছু

বুঝি, সমস্ত বুঝিয়া লইবার উপযুক্ত তুমি হইয়াছ, তোমার পক্ষে যাহা ভাল বুঝিয়া চলিও।" দুই দিন পরে লক্ষ্মীকে কাঁদাইয়া ননীকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া নবদুর্গা অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মীকে লইয়া ননীর বড়ই বিপদ, রাখিয়া যাইবার স্থান নাই সংসারে কোন অভিভাবকই নাই, শ্বশুর বাড়ীতে লক্ষ্মীকে রাখিয়া যাইতে মনস্থ করিল। লক্ষ্মী কোন মতেই সম্মত নয়, সে আর কোথাও থাকিবে না। স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় যাইবার জেদ ধরিয়াছে, উপায়ান্তর না দেখিয়া জনৈক বন্ধুর সাহায্যে ক্ষুদ্র একখানি বাড়ী ঠিক করিয়া, বিবর আশ্রয় ঘরবাড়ীর একটা বন্দোবস্ত করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বে লক্ষ্মীকে লইয়া কলিকাতা চলিয়া গেল।

প্রথম কয়েকদিন ননীকে বেশ ভালই দেখা গেল, কোন রকম উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি দেখা গেল না, লক্ষ্মী প্রাণপণে স্বামী সেবায় ব্যাপৃত, কোন ত্রুটি যাহাতে না হয় সে দিকে প্রখর দৃষ্টি, কিন্তু তা হইলে কি হয়, ননীর খোলা প্রাণটি আর এই একঘেয়ে গণ্ডীর মধ্যে বেশী দিন আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইল না, কতক বন্ধুদের উপরোধে ও উৎপীড়নে কতক প্রাণের প্রবল টানে মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে ১২টা ১টার সময় বাড়ী ফিরিতে আরম্ভ করিল, কোন কোন দিন সম্পূর্ণ অনুপস্থিতও থাকিতে লাগিল. খালি বাড়ীতে একক অবস্থান করা লক্ষ্মীর পক্ষে কত বিপদজনক কতদূর কঠিন তাহা ননী একবারও ভাবিয়া দেখে নাই, ভাবিয়া দেখার অবসরও পায় নাই। গভীর রাত্রিতে ননী যখন বাড়ী ফেরে তাহার মুখের গন্ধে লক্ষ্মী সমস্ত টের পায়, কিন্তু স্বামী দেবতা তাঁহার সুখে কি বাধা দিতে আছে? ননী লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া শয়ন করে, লক্ষ্মী সমস্ত রাত্রি স্বামীর সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকে,

প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিতে থাকে, কেবল, তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া স্বামীর সেবা করিয়া চলিতেছে একদিনও তাহার হৃদয়ের গভীর বেদনা স্বামীকে জানিতে দেয় নাই। আজও ননী রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত অনুপস্থিত, লক্ষ্মী উদ্বিগ্ন চিত্তে বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে, প্রাণের ভীষণ জ্বালা আর সহ্য করিতে পারিতেছে না, এমন একটী লোক নাই যে লক্ষ্মীকে একটু শান্তনা দেয় উপদেশ দেয়, সহানুভূতি প্রকাশ করে। ননী আসিয়া কপাটে ঘা দিয়া বিকৃত স্বরে লক্ষ্মীকে ডাকিল, লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি কপাট খুলিয়া দেখিল স্বামী পূর্ণমাত্রায় মাতাল, কথা বলিবার শক্তি নাই দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই, লক্ষ্মী ধরিয়া আনিবার চেষ্টা করিল, ননী থাকিবার জন্য আইসে নাই, অর্থের অভাবে স্ত্রীর নথটী লইতে আসিয়াছে, লক্ষ্মী বিনা বাক্য ব্যয়ে নথটী খুলিয়া দিয়া রাত্রি টুকু থাকিবার জন্য বড়ই কাতর অনুরোধ করিল, প্রত্যুত্তরে অতি অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়া টলিতে টলিতে ননী চলিয়া গেল। লক্ষ্মী মেঝেতে পড়িয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, কোন্ পাপের ফলে তার অদৃষ্টের এই ভীষণ খেলা, এই ভীষণ পরিণাম, এই ভীষণ শাস্তি, সে জ্ঞানতঃ স্বামী সেবায় কখন কোন ত্রুটী করে নাই, তবে কেন তার স্বামী দেবতা এমন হইল, ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনই কূল কিনারা পাইল না। প্রভাতে উঠিয়া লক্ষ্মী যথারীতি সংসারের কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। ননী চোরের ন্যায় ভিতরে প্রবেশ করিয়া অতি করুণ দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া থাকিল, দেখিল লক্ষ্মীর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন নাই, কাতরতা নাই মলিনতা নাই, মুখে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে, লক্ষ্মী আপন মনে গৃহ কার্য্যে নিবিষ্টা। লক্ষ্মী হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া [illegible]

মুখ ধোয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, সংসারে স্বামীর সহিত বরাবর যে ভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে সেই ভাবেই চলিল, তাহার হৃদয়ের ব্যথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিল না। ননী স্তম্ভিত, অনুশোচনায় জর্জ্জরিত, একটী কথা বলারও সাহস নাই, অতি সঙ্কুচিত ভাবে লক্ষ্মীকে বলিল "লক্ষ্মী, আমায় ক্ষমা কর, আমি নরকের গভীর তলে যাইতেছি, আমাকে উদ্ধার কর" লক্ষ্মী আর কোন উত্তর করিতে পারিল না কেবল স্বামীর চরণধূলি মস্তকে স্থাপন করিল। আজ তার বড়ই আনন্দ স্বামী নিজের ভাল মন্দ বুঝিয়া লইয়াছেন, ভগবান তার কাতর ক্রন্দন শুনিয়াছেন।

লক্ষ্মীর অলঙ্কারগুলি ক্রমে ক্রমে সমস্তই এই ভাবে চলিয়া গিয়াছে কেবল দিদি শাশুড়ীর সেই আশীর্ব্বাদি কণ্ঠহার ছড়া বাকী আছে, তাহা লইবার সাহস ননীর এ পর্য্যন্তও হয় নাই, এ জন্য লক্ষ্মীর এক টুকুও দুঃখ নাই, কোন দিন একটু অনুশোচনাও হয় নাই, সে অলঙ্কারের প্রত্যাশী নয় সে স্বামীর আদরের স্বামীর সোহাগের একান্ত ভিখারিণী।

এখন ননী উপযুক্ত সময়ে আফিসে যায় উপযুক্ত সময়ে আফিস হইতে আইসে, চরিত্রে আর কোন দোষ দেখা যায় না, লক্ষ্মী সংসারে সুখের আলো দেখিতে পাইল। কিন্তু হায় কয়দিন? চরিত্রহীনের চরিত্র কি সহজে গঠিত হয়? ননীর চরিত্রে পুনরায় পূর্ব্ব অভ্যাসদোষ দেখা গেল, লক্ষ্মী প্রমাদ গণিল। তাহার সেবায় ত তার হৃদয়ের দেবতা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, সে ত নিজকে দেব সেবার উপযুক্ত ভাবে গঠিত করিয়া তুলিতে পারে নাই, [illegible] স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিত তবে ত তাহার স্বামী এরূপ হইত [illegible] চরিত্র কলুষিত হওয়ার প্রধান কারণ আপনাকেই সাব্যস্ত করিল

আপনাকেই দোষী স্থির করিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। হে ঠাকুর, বলিয়া দেও; আমায় পথ দেখাইয়া দেও কোন্ পথে চলিলে আমার হৃদয় দেবতার তৃপ্তি হয়, কোন সেবায় আমার হৃদয় দেবতা সন্তুষ্ট।

আজ রবিবার রাত্রি ১২টা বাজিতে চলিল ননীর কোন খোঁজ খবর নাই, শনিবার আফিসে চলিয়া গিয়াছে আর বাড়ী ফিরে নাই। লক্ষীর গোয়াস্তি নাই, আহার নাই নিদ্রা নাই, স্বামীর জন্য সে বড়ই উদ্বিগ্ন, বড়ই উন্মত্ত, চিন্তায় জর্জ্জরিত, এমন একটী লোক নাই যাহার দ্বারায় স্বামীর অনুসন্ধান করে। দিবা রাত্রি বাহিরের দরজার পাশে স্বামীর আশায় দাঁড়াইয়া পথ পানে চাহিয়া থাকে, রাস্তায় কতলোক যাইতেছে, কতলোক আসিতেছে, তার স্বামীকে ত দেখা যায় না, চক্ষের জলে তার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকিতেছে, হে ঠাকুর, আমার স্বামীকে আনিয়া দেও। কিছু দূরে রাস্তার আলোর পার্শে একটী লোকেরদিকে তার দৃষ্টি পড়িল, এ ত তাহারই স্বামী, এ কি ভীষণ অবস্থা, পরিধানের ধুতি ছিন্ন জামাটী ছিঁড়ে পায়ে জুতা নাই, উচ্চকণ্ঠে অসংলগ্ন ভাষায় এবং পাগলের ন্যায় কাহাকে গালি দিতে দিতে আসিতেছে, লক্ষীর উদ্বিগ্নতা অনেক পরিমাণে দূর হইল। মাতলামী করিতে করিতে ননী আসিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল, বমনের দুর্গন্ধে সমস্ত শরীর সমস্ত পরিধেয় জড়িত। তাড়াতাড়ি পরিস্কার করিতে লক্ষী ব্যস্ত হইয়া গেল, ননী পরিস্কৃত হইতে আইসে নাই সে অর্থের জন্য আসিয়াছে অতি অশ্লীল ভাষায় ধমক দিয়া লক্ষীকে নিবৃত্ত করিয়া তাহার কণ্ঠহার চাহিল, আজ তাহার অর্থ না হইলেই চলিবে না, মদের দোকানে বিস্তর বাকী দাঁড়াইয়াছে তাকার জন্য মদ বিক্রেতা যথেষ্ট অপমান করিয়াছে, এখনই টাকা দিতে না পারিলে আর বেশী অপমান

করিয়া টাকা আদায় করিবে, আর কখনও মদ দিবে না, মদ এবং অর্থ দিতে না পারিলে প্রণয়িনীর নিকটেও আর মান থাকে না। লক্ষী তার দিদি-শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদি চিহ্ন খুলিয়া দিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাতৃআজ্ঞা স্মরণ করিয়া দিল, ননীর এ সমস্ত আপত্তি শুনিবার সময় নাই শুনিবার আবশ্যকতাও তার নাই, আজ তার অর্থ চাইই, লক্ষীর অদৃষ্টে যা কোনদিন ঘটে নাই আজ তাই ঘটিল, অতি অভদ্রোচিত অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া পদাঘাতে লক্ষীকে ভূমিতে ফেলিয়া কণ্ঠহারটী খুলিয়া লইয়া টলিতে টলিতে চলিয়া গেল, লক্ষী অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিল। চৈতন্য পাইয়া লক্ষী পৃথিবী অন্ধকার দেখিল, প্রাণের উপর বড়ই ধিক্কার জন্মিল তার এই বৃথা নারীজন্ম নিতান্ত অসহ্য হইল যে নারীজীবনে স্বামীর তৃপ্তি নাই, যে নারী-জীবন স্বামীর নিকট উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত সে নারীজীবন থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল, আজ তার স্বামীর ব্যবহার মর্ম্মে স্পর্শ করিয়াছে, হৃদয়ে প্রবল আঘাত করিয়াছে, সে আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা লক্ষীর নাই, তাই লক্ষী জীবন রাখিবে না স্থির করিল। হঠাৎ শাশুড়ীর মৃত্যু শয্যার আজ্ঞা মনে পড়িয়া গেল, বিবেক গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল; একদিকে নিয়তির নির্য্যাতন অপরদিকে বিবেকের বিরোধ, একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছে আবার চিন্তার আশ্রয় লইতেছে। এখন আর তার চক্ষে জল নাই হৃদয়ের স্পন্দনের আঘাত অতি গুরুতর, শ্বাস প্রশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম, থাকিয়া থাকিয়া গভীর কম্পিত দীর্ঘনিশ্বাস যাহার হৃদয়ের অসহ্য জ্বালা উছলিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে, মুখ উগ্র, রিক্ত ও স্থির।

[illegible] মোহিনী মরচার মূর্ত্তি প্রকৃতিস্থ হইয়া ননী ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ

করিল, লক্ষীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল, লক্ষীকে আর চেনা যায় না, সোণার রং কালী হইয়া গিয়াছে চক্ষু কোটরে বসিয়া গিয়াছে, দুই দিনেই শরীর যেন জরাগ্রস্থ হইয়াছে, লক্ষীর মুখখানি দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, চক্ষের জলের প্রবল বেগ আর কিছুতেই থামাইয়া রাখিতে পারিল না। জতপদে যাইয়া লক্ষীকে কোলে তুলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, হৃদয়ের আবেগ একটু উপশম হইলে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "লক্ষী, অনেক-বার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি নাই এই শেষবার আমায় ক্ষমা কর, তোমার মাথায় হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর কখনও ও পথে চালব না, বল, লক্ষী বল, তোমার এই অকৃতজ্ঞ ঘৃণিত, মাতাল, চরিত্রহীন স্বামীকে ক্ষমা করিলে ?" লক্ষীর আক্ষেপ, চিন্তা, দুঃখ, লাঞ্ছনা ভাসিয়া গেল, তাড়াতাড়ি স্বামীর চরণধূলি ভক্তি সহকারে মস্তকে স্থাপন করিয়া বলিল "আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার সেবার উপযুক্ত হইতে পারি।" ননী অতি করুণ দৃষ্টিতে লক্ষীর পানে চাহিয়া থাকিল, লক্ষীর মূর্ত্তি এখন তাহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন, এ মূর্ত্তির নিকট সে সঙ্কুচিত, তাহার দৃষ্টি অবনত, প্রাণ শঙ্কিত, এ মূর্ত্তির নিকট দাঁড়াইতেও আজ তাহার সামর্থ্য নাই। হঠাৎ লক্ষীর গলার উপর তার দৃষ্টি পড়িল, গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা একে একে তার স্মরণ হইল অনুশোচনায় জর্জ্জরিত প্রাণটী বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল, প্রাণের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "লক্ষী, তোমার কণ্ঠ—হা—র ?" লক্ষী তার কোমল বাহুলতা দ্বারা স্বামীর কণ্ঠদেশ জড়াইয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল "এই ত আমার কণ্ঠহার।" এ কণ্ঠহার আর কখনও কেহ লক্ষীর গলা হইতে খুলিয়া লইতে পারে নাই।

তুমি।

(পূজার চাটনী)

—**—

পরাণের দোসর তুমি
কুটুম্বিনীর বোন্
যে যা বলে তুমি কিন্তু
নিতান্ত আপন

শ্যামের বাঁশরী যা
রাধিকার কানাই
তা হতেও বেশী মিষ্টি
যেন খাস্তা বালুসাই

যখন আসিলে ঘরে
ভাবিনু কি সন্দেশ
সাজায়ে রাখিনু শিরে
আ মরি কি বেশ।

তুমি দিলে কন্যা বর
আমি কিনু বিয়ে
তুমি খেলে লুচি পুরী
আমার শুক্‌না চিঁড়ে

প্রভাতে খাইয়ে ছুটী
বিদায় কর খাসা
পরে আরামে থেকে তব
পা ছড়িয়ে বসা

আমি যখন অন্ন চিন্তায়
মরি খেটে খেটে
তুমি তখন দিব্য সটান
নভেল নিয়ে হাতে
আমার জন্য তামাক টুকু
তা তোমার লাগে
পানে কিন্তু রাঙ্গা ঠোঁট
সদাই তোমার থাকে
তুমি পর রেশমী শাড়ী
আমার বেলা থান
কর্ম্মকারের দেনায় কিন্তু
শন্ন' জয়রাণ
টাকা পয়সা যা কিছু
দিয়ে আমি কৃতার্থ
খরচ পত্র গুলি সব
আমারই হিতার্থ
খেটে খুটে এনে দিতে
আমি নাকি সমর্থ
ম্যানেজ করবার বেলা
তুমি জবরদস্ত
ম্যানেজ করবার কলা
রুল কর জোরে
লাল রেখে ঠোঁটগুলি
কেঁদে মরি রাতে

কতকালের মুরুব্বী
ভাগ্যি এয়েছ ঘরে
তাই লুট খেতে পাচ্ছি
নইলে যেতাম মরে
ভেবে মরি সদা, যখন
আমি যাব মরে
এখানে তখন তুমি
গাইড্ করবে কারে
ঘরের মাঝে রাঙ্গামুখ
সাহেবের বাড়া
চাবীর ঝন্‌ঝনানীতে
কাণ হয় খাড়া ।

তুমি ।

—**—

তুমি কোন্ কাননের ফুল, কোন্ গগনের তারা, কোন নন্দনের পারিজাত ? অনেকদিন ভাবিয়াছি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু সুবিধা হয় নাই, অবসর হয় নাই । ঐ কথা মনে হইলেই আমি যেন কেমন একরকম হইয়া যাই । বল তুমি কে ? তুমি কি সুষুপ্তির সুখ স্বপ্ন না কর্ম্মহীন চিন্তাক্লান্ত জীবনের কুটিল কুহেলিকা ? কতদিন মনে হইয়াছে তুমি কে ? অনেক ভাবিয়াছি, চিন্তা করিতে করিতে আপনা হারাইয়াছি, কিন্তু আজিও তাহার অবসান হইল না । তুমি কোন্ স্বর্গের মন্দাকিনী—কোন নীরদের সৌদামিনী—কোন্ স্বপনের স্বপ্নরাণী ? বল তুমি কে ?

কে যেন একদিন স্বপ্নে আসিয়াছিল, নয়ন কোণে একটু হাসিয়াছিল । তুমি কি সেই ? কে যেন সেই দিন অর্দ্ধস্ফুটপুষ্প হইতে সৌরভের মত

ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় আমার কাণের কাছে কি যেন বলিয়া গিয়াছিল এখন আর তাহা মনে হয় না। আমি প্রাণপণ করিয়া কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বিস্মৃতির অন্ধকার যবনিকা আর উঠিল না। তুমিই কি সে দিন আসিয়াছিলে? সেই অত্যুজ্জ্বল আলোক রাশির দিকে আমি সে দিন নয়ন মেলিয়া চাহিতে পারি নাই। ঘন অন্ধকারের মধ্যে একবার বিদ্যুৎ হাসিলে যেমন অন্ধকার আরও বাড়িয়া উঠে, আমার হৃদয়ের অন্ধকারও তুমি তেমনি বাড়াইয়া দিয়াছ? কেন তুমি আসিয়াছিলে? যদি আর ফিরিয়া আসিবে না, তবে কেন অমন করিয়া চাহিয়াছিলে আমার কাণের কাছে, বসন্ত পূর্ণিমার চ্যুত মুকুল গন্ধবাহী স্নিগ্ধ মধুর মলয় পবনের মৃদু নিশ্বাসে শ্রান্ত কোকিলের প্রহেলিকাময় কণ্ঠের শেষতানের শেষ প্রতিধ্বনির মত—কি যেন কেমন সুরে তবে আশার গান গাহিয়াছিলে কেন?

তুমি কেমন? তুমি কে? তুমি কি শরীরী না অশরীরী? একদিন একবার মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলাম? কি দেখিয়াছিলাম কেমন দেখিয়াছিলাম তাহা আর মনে নাই। কেবল মনে আছে উজ্জ্বল আলোকের একটী অচঞ্চল সাগর, আর তারই মধ্যে কাহার যেন ছায়াময়ী মূর্ত্তি! যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা আমার উন্মত্ত হৃদয়ের কাল্পনিক স্বপ্ন কি বাস্তব জীবনের প্রকৃত সত্য, তাহা স্থির করিতে করিতেই ছায়া আলোক সাগরে মিশিয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না। তাই আজিও সন্দেহ হয় তুমি প্রকৃত সত্য কি কল্পনাময়ী তাই আজিও মনে হয় তুমি বুঝি প্রকৃত অস্তিত্বহীনা, তুমি ছায়াময়ী।

সুখময়ী উষারাণী তুমি। তাই বিহগের কলকণ্ঠে তোমার সঙ্গীতের আভাষ পাই। তুমি সুখ শান্তিময়ী প্রকৃতির জীবন্ত অনুকৃতি। তাই বুঝি,

নিদ্রালস শ্রান্ত প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য দেখিতে আসিয়া থাক ? তাই বুঝি তোমার সরল দৃষ্টি, তরল হাস্য, চঞ্চল মাধুরীময় ঘুমন্ত প্রকৃতিকে জাগাইতে আসিয়া থাক ? তুমি এমনি করিয়া আসিও ? আমি তোমার উজ্জ্বলে মধুর মিশ্রিত, শান্তে—গম্ভীরে বিজড়িত, প্রেম—প্রীতি বিমণ্ডিত ছায়াময়ী অথচ মোহিনী প্রতিমা আঁকিয়া মানস পুষ্পে থরে থরে মনের মত করিয়া সাজাইব। তুমি এমনি করিয়া আসিও আমি তোমাকে দেখিতে দেখিতে আপনা হারাইব। অয়ি শুভ্রমীহারমগুনী, প্রভাত পবনে তোমার সুচিক্কন সুন্দর শ্যাম অম্বর বিরাট বিশ্বব্যাপিয়া উড়াইয়া দিয়া উজ্জ্বল শুকতারার টীপ ভালে পরিয়া স্মিত বদনে তুমি এমনি করিয়া আসিও ? আমি ত বিহগকুল কূজনের সহিত সুর মিলাইয়া তোমার গান গাহিব।

তুমি সুর সিদ্ধ। তাই বুঝি "কুলকুল" করিয়া স্বর্গের গান গাহিয়া থাক আমি বড় ভালবাসি। ঐ দেব সঙ্গীত, ঐ বিশ্ব বিমোহন কোমল ভক্তি সঙ্গীত আমি বড় ভালবাসি। জাগ্রত স্বপ্ন বিধায়িনী, ঐ মহাসঙ্গীত তুমি কোথায় শিখিয়াছ, কে তোমার গানে এত প্রেম, এত স্নেহ, এত ভক্তি ঢালিয়া দিয়াছে, কে তোমাকে এত মধুর করিয়া গড়িয়াছে ? সাধ হয় বীণা লইয়া আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে গাহি "কুল্, কুল্, কুল্।" বীণা বাদনে আমার দুর্জ্জয় অনুপযুক্ততাকে ব্যাহত করিয়া আমিও ঐ গান গাহিতে গাহিতে সঙ্গীত স্রোতে ভাসিয়া যাই ? কুটিল মনুষ্যের কঠিন কথায় আমি ভয় করিব কেন ? আমিই গায়ক আমিই শ্রোতা। তবে আবার নর কটাক্ষে সঙ্কোচ কি ? তুমি কি আমাকে শিখাইবে না ? আমি নিজের চেষ্টায় পারিব না ?

কতদিন দেখিয়াছি কতদিন চন্দ্রকরবিধৌত, বীচিভঙ্গবহুল তোমার বিশাল বিরাট বক্ষে আমার সাধের ক্ষুদ্র তরণীখানি ভাসাইয়া দিয়াছি কিন্তু কৈ শিখিতে ত পারিলাম না। তোমার গানে যে কি ইচ্ছাশক্তি আছে তাহা বলিতে পারি না। ঐ সুর, ঐ গান, ঐ মোহিনী রাগিণী শুনিলে আমি আর কিছুতেই নিজের মন নিজের কাছে রাখিতে পারি না। কে যেন চুরি করিয়া লইয়া কোথায় কোন্ বিজনে পলাইয়া যায়। শুনিয়াছি এই সুন্দর জগতের আদি কারণ সঙ্গীত। যখন অণু, পরমাণু মিলিয়া ঘোর "দ্বন্দ্বযুদ্ধ" করিতেছিল যখন আলোক শীত গ্রীষ্ম সকলই একসময়ে একেবারে আপন আপন শাসন দণ্ডের অসঙ্গত চালনায় ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়াছিল, তখন একটা মহাসঙ্গীতের আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই সঙ্গীত প্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট হইল। সেই সঙ্গীত প্রভাবে আজিও এই নক্ষত্র প্রভৃতি আপন আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। আরও শুনিয়াছি যে এই সঙ্গীতেই আবার বিশ্বসংসার লয়প্রাপ্ত হইবে। তবে তোমার ঐ সুমধুর সুর তরঙ্গে আমি ভাসিয়া যাইতেছি কিন্তু একেবারে মিশিয়া যাইতে পারিতেছি না কেন ?

আমার একি হইল ? আমি যে দিকে চাই সেই দিকে দেখিতে পাই—তোমাকে নহে তোমার ছায়া প্রকৃতির পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে তুমি ? তবে আমি তোমাকে সেই স্বপ্নদৃষ্ট বলিয়া চিনিতে পারি না কেন ? বহুদিন গত সুদূর প্রবাসে মৃত কোন বন্ধুর মুখাকৃতির মত তোমার সকল কথা আমার মনে আসেনা কেন ? একটী অংশ মনে হইলে আর একটী ভুলিয়া যাই কেন ? তুমি কি বিস্মৃতিময়ী !

এত রূপ, এত লাবণ্য, এত জ্যোতি দিয়া তোমাকে কে গড়িয়াছিল ? দেবতার হৃদয়, প্রকৃতির গম্ভীর শান্তি, মল্লিকার সৌরভ দিয়া কুসুমের সৌন্দর্য্য চন্দ্রকরোজ্জ্বল রজনীর সহিত মাখিয়া নন্দন পারিজাত দিয়া কে তোমাকে সাজাইয়াছিল ? এত থাকিতে তুমি ছায়াময়ী, বিস্মৃতিময়ী স্বপ্নময়ী ! এত কাহার আছে, এত কাহার হইবে । দিগন্তব্যাপী, সুনীল সমুদ্রচুম্বী সুন্দর আকাশ চিত্রপট করিয়া বিধি তোমাকে অঙ্কিত করেন নাই কেন ? তাহা হইলে বুঝি সংসার আপনা ভুলিয়া যাইত । সংসার ছারেখারে যাউক, আমার বেদনা চঞ্চল ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তরঙ্গায়িত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত । সেই যে আমার স্বর্গ—সেই যে আমার সুখ—সেই যে আমার সমস্ত ।

আমি এতদিন বুঝিতে পারি নাই । এতদিন জানিতাম না মানুষ ছায়াকে আপনার করিতে পারে । এখন বুঝিয়াছি মনের আকর্ষণীশক্তি ও সংসার বিরক্তি অতিশয় প্রবল । এখন আকাশে মেঘ উঠিলে আমার বুকের ভিতর কিসের যেন একটা স্রোত চলিয়া যায়; নদী হৃদয়ে তুফান উঠিলে আমার অস্থিপঞ্জর যেন চূর্ণ হইতে থাকে, প্রকৃতি গম্ভীরা হইলে আমার নয়নে জল আসে । ছায়ার সহিত কি আপনার ললাটলিপি বাঁধিতে পারা যায়—ছায়া ধরিয়া কি আপনার শোককাহিনী গাহিতে পারা যায়—ছায়া কি জীবন্ত মানবের ক্ষত হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণা বুঝিতে পারে ? যদি তাহা না হইবে, তবে তুমি আমার কাছে থাক কেন ? আমার হৃদয়ে মেঘ আসিলে তোমার ললাট মসীময় হয় কেন ? আমি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে তোমার হৃদয়ে তুফান উঠে কেন ? আবার আমি হাসিলে তুমি পূর্ব্বের মত চিরশান্তিময়ী হও কেন ? আমার সহিত

তোমার কি সম্বন্ধ? তুমি ছায়াময়ী—স্বপ্ন, আমি শরীরী জীবন্ত সত্য। তুমি চরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছ আর আমি একটী ক্ষুদ্র পরমাণু। তবে তুমি আমার কে?

জানিনা তুমি আমার কে? কিন্তু আমার নিভৃত চিন্তার তুমিই রাণী, আমার সুখস্বপ্নের তুমিই অধীশ্বরী। তুমি আমার জাগ্রত স্বপ্ন—আমার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তোমাতে নিহিত রহিয়াছে। মানব জীবনের মধ্যাবস্থা পর্য্যন্তও সৃষ্টি কর্ত্তার উজ্জ্বল আলোক তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে জাগিতে থাকে? জীবন মধ্যাহ্নে উপস্থিত হইতে আমার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তাই বলিতেছি আমার সিতাংশু সমুজ্জ্বল হৃদয় সরসে তুমিই সিতাব্জ। ধীর পবনে তুমি ধীরে ধীরে দুলিও আমার হৃদয় সরসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা সৃষ্টি করিয়া তুমি দুলিও আমি দেখিতে দেখিতে জগৎ সংসার ভুলিয়া যাইব।

নিবেদন।

—**—

পরমেশ,

নক্ষত্র শোভিত চন্দ্রের মণ্ডল,
চারিপার্শ্বে ঘেরি আত্মীয় স্বজন,
করেছিল মোরে শোভিত সুন্দর॥
শ্রদ্ধা-ভক্তি স্নেহে তোমারি কৃপায়,
তুষিত সতত তাহারা আমায়,
ছায়া সম পাশে রহি নিরন্তর॥
কোনও অভাব পলকের তরে,
অনুভব কভু হয়নি অন্তরে,
নিরত লভিয়া স্নেহ অনুপম

সুধাংশুর ঐ শুভ্র জ্যোৎস্না প্রায়,
পরিপূর্ণ হৃদি ছিল সুষমায়,
কতনা মধুর কত মনোরম।
অমাবস্যা আসি দিলে দরশন
সুধাকর কোথা লুকায় যেমন
শূন্য করি ওই বিশাল গগনে
তেমতি হে দেব. নিয়তি বিপাকে,
চলে গেছে দূরে সবে একে একে,
একা ফেলি মোরে অশান্তি ভবনে॥
কোথা স্নেহাদর কোথায় যতন,
কেহ নাহি হায় জুড়াতে এখন,
যে দিকে নিরখি শূন্য চারিধার
প্রেম মন্দাকিনী গিয়াছে শুকায়ে,
হৃদয়ের দীপ কে দিল নিবায়ে,
ক্ষীণ আশা রেখা নাহিক আমার।
তাই আজি দেব অবসর পেয়ে,
তব পানে হৃদি আসিয়াছে ধেয়ে,
নিবেদিতে ব্যথা ও রাঙ্গা চরণে।
শূন্য গৃহ আর শূন্য চারিধার,
শূন্য মরমেতে রাজে হা হা কার,
তোমা ছাড়ি প্রভু র'হব কেমনে॥
নাহি আজি মোর সম্বল সহায়,
আঁখি ধারা যেন সরবস্ব হায়
আর বুককাটা স্মৃতিটী কেবল
তাই শুধু লয়ে দীরঘ জীবন,
কেটে যাবে কি গো বৃথায় এমন
জনম জীবন করিয়া বিফল॥

মা।

একবার মা মা বলে ডাক বদনে।
সব দুঃখ দূরে যাবে, সুখ শান্তি পাবে,
রবেনা আর ভয় শমনে ॥

মা যে রয়েছে সম্মুখে, দেখিস্ না নয়নে,
কথা কচ্ছে তবু শুনিস না শ্রবণে,
কোলে করে আছে বুঝিস না স্পর্শনে,
ভুলিয়ে রে মায়ার ছলনে ;

গলিত কুষ্ঠ কিম্বা বোবা খঞ্জ অন্ধ,
যার নামে আরোগ্য, নাইরে তা'তে সন্দ,
দেখেও বুঝলিনে রে, ওরে ভাগ্য মন্দ,
হারাইলি হেলায় রতনে ॥

দেবতা গন্ধর্ব্ব মুনি ঋষিগণে,
সদা যোগে মগ্ন যে নাম ধেয়ানে,
কেনবা রহিলি, ভুলিয়ে সে ধনে,
শরণ লও তাঁর চরণে,

দুস্তর সংসার করিবারে পার,
দয়াময়ী মা মোর স্বয়ং কর্ণধার,
পাপী তাপী যে লোক তারে করে পার,
এতই দয়া স্নেহ সন্তানে ॥

ডাকার মত যে জন ডাকে মা বলিয়ে,
তার কাছে কি আর থাকে লুকাইয়ে,
ধন্য হয় সে যে যার দেখা পেয়ে,
বরষে সুধাধারা পরাণে,
বন্ধু বলে যদি কেউ থাকরে আমার,
বন্ধুর মত কার্য্য করোরে এবার,
জিহ্বা কণ্ঠ যবে হইবে অসাড়,
শুনাইও মা নাম শ্রবণে ॥

—**—

হরিনাম।

মিছে কেন খুঁজে বেড়াস? "হরি কোথা মেলে।"
না ডেকে তাঁর দেখা পাবি, কোন্ পুণ্যফলে ॥
মাটিতে জন্মেনা সে যে, জন্মেনারে জলে,
গাছের ফল নয়রে সে যে, কুঁড়ায়ে পাবি তলে ॥
যতই কেন খুঁজিস না তায়
অনল অনিলে,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
আকাশ বিতলে ॥

বস্ত্র তন্ত্র মন্ত্র যোগে
অশেষ কৌশলে,
বস্ত্র গন্ধ পুষ্প কিম্বা
শ্রেষ্ঠ ভোজ্য দিলে ॥
এ সব পেয়ে স্নেহ ছেলে
কিছুতে না ভোলে,
(শুধু) সোনা দিন ফুরায়ে যায়
মিথ্যা গণ্ডগোলে ॥
বন্ধু বলে তারে পেতে
সাধ হয়ে থাকিলে,
(ডাক্‌না) একবার প্রাণ ভরে
হরি হরি বলে ॥
অমনি এসে দিবে দেখা
হৃদয় কমলে,
নয়ন মেলেও দেখবি তখন
হরি সকলস্থলে ॥

আমিত্বের প্রসার ।

এ বিপুল বসুধার বুকে
ক্ষুদ্র এক রচিয়া সংসার,
সুখে দুখে কাটাতাম কাল,
লয়ে মোর 'আমি' ও 'আমার' ।
হাসিতাম আপনার সুখে,

বিষাদে মুছিয়া অশ্রুজল
আপনারে দিতাম প্রবোধ
হইত হৃদয় সুশীতল।
কাঁদিয়া মরিত কেহ যদি
কিম্বা হর্ষে হইত উন্মাদ—
তারো দুঃখে দ্রবিত না হৃদি,
তারো সুখে হ'তনা আহ্লাদ,
'আমি' ও 'আমার' ছাড়া মোর
ভাবনার ছিলনা বিষয়;
বিশ্ব—পর, আমি—আপনার,
মরে পর, কিবা আসে যায়।
অকস্মাৎ প্রলয় বিষাণ—
শুনিয়া হইনু হতজ্ঞান;
মাথা দিয়ে বয়ে গেল ঝড়
সংসার হইল অন্তর্ধান।
জাগি যবে দেখি চক্ষু মেলি
'আমি' আর 'আমা' মাঝে নাই,
আমারে লয়েছে বিশ্ব বাঁটি
আমি ছাড়া নাহি কোন ঠাঁই।
দেখিলাম বিশ্বময়, আমি
আমি ময় এ তিন ভুবন;
আমি নাই গণনায় যারে
সেও এবে নিকট আপন!
উচ্চ নীচ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল,

আর্য্য ম্লেচ্ছ হিন্দু মুসলমান
পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম
আমিত্বের মহা অধিষ্ঠান ।
যে জন এখনো দৃষ্টি পথে
করে নাই শুভ পদার্পণ
কখনো করে না আশাক্রন্তি
ভাষা যার করিতে শ্রবণ ;—
তারো তবে হৃদে ডাকে বাণ
তারো কষ্টে কেঁপে উঠে প্রাণ ॥

আগমনী ।

—**—

এস গো জননী হৃদয়ে আমার
বল সবে দেখি ডাক একবার
এসেছে শরৎ এসেছে আবার
আনন্দময়ী আসিছে যে ওই ।

গাও দেখি সবে মিলি একতানে
গাও দেখি সবে মিলি প্রাণে প্রাণে
গাও সবে আজি মিলি এক স্থানে
করুণা করগো আনন্দময়ী ।

এই রূপে সবে গত এক দিনে
মিলেছিনু মোরা এই সে আশ্বিনে
গেয়েছিনু গান আনন্দিত মনে
সেই দিন আহা পেয়েছি ফিরে।
একটী বছর গিয়াছে চলিয়া
শরত আবার এসেছে ফিরিয়া
আনন্দের হাট গিয়াছে বসিয়া
আজি ভারতের সকল ঘরে ॥
এসেছিল মাতা এই সেই দিনে
কত না আনন্দ উঠেছিল মনে
কত শত আশা জেগেছিল প্রাণে
কত না প্রার্থনা জননী পায়।
সুদীরঘ এই বৎসরের মাঝে
ছয় ঋতু এল নব নব সাজে
কত না তরঙ্গ জীবনের মাঝে
কত না হ'ল জয় পরাজয় ॥
কত সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু জল
কতই হতাশা হৃদয়ের বল
কত না সৌভাগ্য বিপদ প্রবল
ঘটেছে জীবনে নাহিক সীমা।
আরও কতই ঘটিবে জীবনে
ভাল মন্দ কিবা কেহ নাহি জানে
বৎসরান্তে তবু মা'র আগমনে
হাসিবে হৃদে শান্তি মধুরিমা ॥

এই পাঠ গৃহে   মিলিয়াছি সবে
ছাত্র গুরুগণ   আজি সেই ভাবে
মা'র আগমনী   গাহিব রে এবে
মাসেকের তরে হ'তে ঠাঁই ঠাঁই।

এক মাস তরে   হবে নারে দেখা
এক ঠাঁই বসে   লেখা পড়া শেখা
বিদায় বিষাদে   তাই হর্ষ রেখা
আঁখিতে মিলেছে আজি সব ভাই ॥

এস সহপাঠী   এস ভ্রাতৃগণ
এস গাহি সবে   হ'য়ে এক মন
করি যোড় কর   সহাস্য বদন
শুভ আগমনী মহিমা গান ।

হরষে ভাসুক   ভূতল গগন
গিরি নদ নদী   বন উপবন
পশু পক্ষী কীট   যত জীবগণ
আনন্দে মাতুক সবার প্রাণ ॥

ওই শুন নদী   করে কল কল
বনে বনে গাহে   বিহগের দল
সরসী সলিলে   হাসিছে কমল
জননীর আগমনী প্রকাশি ।

ওই শুন ওই   বাজে ঢাক ঢোল
চমকিত করি   করি ঘোর রোল
শত কণ্ঠে ওই   শুন জয় রোল
আনন্দে ভাসে আজি বিশ্ববাসী ॥

এস গো চিন্ময়ী হৃদয় মন্দিরে
পূত করি হিয়া জ্ঞান বারি ধারে
পাপ রাশি মোর দূরীভূত, ক'রে
ভক্তি অশ্রু ধারে পুরায়ে আঁখি।

হৃদ্ সরোবরে ফুটাও অমল
জননী তোমার চরণ কমল
নাচুক হৃদয়ে প্রেমের হিল্লোল
হেরে পদ দুটি হইব সুখী॥

স্থানীয় সংবাদ।

দুর্ভিক্ষ রাণীশঙ্কৈল—প্রেরিত (২০শে ভাদ্র)।

দিনাজপুরের অন্তর্গত রাণীশঙ্কৈল থানার অধীন রাণীশঙ্কৈল, বাঁশবাড়ী, ভাণ্ডারা, বনগাঁও, জগাঁও, উত্তরগাঁও, নিয়ামপুর, পদমপুর, খঞ্জনা, দোশীয়া ও সদোর প্রভৃতি বহু গ্রামের অধিবাসীর ভীষণ অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। বাজারে চাউলের আমদানী নাই। ১৲ টাকায় চাউল /৩॥ সের /৪০সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। মজুরী খাটিয়া একটী লোকে উপার্জ্জন করে।/০ আনা তাহার যদি সংসারে ৩।৪টী পোষ্য থাকে তাহা হইলে তাহার চলে কি করিয়া ? ধানের জমীতে জল নাই বলিয়া কৃষকগণ বসিয়া ২ পেটের দায়ে হাহাকার করিতেছে। অনেক লোকের দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়াত দূরের কথা এমনকি এক বেলা ও ভরপেট আহার জুটে না। আজ শস্য-পূর্ণা বঙ্গভূমি একমুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল ! অনেক লোক অর্দ্ধাশনে

এমন কি অনশনে কাটাইতেছে। একে অন্নের অভাবে লোক কষ্ট পাইতেছে, তাহার উপর আবার বস্ত্রের দুর্মূল্যতা।

আমরা আশা করিয়াছিলাম যে বোধ হয় যুদ্ধ থামিলে কাপড়ের দর অধিকতর সস্তা হইবে। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে সে আশা এখন নিরাশায় পরিণত হইতেছে।

এবার অনাবৃষ্টিতে আউস ধান্য হয় নাই। যাহার যৎসামান্য হইয়াছে তাহা তাহাদের সঙ্কুলনের অযোগ্য বলিয়া কৃষকগণ ধান্য বিক্রয় করিতেছে না। ধানের ক্ষেতে জল নাই। জল অভাবে ধানের চারা রোপণ করিতে পারিতেছে না। যে কেহ যৎসামান্য রোপণ করিয়াছে তাহাও এখন জল অভাবে মারা যাইতেছে।

এখন সময় বুঝিয়া মহামারী, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। চিকিৎসার অভাবে অনেক লোক মারা যাইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত অন্নসংস্থানের ও চিকিৎসার কোন সুপ্রতীকার হইতেছে না।

পল্লীগ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে ক্ষুধার্ত্ত শিশুর আর্ত্তনাদ পুরুষের হাহাকার শব্দ শ্রুত হইতেছে। কোন সদাশয় ব্যক্তি ইহাদের দুঃখ দেখিয়া কখনই অশ্রু সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারেন না।

এই দুর্ভিক্ষে অনাহারে যে সমস্ত লোক অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের জঠর জ্বালা নিবারণ কল্পে রায়গঞ্জ হাই ইংরাজী স্কুলের সহৃদয় উদ্যোগী শিক্ষকবৃন্দ একটী দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেশের এরূপ হিতকর কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া আমরা সাতিশয় প্রীত হইয়াছি।

আশা করি সদাশয় গভর্ণমেন্ট ও দয়ালু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত পুত্রবৎ প্রজাবৃন্দকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিবেন।

রাণীশংকৈল থানার অন্তর্গত ভাণ্ডারা গ্রাম নিবাসী শ্রীগিন্ধিধারী জুগীর, ৯। ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্রসন্তান গত ১৭ই ভাদ্র বুধবার বেলা ৪টার সময় স্থানীয় কুলিক নদীতে মগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে। মৃতদেহ তৎপর দিবস পাওয়া গিয়াছে ।

মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান মহাশয়ের আহ্বান ক্রমে গত ১২ই ভাদ্র মিউনিসিপাল আফিসে সহরস্থ অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি সমবেত হয়েন । লোকের প্রধান খাদ্য চাউল, দিনাজপুর আর উৎপন্নের প্রধান স্থান, অথচ দিনাজপুরে মোটা চাউল ৯৬ ওজনের /৩ সের দরে, কোন কোন দিন /২॥০ সের দরে বিক্রয় হইতে থাকায় লোকের কষ্টের একশেষ হইয়াছে । মৌজুত চাউল যে বেশী এ জেলায় আছে তাহাও বোধ হয় না । ইহর প্রতীকার নির্দ্ধারণ করার জন্য ঐ সভার আয়োজন হইয়াছিল । কেরোসিন তৈল লইয়া কর্তৃপক্ষ যেরূপ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহারও অধিক চাউলের সম্বন্ধে দিয়াছেন। তাঁহাদের রিপোর্ট অনুসারেই সরকার বাহাদুর ধান চাউল আমদানী ও রপ্তানী নিয়মিত করিতে থাকেন । অন্নকষ্টক্লিষ্ট বহুলোক মাজিষ্টরীতে উপস্থিত হইয়া দুর্দ্দশা জানাইবারে। ফলে বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর যদিও চাউল রপ্তানী নিষেধের আদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু কমিশনার বাহাদুর তাহা অনুমোদন করেন নাই । এ দিকে ব্রহ্ম দেশীয় চাউল এথাতে আমদানী করার জন্য কতিপয় মহাজন আবেদন করিয়াছেন । শুনা যায় এক গাড়ী ব্রহ্মদেশীয় চাউল এথাতে আসিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন খোঁজই নাই, এক গাড়ী চাউলে বুভুক্ষা রাশিতে বিন্দুপাতের মত কি হইবে ?

যাহা হউক, ১৩ই ভাদ্রের সভায় কতিপয় মহাজন ক্ষতি স্বীকার করিয়া এক মাস কাল আতপ ৮০ ওজনের /৫ সের এবং উষ্ণা ১৬ ওজনের /৪ সের দিবেন প্রতিশ্রুত হয়েন। তদনুসারে তাঁহারা হাটে ঐ দরে দিতেছেন।

২০শে ভাদ্র বেলা সওয়া দশটার গাড়ীতে পুলিশের ইন্স্পেক্টার জেনেরেল মহোদয় দিনাজপুরে আগমন করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই দিনই কোতয়ালী থানা তাঁহার পরিদর্শন করার কথা ছিল। বেলা দুইটা পর্যন্ত অফিসার ও কনেষ্টবল সকলে উর্দ্দি পরিয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বৃষ্টির জন্য সে দিন ইনেস্পেক্টার জেনেরেল মহোদয়ের আইসা হয় নাই। তৎপরেও কয়েকদিন তিনি দিনাজপুরে ছিলেন, ইহার মধ্যেও কোতয়ালী থানা "পরিদর্শন" করার তাঁহার সাবকাশ হয় নাই।

২৩শে ভাদ্র শুক্রবার রাত্রি অনুমান ১০টার সময় পশ্চিমাঞ্চলের এক চক্ষুহীন একটী লোক গলায় গামছা বাঁধিয়া শ্রীশ্রী৺মশান কালী বাটীর পশ্চাদ্দিকের পুষ্করিণীতে ডুবিতেছিল এমন সময় শ্রীযুক্ত হেমপ্রসন্ন রায় প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক ঐ অবস্থায় জলে ডুবিতে দেখিয়া লোকটীকে উদ্ধার করেন এবং কোতয়ালী থানায় দেন। লোকটীকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিল যে উপর্য্যুপরি তিন দিন অনাহারে থাকিবার পর সে ঐ কার্য্য করিয়াছে।

লোকের কিরূপ খাদ্য কষ্ট হইয়াছে তাহা পরবর্ণিত ঘটনাতেই—প্রকাশ পাইবে। কালীতলার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসাতে একজন পশ্চিমাঞ্চলের লোক গিয়া অনুরোধ করে যে, খাদ্য,' খুদী ইত্যাদি যে কিছু

চুরীর অজুহতে তাহাকে থানায় দেওয়া হউক, সেজন্ত সে কিছুমাত্র কাহাকেও দোষী করিবে না, জেলে গিয়া তো পেটে খাইতে পাইবে। ইহার অপেক্ষা দুর্দ্দশার চরম আর কি হইতে পারে ?

২৭শে ভাদ্র বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর সভাপতি ছিলেন। ঢাকার ইনেস্পেক্ট্রেস শ্রীযুক্তা লীলাবতী ঘোষ পুরস্কার বিতরণ করেন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর ২রা আশ্বিন শুক্রবার বেলা ৪—৫০ মিনিটের ট্রেণে চিকিৎসার জন্ত কলিকাতায় গিয়াছেন। চৌরঙ্গী রোডে বাড়ী স্থির হইয়াছে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ জন্ত ষ্টেশনে বহুজন সমাগম হইয়াছিল। ভগবানের চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর সত্বর নিরাময় হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করুন।

২রা আশ্বিন দুই প্রহরের পরে যে মেঘ ও জল হয়, ঐ সময়ে লায়ন হিন্দু হোষ্টেলের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বজ্রাঘাত হইয়াছে। কোণের কুঠরীতে একটী ছেলে শুইয়াছিল তাহার কিছু হয় নাই, কিন্তু একটী ছেলে দাঁড়াইয়াছিল তাহার হাত কিছুক্ষণ অসাড় হইয়াছিল।

কতলোক অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিতেছে, তাহাদিগকে প্রত্যহ এক বেলা ধর্ম্মশালাতে খাওয়াইবার ব্যবস্থা জন্ত ৫ই আশ্বিন সন্ধ্যা বেলা ইনষ্টিটিউট গৃহ প্রাঙ্গণে গণ্য মান্ত অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বদিন হইতে ধর্ম্মশালাতে গরীবদের খাওয়ান হইতেছে, ৪ঠা আশ্বিন প্রায় ৮০ জন এবং ৫ই আশ্বিন প্রায় ১২০ জন লোক খাইয়াছে। [illegible] রক্ষার জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। মুষ্টিভিক্ষা

ও অর্থ সাহায্য সাদরে গ্রহণ করা হইবে। ছোটকুঠীর শ্রীযুক্ত শারণ দুগড় ধনাধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন।

সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে ট্রেণের সময়ের কতক ২ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ লাইনের প্রধান পরিবর্ত্তন বেলা ৩টায় পার্ব্বতীপুরের দিকে যে ট্রেণ যাইত তাহা বেলা ৪—৫০ মিনিটে ছাড়িতেছে। কলিকাতায় সকাল ৬—৪২ মিনিটে পঁহুছিতে হইলে এথা হইতে প্রায় ২ঘণ্টা বিলম্বে রওনা হইলেও চলিতেছে। ঐ ট্রেণে সিরাজগঞ্জ, গোয়ালনন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে যাইবার সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে রাত্রি ৮—৪৪ মিনিটে একখানি গাড়ী ছাড়িতেছে, তাহাতে ডাকও আসিতেছে এবং ঐ ট্রেণের যাত্রীরা দিনাজপুরে বেলা ১০টার পরে পহুছিতে পারিতেছেন।

৪—৫০ মিনিটের ট্রেণে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা নাই। তাহার ব্যবস্থা করার জন্য শ্রীযুক্ত পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়কে অনুরোধ জানাইতেছি।

একণে ৪—৫০ মিনিটের ট্রেণ বরাবর ফুলছড়ী ঘাটে যাইতেছে। ঐ পথে ঢাকা ময়মনসিংহ যাত্রীদের ৩ ঘণ্টা সময় বেশী লাগিতেছে। রাত্রি ৮ টার পরের ট্রেণ লালমণির হাট পর্য্যন্ত যাইতেছে। ফুলছড়ী পর্যন্ত আর যায় না। বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ লাইনের ও গোদাগাড়ী লাইনের যাত্রীদের খুব অসুবিধা হইয়াছে। কাটিহারে অনেক সময় বৃথা কাটাইতে হইতেছে। ৪—৫০ মিনিটের গাড়ীর সিলিগুড়ি লাইনের গাড়ীর সহিতও যোগ নাই। এবং সন্ধ্যা ৬টার পরে যে গাড়ী দিনাজপুরে আইসে তাহার সহিতও সিলিগুড়ির গাড়ীর যোগ নাই। টাইম টেবল প্রস্তুতের জন্য মোটা মাহিয়ানায় কর্ম্মচারী আছেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি কেবল কলিকাতার সুবিধা অসুবিধার দিকে বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

সর্ব্বসাধারণের বিশেষ অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে আমার এষ্টেট ও পারিবারিক ম্যানেজমেণ্ট করার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার নিজের কর্তৃত্বাধীনে আছে। কোনও ব্যক্তি আমি ব্যতীত আমার পুত্রদ্বয়ের সহিত অথবা অপর কাহারও সহিত আমার এষ্টেট সংক্রান্ত কোনও কার্য্য করিলে বা করিয়া থাকিলে অথবা অপর কাহাকেও টাকা ধার বা ধারে জিনিস পত্র দিলে বা দিয়া থাকিলে তাহা আমার উপর বাধ্যকর নহে বা হইবে না। ইতি—

শ্রীজগৎ চন্দ্র চৌধুরী—
জমিদার—
(রাজগঞ্জ) দিনাজপুর।
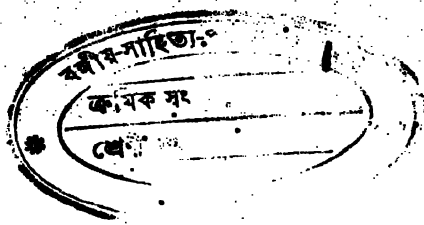
দিনাজপুর পত্রিকা।

(মাসিক)

সপ্তবিংশতি ভাগ { কার্ত্তিক ১৩২৬। } ২য় সংখ্যা

দিনাজপুর।

কোথায় রুক্মিণীকান্ত ভক্তমনোহর ?
কোথায় মন্দির তাঁর শোভার আকর ?
কোথায় প্রকৃতি হেন জুড়ায় নয়ন ?
দিনাজপুর বিনে আর কোথায় এমন।
প্রাচীন কীর্ত্তির হার শোভিত গলায়,
মহানন্দে মহানন্দা চরণে লুটায়,
মহীপাল গৌর আদি দীঘি অগণন,
দিনাজপুর বিনে আর কোথায় এমন।
ধীবর বাদল স্তম্ভ আর বাণগড়
প্রাণ সুখ-রাম-মাতা-আনন্দসাগর
ধল দীঘি, কাল দীঘি, আলতা তপন
দিনাজপুর বিনে কোথা আছে কি কেমন ?
কে, সি, আই, ই মহারাজা সাধু সদাশয়
রায় বাহাদুর সদা দীনের আশ্রয়,

মহর্ষি পণ্ডিতচূড়া ভুবনমোহন
দিনাজপুর বিনে আর কোথায় এমন ?
নেকমরদন মেলা, আলোখোয়া আর
নাহিক বঙ্গের মাঝে তুলনা যাহার
সুগন্ধি তণ্ডুল সরু চট সুচিক্কণ
দিনাজপুর বিনে আর কোথায় এমন ?
হিমাদ্রির উচ্চ চূড়া, বিন্ধ্যাচল শোভা,
কোথা হ'তে দেখা যায়, * সেই মনোলোভা ?
কোথাকায় থাকে রাখে ভারত জীবন ?
দিনাজপুর বিনে স্থান কোথায় এমন ?

—**—

বিমৃশ্য কারিতা ।

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া মবিবেকঃ পরমাপদাংপদম্ ।
বৃণুতে হি বিমৃশ্য কারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ ॥
(ভারবী)

অর্থ— সহসা কর্ত্তব্য নহে কার্য্যের সাধন,
অবিবেক হয় মহা আপদ কারণ ।
ধৈর্য্য ধরি চিন্তা করি যে জন আচরে,
সম্পদ সে গুণিজনে আশ্রয়ে সাদরে ॥

(প্রথম পরিচ্ছেদ ।)

পূর্ব্বকালে বারাণসী নগরে রামশর্ম্মা নামে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি তখন অদ্বিতীয় পণ্ডিত । তাঁহার বিদ্যায় ও গুণে মুগ্ধ

* দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার অন্তর্গত বুনিয়াদপুর হইতে হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলান্তর্গত রাজমহলের পাহাড় দৃষ্ট হয় ।

হইয়া রাজা সমাদরে ও সসম্মানে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। বহুদূর দেশান্তর হইতে বহু ছাত্র আগমন করিয়া তাঁহার নিকট নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করিত।

অনন্তদেব নামে তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিল। অনন্ত গুণে পিতার অনুরূপ ছিল। তাঁহার ন্যায় মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছাত্র প্রায় দেখা যাইত না এ দিকে বিনয়, নম্রতা, শিষ্টতা প্রভৃতি গুণেও সে অদ্বিতীয় ছিল। সুবিখ্যাত, অসাধারণ পণ্ডিত পিতার নিকট কঠোর পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিয়া অনন্ত তাঁহার পিতাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সুশাসনে সর্ব্বক্ষণ থাকায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ হইতেছিল। অনন্তের বিদ্যার সুখ্যাতি ইতিমধ্যেই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সকলের মুখেই তাহার প্রশংসা শুনা যাইত। সকলেই স্বীয় স্বীয় পুত্রগণকে অনন্তের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উৎসাহিত করিত। কিন্তু পিতার শাসন বড়ই কঠোর। তিনি সর্ব্বদাই তাহাকে তিরস্কার করিতেন। সামান্য অপরাধ পাইলেও গুরুদণ্ড দিতেন। কখনও ভাল মুখে তাহার সহিত কথা কহিতেন না। সর্ব্বদাই তাহাকে মূর্খ, অলস, অকর্ম্মা প্রভৃতি বাক্যে অভিহিত করিতেন। পুত্রের আহার, বিহার অধ্যয়ন প্রভৃতি বিষয়ক প্রত্যেক কার্য্যেরই কঠোর সমালোচনা করিতেন এবং তাহার দোষ বাহির করিয়া কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করিতেন। পুত্রও সর্ব্বদাই ভীত ও ত্রস্ত ভাবে পিতার আদেশ প্রতিপালন করিত এবং যাহাতে ভবিষ্যতে কোন প্রকার ত্রুটী বা দোষ না ঘটে তৎপক্ষে প্রাণপণে চেষ্টা করিত। রামশর্ম্মা পুত্রকে বিবাহ দিয়াছিলেন কিন্তু কখনও পুত্রকে বধূর নিকট যাইতে

না তাহার সহিত কথা বলিতে দিতেন না। অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় সাধারণ খাদ্য আহার করিয়া বহির্ব্বাটিতে কুশাসনে শয়ন করিয়া পুত্রকে রাত্রি যাপন করিতে হইত। সকলেই জানিত যে অনন্তদেব অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছে, এমন সুপুত্রের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার করায় অনেকেই রামশর্ম্মাকে নিন্দা করিত, কিন্তু তিনি সে সমস্ত শুনিয়াও গ্রাহ্য করিতেন না। লোকের নিকট সর্ব্বদাই পুত্রকে মুর্খ বলিয়া নিন্দা করিতেন। অনন্তদেবও পিতার কঠোর ব্যবহারে অনেক সময় ব্যথিত ও বিরক্ত হইত, কিন্তু অসাধারণ পিতৃভক্তি হেতু কোনরূপ উচ্চ বাচ্য করিত না।

একদিন অনন্তের কোন এক কার্য্য পিতার মনঃপূত হইল না। তাহাতে পিতা অনন্তকে যৎপরোনাস্তি কর্কশ ভাষায় বহুবিধ তিরস্কার করিলেন। তাহাকে মুর্খ, কুলকলঙ্ক, কুপুত্র প্রভৃতি নানারূপ দুর্ব্বাক্য বাণে জর্জ্জরিত করিলেন। অনন্ত, রামশর্ম্মার কোন তিরস্কার বাক্যের প্রতিবাদ কখনও করে নাই পিতা যাহাই বলুন না কেন সমস্তই অবনত মস্তকে সহ্য করিয়া থাকিত। অনন্ত বেশ বুঝিতে পারিল যে পিতা না বুঝিয়া অযথা এত তিরস্কার করিতেছেন। এজন্য অনন্ত পিতাকে বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়া দু একটী কথা বলিল। এই অপরাধে কৃতবিদ্য ও যুবক পুত্র অনন্তকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া রামশর্ম্মা তাহাকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিলেন। "প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ" এই বাক্যের মর্য্যাদা রামশর্ম্মা রক্ষা করিলেন না।

রাত্রে পিতা নামমাত্র আহার করিলেন। প্রহৃত ও বিতাড়িত হইয়া অনন্ত বাড়ীতে আসে নাই। অতিরিক্ত কঠোরতা প্রদর্শন জন্য পিতাও এক্ষণে অনুতপ্ত। অনন্ত কোথায় গেল, কি খাইল এ সমস্ত চিন্তা করায় রামশর্ম্মার আহারে ইচ্ছা হইল না অনন্তের অন্বেষণে তিনি শিষ্যগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কেহই তাহার দর্শন পায় নাই। রামশর্ম্মা পৌরগণের প্রবোধের নিমিত্ত মনোভাব গোপন করিয়া অন্য মনে যৎকিঞ্চিৎ আহার করতঃ উদ্বিগ্ন চিত্তে শয্যার আশ্রয় লইলেন। কিন্তু অনন্তের মাতা পুত্র স্নেহ বশতঃ কিছুই আহার করিলেন না। সকলকে ভোজন করাইয়া তিনি বিষন্ন মনে শয়ন করিলেন।

রামশর্ম্মা স্ত্রীকে বলিলেন "অনন্ত বাড়ী আসিয়া কোথায় গেল? সে হয় ত অনাহারেই রহিয়াছে। তাহার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন আছি।" স্ত্রী বলিলেন "তাহাতে আর আপনার কি হইল? অনন্ত খা'ক কি না খা'ক, বাড়ীতে আসুক কি অন্যত্র চলিয়া যা'ক তাহাতে আপনার কি? তাহাকে তো আপনি দেখিতেই পারেন না। শুনিতে পাই অনন্তের মত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র ছেলে এদেশে আর নাই। সকলের মুখেই সর্ব্বদা তাহার প্রশংসা শুনিতে পাই। তাহাকে গর্ভেধারণ করায় লোকে আমাকে রত্নগর্ভা বলিয়া কত আদর ও সম্মান করে। সকলেই তাহাকে কত ভালবাসে। কিন্তু আপনিই কেবল তাহাকে একেবারে দু চক্ষে দেখিতে পারেন না আপনি কখনও তাহার সহিত ভাল মুখে কথা বলেন না। সর্ব্বদাই তিরস্কার, অনুযোগ ও পীড়ন করেন। বাছা আমার ভয়ে ভয়ে দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া পাঠ করে, এতদ্ভিন্ন সাংসারিক সমস্ত কার্য্যই তাহাকেই নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাহার তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই।

অতিরিক্ত মন্থনে সমুদ্র হলাহল উদ্গীরণ করিল। অতিরিক্ত মর্দ্দনে শরীর হইতে ভয়ানক তিক্তরস নিঃসৃত হইল। রামশর্ম্মা যেরূপ কঠোর ব্যবহার করিলেন তাহাতে অনন্তের মন অপমান, ক্ষোভ ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না। সকলেই রাম-শর্ম্মার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিল সুতরাং নিরপরাধী, সুবিদ্বান সুচরিত্র এবং অনুগত পুত্রের প্রতি এইরূপ দুর্ব্যবহার জন্য সকলেই রামশর্ম্মাকে নিন্দা করিতে লাগিল এবং অনন্তের প্রতি সকরুণ সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। অনন্তের মন হইতে পিতৃভক্তি অন্তর্হিত হইল। ক্ষোভে, ক্রোধে, অপমানে অনন্ত প্রথমতঃ আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু পরে স্থির করিল পিতার প্রাণসংহার করিয়া পরে আত্মপ্রাণ নষ্ট করিবে। ক্রোধ বিকট মুখব্যাদান করিয়া অনন্তের পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিল এবং অনন্তকেও রাক্ষসরূপে পরিণত করিল। হায় ক্রোধ, তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই! তোমার প্ররোচনায় এই পৃথিবীতে অহরহ যে কত দুষ্কার্য্য সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তোমার হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। কত সাধু, সন্ন্যাসী, মুনি, ঋষিও তোমার কবলে পতিত হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন।

অনন্ত পিতার প্রাণসংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। তাহার আর অন্য বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছে। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল। রাত্রির অন্ধকারে পিতৃহত্যা করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিয়া সন্ধ্যার পর গোপনে পিতার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া কোন এক নিভৃত স্থানে লুক্কাইত হইয়া রহিল। অভিপ্রায় পিতা শয়ন করিলে সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে।

যখন যে আদেশ করেন সে প্রাণপণে তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকে । সাধ করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলাম, কিন্তু একদিনও পুত্র ও পুত্রবধূকে একত্র দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পারিলাম না । এত বড় ছেলে, আজ কিনা আপনি তাহাকে প্রহার করিলেন । বাছা আমার মনোদুঃখে গৃহত্যাগ করিয়া গেল । আজ আপনাকে সকলেই নিন্দা করিতেছে । আমি অভাগিনী, আমার মরণ হইলেই বাঁচি ।" এই বলিয়া অনন্তের মাতা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ।

রামশর্ম্মা পত্নীর খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন "দেখ, তোমরা মনে কর আমি অনন্তকে দেখিতে পারিনা ; অনন্ত আমার দু চক্ষের বিষ । কিন্তু বাস্তবিক ইহা তোমাদের বিষম ভ্রম মাত্র । আমি জানি অনন্তের ন্যায় সন্তান বহু পুণ্যফলেই প্রাপ্ত হইয়াছি । অনন্তের মত ছেলে এদেশে হয় নাই হইবার সম্ভাবনাও নাই । সে বিদ্যায় আমাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । তাহার চরিত্রবল অসাধারণ । সে সমস্ত সদ্গুণেই অলঙ্কৃত হইয়াছে । তাহার পিতা বলিয়া আমি নিজকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করি । কিন্তু আমি যে তাহাকে সর্ব্বদা তাড়না করি এ কেবল তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত মাত্র । ঐ রূপ তাড়না না করিয়া প্রশ্রয় দিলে তাহার এত উন্নতি হইত না ; সে এখনই এ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইয়াছে আর কিছুদিন এই ভাবে চলিতে পারিলে আমি তাহাকে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিতে পারিব । তাহার পাঠদ্দশা ব্রহ্মচর্য্য এখনও শেষ হয় নাই । আর ছয় মাস মধ্যেই সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে । তখন তুমি পুত্র ও বধূ লইয়া আনন্দ করিতে পারিবে, আমিও তখন পুত্রের প্রতি ভিন্ন প্রকার ব্যবহার করিতে থাকিব । বস্তুতঃ অনন্ত আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব ।

তাহাকে দেখিবা মাত্র আনন্দে আমার হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে, এবং তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য বাহুদ্বয় প্রসারিত হইতে চায়। আমি বহু কষ্টে আত্মদমন করি। যাহাতে সে আমার মনোভাব বুঝিতে সমর্থ না হয় সেইজন্যই আমি এইরূপ কঠোরতার আশ্রয় গ্রহণ করি। তাহাকে মূর্খ বলিয়া এবং তাহার ক্ষুদ্র ত্রুটিকেও উপেক্ষা না করিয়া তজ্জন্য কষ্টের পালন করিয়া তাহার আত্মোন্নতির চেষ্টাকে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রাখি। এ কঠোরতার স্থায়িত্ব আর ছয় মাস মাত্র।"

পিতার মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনন্তের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পিতা তৎপ্রতি নির্দ্দয় বলিয়া তাহার যে ধারণা হইয়াছিল একণে বুঝিতে পারিল যে তাহার সর্ব্বৈব ভ্রম মাত্র। পিতা তাহার পরম মঙ্গলাকাঙ্খী। তাহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যই পিতা এই প্রকার কঠোর ব্যবহার করেন। বুঝিতে পারিয়া অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তখন বুঝিতে পারিল এমন পরম পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, হিতৈষী ও স্নেহবান্ পিতাকে কেবল ভ্রম বশতঃ স্বহস্তে হত্যা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তখন দারুণ দুঃখে সংখেদে মনে মনে বলিতে লাগিল হায় হায়! আমি কি নরাধম, আমি কি মহানারকী আমি পিতৃহন্তা! নিতান্ত পশু প্রকৃতি সন্তানেও যাহা করিতে পারেনা আমি সহসা ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাই করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম! ধিক্ আমাকে। ধিক্ আমার শিক্ষাকে। আমার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত শাস্ত্র জ্ঞানই বৃথা হইয়াছে। আমি যখন পিতাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি তখনই আমার পিতৃহত্যার পাপ হইয়াছে" নরকেও আমার স্থান নাই।" এই ভাবিতে ভাবিতে মনোবেগ সংবরণে অসমর্থ হইয়া "আমি পিতৃহন্তা আমি পিতৃহন্তা" এই শব্দ উচ্চার

করিতে করিতে অনন্ত ঊৰ্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইয়া পিতার চরণ প্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

গৃহে মৃন্ময় প্রদীপ ক্ষীণালোক বিকীর্ণ করিতেছিল। সহসা কক্ষ মধ্যে অসম্ভাবিতরূপে, উন্মত্ত ও বিকট বেশে, এবং উচ্চশব্দ করিতে করিতে অনন্তকে তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইতে দেখিয়া, তাহাকে চিনিতে না পারিয়া রামশর্ম্মা ও তাঁহার পত্নী সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন সকলেই নিদ্রামগ্ন সুতরাং সে শব্দ কাহারও কর্ণগোচর হইল না। পরে দেখিতে পাইলেন অনন্ত মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ব্রস্তে ব্যস্তে বিশেষ চেষ্টা করিয়া পতিপত্নী পুত্রের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

অনন্ত সংজ্ঞালাভ করিল। তাহার বেশ মলিন, মুখ বিবর্ণ, কান্তি রুক্ষ। নিকটে একখানি শাণিত অস্ত্র পতিত রহিয়াছে। রামশর্ম্মা ও তাঁহার পত্নী ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। পুত্রের সংজ্ঞালাভের পর তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইলে রামশর্ম্মা অনন্তকে বলিলেন "অনন্ত, তুমি এই বেশে, এমন সময়ে, এমন সুদৃঢ় দ্বাররুদ্ধ গৃহে কেন এবং কি প্রকারে আসিলে? তোমার বিকট বেশ, তুমি শস্ত্রপাণি; পিতৃহন্তা পিতৃহন্তা শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলে! এ সমস্ত কি ব্যাপার! তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হইতেছে।"

অনন্ত বলিল "পিতৃ দেব, অথবা আমি এক্ষণে আর ঐ পবিত্র শব্দ উচ্চারণ করিতে অধিকারী নই। আমি আর এক্ষণে আপনাদের পুত্র শব্দ বাচ্য নহি। আমি আর সে অনন্ত নাই। আমি এক্ষণে পিশাচ, রাক্ষস নরহন্তা অথবা তদপেক্ষাও অধিকতর ভীষণ পিতৃহন্তা। এই দেখুন আমার হস্তে শাণিত অস্ত্র ছিল। আমি আপনার তিরস্কারে ও প্রহারে

কাতর ও ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি। আপনার প্রাণ সংহার অভিপ্রায়ে আমি সন্ধ্যাকালে এই গৃহে প্রবেশ করিয়া লুক্কায়িত ছিলাম। এক্ষণে আপনাদের কথোপকথন শ্রবণে বুঝিতে পারিলাম যে আপনি আমাকে দেখিতে পারেন না বলিয়া আমার যে ধারণা হইয়াছিল তাহা ভ্রম মাত্র। আপনি আমার পরম মঙ্গলাকাঙ্খী। ক্রোধরূপ ঘৃণিত পিশাচ আমাকে অধিকার করিয়া আমাকেও তত্তুল্য করিয়া ফেলিয়াছে এবং আপনার এত দিনের পরিশ্রম সমস্তই বৃথা হইয়াছে। আমি সমস্ত বিদ্যা সমস্ত জ্ঞান অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়াছি। আপনি পিতা, প্রতিপালক, অধ্যাপক, পরমগুরু। এমন পরমধার্ম্মিক অদ্বিতীয় পণ্ডিত সতত মঙ্গলাকাঙ্খী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠগুরু পিতাকে আমি হত্যা করিতে মনঃস্থ করিয়াছিলাম। যখন আমি সংকল্প করিয়াছিলাম তখনই আমার পিতৃহত্যার সম্পূর্ণ পাতক হইয়াছে। এক্ষণে আমি পিতৃহন্তা, নরাধম, পিশাচ; আমাকে আর পুত্র বলিয়া আপনারা মনে স্থান দিবেন না। নরঘাতক, পিতৃহত্যাকারী মহাপাতকীর প্রতি যে দণ্ড ব্যবস্থা হয় এক্ষণে এই হতভাগ্যের প্রতি তাহাই আদেশ করুন।"

রামশর্ম্মা অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায় ও ধর্ম্মের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব, এমন কি আত্মপ্রাণও অম্লান বদনে বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন। পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত ও চিন্তিত হইলেন। বলিলেন প্রাণাধিক অনন্ত, তুমি ভ্রম বুঝিয়া ক্রোধের বশীভূত হইয়া একেবারে স্বর্গ হইতে নরকে পতিত হইয়াছ। হায়! হায়! আমার এত দিনের সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হইল। আমি তোমাকে সর্ব্ব বিষয়ে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় করিতে যত্ন করিতেছিলাম। বিদ্যায় তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ

করিয়াছিলে। আর ছয়টী মাস অপেক্ষা করিলেই তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মানসিক রিপু সম্পূর্ণ জয় করিতে পারিতে। তখন আর এপ্রকার বা ইহা অপেক্ষাও গুরুতর ঘটনাতে তোমার মানসিক উত্তেজনা বা ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত না। তোমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা জন্যই অদ্য তোমার প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলাম। যাহাই হউক না কেন তুমি যখন পিতৃহত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছিলে তখন তোমার মহাপাতক ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই, এবং তাহার ইহলৌকিক প্রায়শ্চিত্ত নিতান্ত আবশ্যক। এদেশে কেহ কোন পাপ করিলে আমিই তাহার ব্যবস্থা দিয়া থাকি; তোমার ব্যবস্থাও আমাকেই দিতে হইবে। তুমি তো সমস্ত শাস্ত্রই উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছ; বল দেখি এরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

অনন্ত বলিল "আমি যখন পিতাকে হত্যা করিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাম তখন আমার পিতৃহত্যার পাতক হইয়াছে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। আমাকে তুষানলের ব্যবস্থা প্রদান করুন, আমি তুষের অগ্নিতে এ ঘৃণিত শরীর দগ্ধ করি, আমার ন্যায় অবিমৃশ্যকারী নারকীর আর এ পৃথিবীতে স্থান নাই।"

অনন্তের মাতা স্তম্ভিত ও বিমূঢ় চিত্তে এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন। এই সমস্ত ভয়াবহ বাক্য শ্রবণে তাঁহার আর বাক্যস্ফুর্ত্তির ক্ষমতা ছিলনা, দেহে যেন তাঁহার প্রাণ ছিলনা। অনন্তের মুখে তুষানলের কথা শুনিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তাহার তুষানলের আশঙ্কা শুনিয়া মাতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অনন্তকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ, আমার এক মাত্র পুত্র অনন্ত। সুবিদ্বান্, সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক বলিয়া সে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

তাহার আজ এই দশা । তুষানলে তাহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে ? বাছার এই সুকোমল, সোণার শরীর তুষের আগুণে তিলে তিলে অসহ্য যন্ত্রনায় দগ্ধ হইবে । তৎপূর্ব্বেই আমার মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই ।" পরে স্বামীর পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন "স্বামিন্, এ হতভাগিনীর প্রতি কৃপা করিয়া এবং বাছার সুকুমার মুখ পানে চাহিয়া ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করুন । আপনাদের শাস্ত্রে তো সমস্ত দণ্ডেরই অনুকল্প আছে । পরাক ব্রত, চান্দ্রায়ণব্রত প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ধেনুদান, তদনুকল্পে কাঞ্চন, রজত বা তাম্রদান, তদভাবে তন্মূল্য যথাশক্তি মুদ্রা প্রদান করারও ব্যবস্থা আছে । অতএব আমার এই একমাত্র প্রার্থনা অনন্তের প্রাণ রক্ষা করিয়া তুষানলের অনুকল্পে অনুরূপ দণ্ডের বিধান করুন ।" এই বলিয়া অশ্রু জলে পতির পদতল সিক্ত করিতে লাগিলেন ।

রাঘশর্ম্মা স্থির গম্ভীর । বহু কষ্টে তিনি মনোবেগ সংযত করিতেছিলেন । বলিলেন "ইহার অনুকল্প হইতে পারে, বটে, কিন্তু তাহাও অতীব কঠোর । অনন্তকে দ্বাদশ বৎসর কাল শ্বশুরালয়ে বাস করিতে হইবে । তাহার এই দণ্ডের কথা বা শ্বশুরালয়ে বাসের কারণ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেনা । বধূ শ্বশুরালয়েই থাকিবে কিন্তু কখনও তাহার নিকট গমন বা তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিবেনা । শ্বশুর ভিন্ন অন্যের নিকট খাদ্য, বস্ত্র বা কোন প্রকার দান গ্রহন করিবেনা । যদি এই ভাবে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে তবেই তাহার সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে । এই নিয়ম গুলির কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম করিলেই তাহার তুষানল হইবে ।"

এই ব্যবস্থা শ্রবন করিয়া মাতা কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন ।

বলিলেন "যাও অনন্ত, এই দণ্ড গ্রহণ করিয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাও। দেখিও ঘুণাক্ষরেও যেন নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে। রামকে বনবাস দিয়া রামজননী কৌশল্যার ন্যায় আমিও এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল জীবন্মৃতা হইয়া থাকিব। দ্বাদশ বর্ষ পর যেন তোমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সকল জ্বালা নিবারণ করিতে পারি।" অনন্ত স্বীকৃত হইয়া অনুমতিগ্রহণান্তর পিতামাতার চরণ ধূলা মস্তকে ধারণ করতঃ সেই রাত্রেই শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—**—

অনন্তদেব শ্বশুরালয়ে আগমন করিয়াছে। অনন্তের বিদ্যার খ্যাতি তথায় সকলেই শ্রবণ করিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে বহুকাল পর জামাতার আগমনে শ্বশুরগৃহে মহা উৎসব লাগিয়া গেল। গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা অনন্তকে দেখিতে আসিল। তাহার সুন্দর কান্তি দেখিয়া সকলেই অনন্তের শ্বশুর শাশুড়ী এবং পত্নীর অদৃষ্টের প্রশংসা করিতে লাগিল। অন্দর মহল পুরললনাগণের গমনাগমন ও হাস্য পরিহাসে মুখরিত হইতে লাগিল। সকলেই

অনন্তের আদর অভ্যর্থনা ও আহারানুষ্ঠান কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। প্রকৃত ঘটনা প্রকাশের আশঙ্কায় অনন্ত অধিক কথা বলিবেনা বলিয়া পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে শ্বশুরগৃহের উৎসব দর্শনে অনন্ত আরও বিষন্নচিত্ত হইয়া উঠিল। আলাপোৎসুক ব্যক্তিগণের প্রশ্নের উত্তর দুই এক কথায় প্রদান করিয়া অনন্ত মৌনাবলম্বন করিতে লাগিল, হতাশ চিত্তে কেহবা অনন্তকে অল্পভাষী কেহবা অহঙ্কারী বলিয়া নিন্দা করিতে করিতে গৃহে গমন করিল।

মহাসমারোহে ভোজন ব্যাপার শেষ হইল। রজনীতে পুরস্ত্রীগণ অনন্তকে অন্দরে যাইতে অনুরোধ করিল। বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে বলিয়া অনন্ত অন্দরে যাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল, পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াও অকৃতকার্য্য হওয়ায় ভগ্নমনোরথে অনন্তকে নিন্দা করিতে করিতে রমণীগণ প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল।

তিন চারি দিন বেশ সমারোহে কাটিয়া গেল। তারপর সমস্তই ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল। অনন্ত গৃহপ্রত্যাগমনের কোন ভাব প্রকাশ করেনা, পত্নীর সহিত সংশ্রব রাখেনা, অন্যের সহিতও কথা বলেনা, পীড়াপীড়ি করিলে দুই একটী কথা বলে মাত্র। এই ভাব দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ক্রমে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল তবু অনন্ত শ্বশুরালয় ত্যাগ করে না। শ্বশুরগৃহের সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। অনন্তকে সকলেই অসাধারণ বিদ্বান মনে করিত, তাহার এই দশা দেখিয়া লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, ক্রমে "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" পর্য্যন্ত হইতে লাগিল, তথাপি অনন্ত যায় না। অনেকে মনে করিল অতিরিক্ত অধ্যয়নে অনন্তের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। স্নানাহার করিতে তাহাকে কেহই

বলে না। স্নানের সময় অতিক্রান্ত হইলে অনন্ত বিনা তৈলে স্নান করে পরিধানের বস্ত্র অত্যন্ত মলিন ও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তদ্দ্বারাই কোন রূপে লজ্জা নিবারণ করে। অনেক সময় অনাহারেই থাকিতে হয়। অনন্তের স্ত্রীর কাতরতা দর্শনে শাশুড়ী মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু খাইতে দেন, কিন্তু তাহাতে শ্যালকেরা মাতাকে তিরস্কার করে। অনন্তের পত্নী গোপনে কিছু খাইতে দিলে তজ্জন্য তাহাকে প্রহারও করে। অনন্তের এই কষ্ট দেখিয়া তাহাকে অন্য কেহ গৃহে যাইতে পরামর্শ দিলে সে তাহার কোন উত্তর দেয়না, কেহ অন্ন বা বস্ত্র দিলে তাহাও গ্রহণ করেনা। তাহার শয়নের স্থান বা শয্যা নাই, কখন বা প্রাঙ্গণে কখনও গৃহ কোণে ভূমি শয্যায় পতিত থাকে। পরিধেয় বস্ত্র নাই দেখিয়া একদিন অনন্তের পত্নী তাহাকে একখানা পুরাতন বস্ত্র দিয়াছিল সে জন্য শ্যালকেরা অনন্তের পত্নীকে বিলক্ষণ ভৎসনা ও প্রহার করে এবং অনন্তকেও সক্রোধে প্রহার করিতে করিতে কাপড় খানি তাহার পরিধান হইতে টানিয়া খুলিয়া লয়। তৈল বিনা মস্তকে দীর্ঘ জটা, নখ কেশ অকর্ত্তিত সংস্কারাভাবে শরীর মলিন, খাদ্যাভাবে দেহ শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণ কৌপীন মাত্র তদুপরি অনাদর লাঞ্ছনা ভৎসনা প্রহার। পাঠক, একবার অনন্তের অবস্থা কল্পনা করুন দেখি। এ অবস্থা বর্ণনাতীত। দ্বাদশ বৎসর এরূপ যন্ত্রণা ভোগ তুষানল অপেক্ষাও ভীষণ। অনন্ত তো উন্মাদ হয় নাই যে তাহার যন্ত্রণা বোধ ছিল না। তাহার স্ত্রীকেও তাহার জন্য অশেষ গঞ্জনা সহ করিতে হইত। সে নিরপরাধিনী হতভাগিনী তাহার দেশ বিখ্যাত সুপণ্ডিত ও সুন্দর পতির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং পিতৃ গৃহের আবাল বৃদ্ধ বনিতার ভৎসনা এবং সময় সময় প্রহার পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া দিবা রাত্রি অশ্রুজলে

বক্ষঃস্থল আপ্লাবিত করিত। সকলেই মনে করিত সেই দুর্ভাগাই তাহাদের এরূপ অপমান ও লজ্জার কারণ। অনন্ত নিজের যন্ত্রণা তুচ্ছ করিত কিন্তু পত্নীর যন্ত্রণা তাহার অসহ্য হইল। সময় সময় মনে করিত ইহা অপেক্ষা তুষানলে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর ছিল। কিন্তু পিতৃমাতৃ আজ্ঞা এবং মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত, সুতরাং তাহাকে এ যন্ত্রণা সহ্য করিতেই হইবে। শ্বশুর গৃহের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্ষণকালের জন্য একটু দূরেও যাইবার বিধান নাই। যে দেখে সেই তাহাকে বিদ্রূপ করে তিরস্কার করে, বালক বালিকারাও তাহার গাত্রে ধূলা দেয়, ঢিল দেয়, কেহবা থুথু দেয়, কেহ ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়, কেহ বা প্রহার করে।

কিন্তু ক্রমে যন্ত্রণা একেবারে অসহ্য হইয়া পড়িল। এই তুষানলের অধিক যন্ত্রণায়ও অনন্ত স্থির ধীর। কিন্তু শরীর আর টিকেনা, প্রাণ যেন আর দেহে থাকিতে চায়না; প্রাণ যায় যাউক, দুর্গতি যত হয় হউক, অনন্ত শেষ পর্য্যন্ত ব্রত পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কিন্তু অনন্তের পত্নীর অবস্থা কি? হিন্দু রমণী পতির এরূপ অবস্থা দেখিয়া কত সহ্য করিতে পারে? পতি অনশনে থাকিলে হিন্দু স্ত্রী আহার করিতে পারেনা; পতি বস্ত্রহীন, স্ত্রীর উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে সাধ হয়না। হতভাগিনী দিবারাত্রি মনোদুঃখে ক্রন্দন মাত্র সার করিয়াছে। কন্যার কাতরতা ও ক্রন্দনে ব্যথিতা ও বিচলিতা হইয়া, জামাতার কষ্টে কষ্টানুভব করিয়া শাশুড়ী অতি গোপনে মধ্যে মধ্যে অনন্তকে কিছু কিছু আহার দেন, তাহাতেই অনন্ত এখনও বাঁচিয়া আছে। ধন্য হিন্দু রমণীর পতি ভক্তি, ধন্য হিন্দু বিবাহের পবিত্র বন্ধন। ধন্য আর্য্য ঋষিদিগের সুন্দর বিধান। যে সমস্ত স্বদেশ দ্রোহী স্বজাতি দ্রোহী এই পবিত্রতা

নষ্ট করিতে প্রয়াসী তাহাদিগকে ধিক্।

অনন্তের পত্নী ক্রন্দন মাত্র সার করিয়াছে। এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ প্রায় গত আর এক মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই সুদীর্ঘ কাল অনন্ত ও তৎপত্নীর নিকট যুগবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু দিন যেন আর যায় না। অনন্তের পত্নী ভাবিতেছে স্বামী আর প্রকৃতিস্থ হইবে না এই ভাবেই জীবন শেষ হইবে। ক্রমে যন্ত্রণা এত অসহ্য হইল যে অনন্তের পত্নী আত্মহত্যা করিতে কৃত সংকল্প হইল। পতির দুর্গতি সে আর দেখিতে পারে না। নিজের যন্ত্রণার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, পতির যন্ত্রণাই এখন অসহ্য। স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ নাই; হঠাৎ দেখা হইলে তৎক্ষণাৎ স্বামী স্থানান্তরে চলিয়া যায়। এক্ষণে মনে করিল মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বামীর নিকট বিদায় লইয়া এবং স্বামীর পদ রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিব। এই মনে করিয়া একদিন অপরাহ্ণ কালে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। শ্বশুরের পুকুর পাড়ে একটী গাছের তলায় অনন্ত বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছিল। স্থানটী নির্জ্জন। সহসা পত্নীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া অনন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। স্ত্রী বলিল স্বামিন্ একটু অপেক্ষা করুন, আমার গোটা দুই শেষ কথা আছে বলিয়া জন্মের মত বিদায় হই, এ জনমে আর দেখা হইবে না তাই শ্রীচরণে বিদায় লইতে আসিয়াছি।

অনন্ত এরূপ মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া আজ চলিয়া যাইতে পারিল না মৌনাবলম্বনে দাঁড়াইয়া রহিল। পত্নী বলিল স্বামিন্, এ জন্ম বৃথাই গেল।

আপনি এত বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন যে আপনার বিদ্যার খ্যাতি সর্ব্বদা এ অভাগিনীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। আমার অদৃষ্টকে লোকে কত প্রশংসা করিত। আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, ভ্রাতৃবধূগণ সৌভাগ্যবতী বলিয়া আমাকে কত আদর করিত। কিন্তু অভাগিনীর অদৃষ্ট পুড়িয়া গেল। এত বড় বিদ্বান্ আপনি উন্মাদ হইলেন। যদি আপনার এমন অবস্থাতেও গৃহে থাকিয়া সেবা করিতে পারিতাম তাহা হইলেও নিজের কর্ত্তব্য সাধন হইত। কিন্তু এখানে আপনার এত অপমান এত যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূগণের গঞ্জনা ও উৎপীড়নে আমি অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছি। এক্ষণে এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব স্থির করিয়াছি। এ জন্ম পতি সেবা করিতে পারিলাম না, জন্মান্তরে আপনাকে পতি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচরণ সেবা দ্বারা যেন জীবন সার্থক করিতে পারি। এ চিরদাসী বিদায় হইল। অদ্য রজনীতেই জীবন শেষ করিব, কল্য প্রভাতে আর দেখিতে পাইবেন না।" এই বলিয়া পত্নী অনন্তের পাদস্পর্শ করিতে হস্ত প্রসারণ করিল। অনন্ত ত্রস্তে সরিয়া দাঁড়াইল এবং কিছু না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। অনন্তপত্নী সেই স্থানে কিছু ক্ষণ চিত্রাপিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিল।

পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অনন্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল; পত্নী প্রকৃত কারণ কিছুই অবগত ছিল না, এবং আর যে এক মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে তাহাও সে জানে না কিন্তু তাহাকে কোন কথা বাক্য বা লিপিদ্বারা জানান অবৈধ। অনন্ত স্ত্রীর প্রাণ রক্ষার জন্য চিন্তাকুল চিত্তে শ্বশুরের

বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল এবং নিম্নলিখিত শ্লোকটী বড় বড় অক্ষরে একখানা কাগজে লিখিল :—

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণুতে হি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ ॥

অনন্ত কাগজখানি হস্তে লইয়া স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইল। স্ত্রী তখন অন্তঃপুরে যাইতেছিল। পথিমধ্যে অনন্ত স্ত্রীকে পাইয়া কাগজ খানি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইল।

অনন্তের স্ত্রী কাগজ খানা সযত্নে তুলিয়া লইল। পড়িয়া দেখিল শ্লোকটীতে যাহা লেখা আছে তাহার অর্থ এই "সহসা কোন কার্য্য করা উচিত নহে। বিবেচনা করিয়া কার্য্য না করিলে বিষম বিপদ ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুবিচার করিয়া কার্য্য করে গুণের পক্ষপাতিনী সম্পদ স্বয়ং তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।" স্বামীর হস্তাক্ষর পুনঃপুনঃ পড়িয়াও তাহার তৃপ্তি হইল না। এক একবার পাঠ করেন এবং কাগজখানিকে কখনও মস্তকে কখনও বক্ষঃস্থলে রক্ষা করেন। পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন স্ত্রীলোক সংস্কৃত শ্লোক বুঝিল কি রূপে ? কিন্তু সে সময় সংস্কৃতই দেশের ভাষা ছিল। ভদ্রপরিবারের স্ত্রীলোকেরাও লেখাপড়া শিক্ষা করিত। যাঁহারা বলেন পূর্ব্বে এ দেশে স্ত্রী শিক্ষা ছিল না তাঁহারা দেশের সামাজিক ইতিহাসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তখন স্ত্রী শিক্ষা ছিল কিন্তু শিক্ষা প্রণালী ও শিক্ষার বিষয় বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ছিল না। তখন পুরুষেরা যেমন গুরুগৃহে কঠোর

ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে বিদ্যা শিক্ষা করিত, স্ত্রীলোকেও স্বীয় পরিবারে পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতি গুরুজনের নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করিত। এখনকার মত স্কুল কলেজ প্রভৃতি তখন ছিল না। এখন স্কুল কলেজের শিক্ষা প্রণালীর দোষে বালকগণ ধর্ম্ম নীতি চরিত্র হীন বিলাসী অকর্ম্মা বাবু ইয়ার ও গুণ্ডা হইতেছে, গুরুজনের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নাই, বিদ্যালয়গুলি যেন অসৎ বিষয়ে গল্প ও আলোচনার আড্ডা স্বরূপ হইয়াছে। বালিকারাও বিদ্যালয়ে গিয়া অনেকে একত্র হইয়া নানাপ্রকার গল্প আলোচনার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার ফলে অল্প বয়সেই ইঁচড়ে পাকা হইয়া পড়ে। দুইখানা পুস্তক পাঠ করার পরই নভেল পড়িবার সুবিধা হয়। নানা প্রকার কদর্য্য নভেল পড়িয়া পড়িয়া বালকদিগের ন্যায় বালিকারাও নানারূপ কাল্পনিক সুখাভিলাষিনী কল্পনাপ্রিয়া বিলাসিনী ও সাংসারিক কার্য্যে অপটু হইয়া পড়ে। গৃহকর্ম্ম রন্ধন প্রভৃতিকে ছোট কাজ বলিয়া মনে করিতে থাকে। স্বামীকে ভক্তির পরিবর্ত্তে ভালবাসে, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতিকে আপদ স্বরূপ মনে করে। এবং আধুনিক শিক্ষার ফলে স্বীয় ধর্ম্ম ও রীতি নীতিকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করে। বিলাসী বাবুরাও প্রথমতঃ এইরূপ বিলাসিনী ও ইঁচড়ে পাকা ইয়ার স্ত্রীকেই পছন্দ করেন। ফলে হিন্দু গৃহের পবিত্রতা সুখ শান্তি প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। অর্থ-উপার্জ্জনকারী স্বামীকেও পাচক চাকর চাকরাণী রাখিয়া সংসার চালাইতে হয়। দরিদ্র বাঙ্গালীর দারিদ্র্য আরও বাড়িয়া যায়; এবং নিঃসম্পর্কীয় হীনপ্রকৃতি দায়িত্বজ্ঞানশূন্য পাচক চাকরের হস্তের কদর্য্য আহার

ভোজন করিয়া অম্ল, অজীর্ণ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে নানা কষ্টে অকালে প্রাণ হারাইতে হয়।

অনন্তের পত্নী লেখা পড়িয়া বুঝিলেন স্বামী স্পষ্টরূপে তাঁহাকে কিছু বলেন নাই বটে কিন্তু সহসা কার্য্য করা অন্যায় এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? স্বামীর অভিপ্রায়ের প্রতিকূলাচরণ অবৈধ। এদিকে যন্ত্রণাও অসহ্য। এইরূপ আন্দোলনের ফলে সে রাত্রে অনন্তপত্নীর প্রাণ পরিত্যাগ ঘটিল না।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ তুমি ব্রাহ্মণ ছিলে,
দৈত্যেরে যবে ফিরে তুলে নিলে,
কুবের-সম্পদ চরণে দলিলে,
স্কন্ধে ভিক্ষা ঝুলি।

হুতাশন সম দীপ্ত সে দেহ,
করুণা স্নিগ্ধ জননীর স্নেহ,
ব্রাহ্মণ বিনা পায় নাই কেহ,
ললাটে ভষ্ম ধূলি।

* মেঘনা বক্ষে অম্বুবাচী ৭ই আষাঢ় ১৩২৬

সুরম চাকুতে পশি চীরবাস,
শাকান্নে প্রীতি নিত্য উপবাস,
কামিনী-কাঞ্চনে করি পরিহাস,
শয্যা ধরণী কোলে।

ষড়রিপু আসি চরণে লুটিল,
ওঁকার-গানে মেদিনী টলিল,
অসীমে সসীম-বাঁধন টুটিল,
মহিমা-কিরীটী ভালে।

ভুলিয়াছি সব গিয়াছে সে দিন,
আপন গৌরবে করিয়াছি হীন,
মহিমা শকতি হইয়াছে ক্ষীণ,
কলঙ্ক লয়েছি বরি।

আরও কত তলে ডুবিব অতলে,
পাপের কালিমা পঙ্কিল জলে,
ধরম করম গেল রসাতলে,
কি কাজ জনম ধরি।

মিথ্যা আজি মোর মস্তকের মণি,
নিত্য ব্যভিচারে সরমি মেদিনী,
মণি-হারা আজ হইয়াছে ফণি,
আপন করম-দোষে!

আর কি সেদিন আসিবে না আর,
ব্রহ্মণ্য তেজে আত্মার প্রচার,
পরিক না গলে মহিমার হার,
দুঃখেরে বরিব হেসে !

—**—

বরষার ব্যথা

প্রখর অরুণ হয়েছে মলিন পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে
থাকিয়া থাকিয়া চমকে দামিনী পরাণ বহিছে বেগে,
বকুলের শাখে গাহে না ক পিক পঞ্চমে তান তুলি
(তবু) বর্ষার প্রাতে স্মরি কার মুখ সকলি গিয়াছি ভুলি

শুনি শুধু তার আধ আধ কথা আজি হৃদয়ের মাঝে
অমিয় মাখান মুখখানি তার হাসিছে সকল কাজে
ধীরে ধীরে যাওয়া মৃদু মৃদু হাসি কি এক মোহন ছন্দে
জাগিছে পরাণে আকুল করিয়া দিতেছে মধুরানন্দে

উঠে শুধু তার চরণশব্দ হৃদি আসন তলে
মরমে মরমে ফিস ফিস কথা প্রিয় আলাপের ছলে
নাহি অভিমান নাহি কোন রোষ আজি নাহি কিছু আর
মিলনের স্মৃতি হিয়ার মাঝারে আসে যায় বার বার

দুরিটি চোখের চকিত মিলনে সরম উঠে না ছুটি
নীরব ভাষাতে হৃদয় আমার আদিয়ে পড়ে না লুটি
আজি দু নয়নে করুণ চাহনি মৌন বেদনা মাখা
লোকের আড়ালে সঙ্কটে লাজে ব্যাকুল ব্যথাটি মাখা

সন্ধ্যা বেলায় ভ্রমিতে ভ্রমিতে ফিরি যবে গৃহতল
কার মঙ্গল কামনা করিতে চোখে ভরে উঠে জল
আঁধার নিশায় ঘন বরিষায় বারি ঝরে অনিবার
শূন্য নয়নে আকুলি ব্যাকুলি স্মরি মুখখানি কার

স্থানীয় সংবাদ।

দুর্ঘটনা।—

বোচাগঞ্জ থানার অধীনের একজন লোক সপ্তমী পূজার দিবস বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়া সৈয়দপুর যায়। ১৭ই আশ্বিন রাত্রি ২টার গাড়ীতে পার্ব্বতীপুর হইতে বিরহলের টিকিট করে। সে পূর্ব্বে জানিত না যে ঐ গাড়ী বিরহল ষ্টেশনে থামে না। যখন গাড়ী বিরহল ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে ঘুমটীর নিকটবর্ত্তী হয়, সে সেই সময় তাহার সঙ্গীয় যে কয়েকটী লোক ছিল, তাহাদিগকে পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিবার উপদেশ দিয়া কার্য্যানুরোধে সে ঐ স্থানেই গাড়ী হইতে লাফাইয়া পরে। পর দিবস তাহার মৃত দেহ ঘুমটীর নিকটস্থ পুলের নিম্নে জলে ভাসিতে দেখা যায়।

সকলেই শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিবেন যে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর কলিকাতায় গিয়া কতকটা ভাল হইয়াছেন। তাঁহার জ্বর বিচ্ছেদ হইয়াছে কিন্তু দুর্ব্বলতা খুবই আছে।

লাট মহোদয়—

বাঙ্গালার গবর্ণর শ্রীলশ্রীযুক্ত লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুর ২৪শে নবেম্বর দিনাজপুর শুভাগমন করিবেন। কালেক্টারী কাছারীর পূর্ব্ব দিকে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য পট মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে। ষ্টেশন হইতে বরাবর উক্ত পট মণ্ডপে লাট মহোদয় গমন করিবেন। বৈকালে রাজধানীতে চা পান করিবেন। পর দিবস সকালে হাসপাতাল জেল ইত্যাদি পরিদর্শন ও মধ্যাহ্নে সমাগত ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎকার করিয়া ঐ দিনই দিনাজপুর ত্যাগ করিবেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীলশ্রীযুক্ত লর্ড কার্মাইকেল বাহাদুর ১৯১৩ সালে যখন দিনাজপুর আগমন করেন, সে সময় তাঁহাকে সহর পরিদর্শনের সুবিধা দেওয়া হয় নাই। লাট মহোদয় যদি নির্দ্দিষ্ট রাজপথ দিয়া না গিয়া ইচ্ছা মত যে কোন রাজপথে যান তাহা হইলে স্থানীয় অবস্থা তাঁহার বুঝিবার অধিকতর সম্ভাবনা থাকে।

স্বাস্থ্য—

কার্ত্তিকের ২সপ্তাহ পড়িতে না পড়িতে খুব শীত পড়িয়াছে। জরপীড়া সহরে ও মফস্বলে খুবই হইতেছে।

প্রদর্শনী—

শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির উৎযোগে ৺শ্যামা পূজার দিন হইতে ১০ দিনের জন্য রেলবাজার হাটে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী খুলিয়াছে । শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার বাহাদুর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন । এবার দ্রব্যের সংগ্রহ গত বৎসর অপেক্ষা কম হইয়াছে । প্রদর্শনীর জন্য সুবিধাকর সময় নির্দ্দিষ্ট হইলে ভাল হইত ।

পূর্ব্ববঙ্গে তুফান—

৭ই আশ্বিন রাত্রিতে বাখরগঞ্জ, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার কতকাংশের উপর দিয়া যে ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার পথ ৪০ মাইল পরিয়াছিল। কিন্তু মধ্যে ২৫ মাইল পরিসর স্থানে একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াছে । অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে দৌলতখাঁ ঝড়ের সামান্য মনে হয় । এবং ১২৭১ সনে কলিকাতা অঞ্চলে প্রবল ঝটিকা ইহার তুলনায় সামান্য মনে হয় । আশ্বিনের ঝটিকায় বহু সংখ্যক মনুষ্য ও পশ্বাদির প্রাণ হানি এবং গৃহ সম্পত্তি ও বৃক্ষাদির বিনাশ সাধন হইয়াছে । ঝটিকা পীড়িতদিগের সাহায্য কল্পে দিনাজপুরেও চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে । আমারা আশা করি এথা হইতে উপযুক্ত পরিমাণ চাঁদা প্রেরিত হইবে ।

শান্তিউৎসব—

২৭শে হইতে ৩০শে অগ্রাহয়ণ এই কয়েক দিন শান্তি উৎসবের জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট নির্ব্বাচন করিয়াছেন । রং তামাসা বেশী না হইয়া দীন দুঃখীকে ভোজন করান শান্তি উৎসবের প্রধান অঙ্গ হয়, গবর্ণমেণ্টের ইহাই ইচ্ছা ।
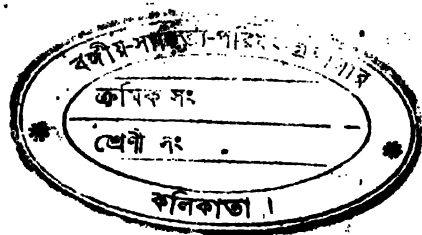
দিনাজপুর পত্রিকা।

(মাসিক)

সপ্তবিংশতি ভাগ } অগ্রহায়ণ ১৩২৬। } ৩য় সংখ্যা

বিস্মৃশ্য কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনন্তের শ্বশুর গৃহের অনতিদূরে রত্নেশ্বর নামক একজন ধনবান বণিক বাস করিত। আঠার বৎসর পূর্ব্বে রত্নেশ্বর বাণিজ্য করিতে বিদেশ যাত্রা করিয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত গৃহে প্রত্যাগমন করে নাই, কিম্বা পরিজনবর্গ তাহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হয় নাই। সকলেই মনে করিয়াছে রত্নেশ্বর জীবিত নাই। কিন্তু তাহার পত্নীর বিশ্বাস ছিল রত্নেশ্বর জীবিত আছে। রত্নেশ্বরের পত্নী সতী সাধ্বী; সে প্রতিদিন ভক্তি সহকারে ইষ্ট দেবতার পূজা করিত। একদিন রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে তাহার ইষ্ট দেবতা তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া

বলিতেছেন রত্নেশ্বর মরিবে না, দীর্ঘকাল পরে প্রভূত ধনরত্ন লইয়া গৃহে আসিবে। এই আশ্বাসে সে সধবার চিহ্ন পরিত্যাগ করে নাই কিম্বা স্বামীর পারলৌকিক কোন কার্য্য করিতে দেয় নাই। স্বামীর বিদেশ গমনকালে তাঁহার পঞ্চম মাসের সন্তান সম্ভাবনা ছিল। যথা সময়ে বণিকপত্নী একটি সুন্দর পুত্র প্রসব করিয়াছে। স্বামীচরণ ধ্যান করিয়া পুত্রের লালনপালন করিতে করিতে এতকাল স্বামীর প্রত্যাগমনের আশায় অতিবাহিত করিয়াছে। পুত্র এক্ষণে অষ্টাদশ বর্ষীয় পূর্ণাঙ্গ যুবক। বণিকপত্নী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী; সে বহুকষ্টে পুত্রের শিক্ষা বিধান ও স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা করিতেছে।

কিন্তু যখন অষ্টাদশ বর্ষ গত হইয়া গেল, রত্নেশ্বরের কোন সংবাদ নাই তখন সকলেই মনে করিল রত্নেশ্বর জীবিত নাই। রত্নেশ্বরের পত্নীর মনেও পতির মৃত্যু নিশ্চয় বলিয়া বোধ হইতে লগিল। স্বপ্ন মানসিক বিকার বলিয়া ধারণা হইয়াছে। এত কাল আশায় আশায় দিন কর্ত্তন করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর তাঁহার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য হইতেছে না। সে এক্ষণে স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে স্থির করিয়াছে।

অনন্তের পত্নী এবং রত্নেশ্বরের পত্নীর অবস্থা অনেকাংশে তুল্য। উভয়েই স্বামী সহবাসে বঞ্চিতা। উভয়েই প্রায় সমবয়স্কা। বাল্যকাল হইতেই পরস্পরে প্রণয় ছিল। এক্ষণে উভয়ের অবস্থা সাদৃশ্য হেতু ঘনিষ্ঠতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। উভয়ে নির্জ্জনে বসিয়া অনেক সময় পরস্পরের মনোদুঃখ ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিত। রত্নেশ্বরের পত্নী প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে আত্মীয় স্বজনের সহিত শেষ দেখা করিয়া অনন্তের পত্নীর নিকট বিদায় লইতে আসিল।

বণিকপত্নী অনন্তপত্নীর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল অনন্তপত্নী

পতিপ্রদত্ত কাগজখানি হস্তে লইয়া এক এক বার পড়িতেছে আবার কখনও বক্ষঃস্থলে কখনও বা মস্তকে রক্ষা করিতেছে । মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে । এতই নিবিষ্টচিত্ত যে তাহার গৃহ প্রবেশ কিছুই জানিতে পারে নাই । বণিকপত্নী সম্মুখবর্ত্তিনী হইলে অনন্তের স্ত্রী কাগজখানি উপাধান নিম্নে লুকায়িত করিয়া উঠিয়া বসিল । বণিকপত্নী ঐ কাগজখানি দেখিতে চাহিলে অনন্তের স্ত্রী প্রথমতঃ অস্বীকৃতা হইল কিন্তু বণিকপত্নীর আগ্রহাতিশয় দৃষ্টে কাগজখানি তাহার হস্তে দিল ।

বণিকপত্নী শ্লোকটী পড়িয়া তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল । সহসা কার্য্য করা উচিত নয় এই কথাটী পড়িতে পড়িতে তাহার প্রাণত্যাগের সংকল্প শিথিল হইতে লাগিল । ভাবিল আত্মহত্যা মহাপাপ । শুনিয়াছি আত্মহত্যা কারীর নরকেও স্থান নাই, তাহার আত্মার সদগতি নাই । ইহজন্ম তো কষ্টেই গেল; এখন যাহাতে অনন্তকাল অশেষ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতে হইবে তাহাই করিতে উদ্যত হইয়াছি । আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখি অদৃষ্টে কি আছে । অদ্য এই কাগজখানিই আত্মহত্যারূপ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিল । এখানি আমার পাওয়া আবশ্যক । কি জানি, স্ত্রীলোকের মন । যদি কখনও মনে আবার ঐ পাপ ইচ্ছা জন্মে তবে এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া হৃদয়ে বল সঞ্চার করিতে পারিব । " এই ভাবিয়া অনন্তের পত্নীকে বলিল সখি, এই কাগজখানি আমাকে প্রদান কর । ইহাতে আমার যে উপকার হইয়াছে তাহার মূল্য স্বরূপ তোমাকে একশত টাকা দিতেছি ।

অনন্তের পত্নী বলিল " সখি, তুমি তো জান, স্বামীর সহিত এ পর্য্যন্ত আমার কোনই সংশ্রব হয় নাই । ইহাই স্বামীর প্রথম দান, ইহা স্বামীর

রত্নাকর। বিশেষতঃ ইহা আত্মহত্যা রূপ মহাপাতক হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছে। সুতরাং ইহা আমার পক্ষে অমূল্যধন। ইহা দর্শন, বা হৃদয়ে রক্ষা করিলে আমার সন্তাপিত চিত্ত শীতল হয়। অতএব প্রাণান্তেও আমি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না।" এই বলিয়া অনন্তের পত্নী তাহার আত্মহত্যার সংকল্প, স্বামী দর্শন এবং স্বামী কর্তৃক শ্লোক প্রদানের বিবরণ বর্ণনা করিল।

বণিকপত্নী বলিল "সখি, আমিও আত্মহত্যার সংকল্প করিয়া তোমার সহিত শেষ দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এই কাগজখানি আমাকে সে মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছে। আমি অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোক; কি জানি আবার যদি কখন চিত্তবিকৃতি ঘটে। সেই ভয়ে এই কাগজখানি সর্ব্বদা নিকটে রাখিতে চাই। আমি তোমাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতেছি। কৃপা করিয়া কাগজখানি আমাকে দিয়া আমাকে মহাপাতক হইতে রক্ষা কর।"

অনন্তের স্ত্রী ভাবিল "পড়িতে পড়িতে শ্লোকটী মুখস্থ হইয়া গিয়াছে এবং হৃদয়ের প্রত্যেক স্তরে উহা মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ বাহ্য লিপিত আর প্রয়োজন কি? বণিকপত্নী সহস্র মুদ্রা দিতে চাহিতেছে, ঐ মুদ্রা পিতা মাতাকে দিলে পতির কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে।" এই ভাবিয়া সে বণিক-পত্নীর প্রস্তাবে স্বীকৃতা হইল। যাহাতে কোন সন্দেহের কারণ না হয় তজ্জন্য তাহার মাতার সমীপে আদান প্রদানের কথা বলিয়া দিল।

বণিকপত্নী গৃহ হইতে সহস্র মুদ্রা আনয়ন করিল। অনন্তপত্নী বণিক-পত্নীকে লইয়া মাতার নিকট গমন করিল এবং মাতার নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া মাতা ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সকাশে বণিকপত্নীকে ঐ কাগজখানি প্রদান করিল বণিকপত্নী সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলে সে সমস্তই মাতাকে প্রদান করিল।

সহসা এক সঙ্গে এত অর্থাগম দেখিয়া অনন্তের শ্বশুর শাশুড়ী ও পরিজন-বর্গ বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল "অনন্ত মহা পণ্ডিত বটে। যাহার কয়েক পংক্তি লেখার মূল্য সহস্র মুদ্রা, সে সাধারণ লোক নহে। তবে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাতেই সমস্ত মাটি হইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া সকলেই অনন্তের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল।

যাহা হউক অতঃপর অনন্তের অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল। অর্থের অপার মহিমা! এক্ষণে এই ঘোর কলিকালে অর্থই একমাত্র সার বস্তু। নিতান্ত হীন প্রকৃতি, অসৎ বুদ্ধি, মহামূর্খও অর্থবলে মহৎ বলিয়া গণ্য হইতেছে, পক্ষান্তরে অর্থাভাবে প্রকৃত সদগুণসম্পন্ন বিদ্বান ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি হীনভাবে কষ্ট পাইতেছে। অর্থ জন্য লোকে কত কত মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতেছে। কলিকালে অর্থ না হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না। ধন্য কলি! ধন্য কলির জীব! ধন্য অর্থ!! "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।" এ কথা বোধ হয় এ কালে কেহ বুঝিবে না।

অর্থের অনন্ত মহিমায় অনন্তের পরিধানে নূতন বস্ত্র হইল। বহুদিনের জটা কর্ত্তিত হইয়া মস্তক তৈল সিক্ত হইল। এখন অনন্তকে স্নানাহার করিতে বলা হয়। অনন্ত খায় দায় আর মনে মনে হাসে।

দ্বাদশ বর্ষ প্রায় শেষ হইল, আর একদিন মাত্র অবশিষ্ট। শেষ দিন রাত্রে রত্নেশ্বর গৃহে ফিরিল। এই অষ্টাদশ বর্ষকাল সে বহু বাধা বিঘ্ন ও বিপদে পতিত হইয়া ভগবানের কৃপায় অগাধ ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছে। বহু সংখ্যক তরণী নানাপ্রকার দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া গভীর রাত্রিকালে

গ্রামের নিকটবর্ত্তী নদীর ঘাটে উপস্থিত হইয়াছে। গভীর রজনী, চতুর্দ্দিক নিঃশব্দ। রত্নেশ্বর ভাবিল "এত দীর্ঘকাল পর বাড়ী ফিরিলাম, না জানি গৃহের কি অবস্থা হইয়াছে। অদ্য রাত্রে গৃহে যাইব না, গুপ্তভাবে গৃহের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আসি।" এই ভাবিয়া নাবিক ও অনুচরগণকে তদনুরূপ আদেশ প্রদান করিল, এবং সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে আত্মরক্ষার জন্য একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারী হস্তে লইয়া নিঃশব্দে তরণী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সংগোপনে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

প্রাচীর সন্নিকট বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া রত্নেশ্বর ভিতরে প্রবেশ করিল। দেখিল পৌরজন সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন। অন্ধকারে যাহা দেখিতে পাইল তাহাতে বুঝিতে পারিল যে গৃহ পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে সে কিঞ্চিত বিস্মিত হইল, অন্তঃকরণে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। ক্রমে শয়ন গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়া গবাক্ষদ্বার দিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল তাহার পত্নী পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিতা, ক্রোড়ের নিকটে একটী সুশ্রী যুবক নিদ্রা যাইতেছে। গৃহাভ্যন্তরস্থ প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে রত্নেশ্বর দেখিতে পাইল প্রকোষ্ঠ উত্তমরূপে সজ্জিত। কোথায় তাহার অবর্ত্তমানে গৃহ ভগ্ন ও হতশ্রী হইবে, তাহা না হইয়া গৃহশ্রী পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছে। দেখিয়া রত্নেশ্বর ভাবিল তাহার সুদীর্ঘ প্রবাসে পত্নী প্রবৃত্তি দমনে অসমর্থা হইয়া দুশ্চরিত্রা হইয়াছে এবং এই সুন্দর যুবকটীকে উপপতি করিয়া তাহার প্রদত্ত অর্থে বাড়ীঘর উত্তমরূপে সাজাইয়া আমোদ প্রমোদ ও স্ফুর্ত্তিতে দিন কাটাইতেছে। ক্রোধে রত্নেশ্বরের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল; পাপিষ্ঠা ও

পাপিষ্ঠের পাপের প্রতিফল এখনই প্রদান করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়া কৌশলে গবাক্ষপথে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

রত্নেশ্বরের পত্নী ও পুত্র সুখে নিদ্রা যাইতেছে। দুর্দ্দমনীয় জিঘাংসায় রত্নেশ্বর তখন উন্মত্ত। একই আঘাতে উভয়ের শিরচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে রত্নেশ্বর অসি উত্তোলন করিয়া আঘাত করিতে উদ্যত হইল। আর এক নিমেষ মাত্র! রত্নেশ্বর স্বহস্তে সাধ্বী পত্নী এবং সচ্চরিত্র ও কৃতবিদ্য পরম সুন্দর পুত্রকে স্বহস্তে হত্যা করিবে। সহসা রত্নেশ্বরের চক্ষু গৃহভিত্তির উপর নিপতিত হইল। দেখিল একখানি কাগজে বৃহদক্ষরে কি যেন লেখা রহিয়াছে পড়িয়া দেখিল—

" সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া মবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্ ।

বৃণুতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ ॥ "

পাঠ করিয়া রত্নেশ্বরের চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। উত্তোলিত অসি আর নিম্নে পতিত হইল না। ভাবিল " আমি যাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই অনুসন্ধান করিলাম না। এ যুবক পত্নীর উপপতি না হইয়া অন্য কেহও হইতে পারে। গৃহের উন্নতির অন্য কারণ থাকিতে পারে। সুতরাং একটু অপেক্ষা করিয়াই ইহাদের দণ্ডবিধান করি। ইহারা এখন আমার হস্তের মধ্যে রহিয়াছে। যদি ইহারা প্রকৃতই অপরাধী হয় তাহা হইলে এইরূপ অতর্কিতভাবে আমাকে অসি হস্তে ভীষণ বেগে শিয়রে দণ্ডায়মান দেখিয়া ইহারা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে, সুতরাং আমার কোন অনিষ্ট করিবার শক্তি ইহাদের থাকিবে না। আর যদি পলায়ন করিতে বা অত্যাচার করিতে উদ্যত হয় তদ্দণ্ডেই উভয়ের প্রাণদণ্ড করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া

রত্নেশ্বর স্ত্রীকে ডাকিতে লাগিল।

রত্নেশ্বরপত্নীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে স্বামীর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমতঃ তাহাকে প্রেতমূর্ত্তি মনে করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রত্নেশ্বরপত্নী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সে তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিল " ইহা স্বামীর প্রেতমূর্ত্তি হইলেও আমার পক্ষে পরম দেবতা। এ জন্মে এ মূর্ত্তি যে পুনরায় দেখিতে পাইলাম ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। " এই মনে করিয়া উঠিয়া বসিল। রত্নেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল " এ ব্যক্তি কে ? " পত্নী বলিল " আপনি আমার স্বামীর প্রেতমূর্ত্তি হইলেও আমার পরম দেবতা, সুতরাং আমার প্রণাম গ্রহণ করুণ। এটী আপনার পুত্র। যখন আপনি প্রবাসে গমন করেন তখন আমি পঞ্চম মাস গর্ভবতী ছিলাম ইহা বোধ হয় আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। আপনি গৃহ পরিত্যাগের পাঁচ মাস পর এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া আপনার শ্রীমূর্ত্তিধ্যান করিতে করিতে এই সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিয়াছি। এক্ষণে বলুন আপনি কি স্বশরীরে আমার স্বামী না তাঁহার প্রেতমূর্ত্তি। ' এই বলিয়া রত্নেশ্বরপত্নী মূর্চ্ছিতা হইয়া শয্যায় পতিত হইল। রত্নেশ্বর ইহা শ্রবণে হতবুদ্ধি হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। অল্পক্ষণ পরেই পত্নী সংজ্ঞালাভ করিলে রত্নেশ্বর বলিল " সাধ্বি, আমি তোমার প্রকৃত স্বামী. তাহার প্রেতমূর্ত্তি নহি। " এই বলিয়া সংক্ষেপে তাহাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া ফেলিল। তখন রত্নেশ্বরপত্নী উঠিয়া পতির চরণ ধারণ করিল,এবং অশ্রুধারায় পদতল ধৌত করিয়া দিল। রত্নেশ্বর পত্নীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বহুদিনের বিচ্ছেদ বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে লাগিল।

এই গোলযোগে পুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। তখন রত্নেশ্বরপত্নী পুত্রের হস্তাকর্ষণ করিয়া বলিল "পুত্র এই দেখ তোমার পিতা আসিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত পিতৃচরণ দর্শনের সৌভাগ্য তোমার ঘটে নাই। এক্ষণে পিতাকে প্রণাম কর এবং ঐ পবিত্র পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া পুত্র জন্ম সার্থক কর।"

মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রের চমক ভাঙ্গিল। পুত্র উঠিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় দিল। রত্নেশ্বর পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ স্রোতে ভাসিতে লাগিল। গৃহ যেন আনন্দ সলিলে প্লাবিত হইল।

উপস্থিত উত্তেজনা কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে রত্নেশ্বর বলিল "পত্নি, আমি পুত্রকে তোমার নিকট শায়িত দেখিয়া বিষম দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ জিঘাংসা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া তোমাদের উভয়কেই হত্যা করিতে অসি উত্তোলন করিয়া ছিলাম। কিন্তু ঐ যে অমূল্য কথাটী তোমার গৃহভিত্তির কাগজে লেখা রহিয়াছে উহাই আমাকে অদ্য এই ভীষণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। হায়! হায়! আমি কি করিতেছিলাম! এমন সাধ্বী পত্নী এবং এমন সুকুমার পুত্রকে আমি স্বহস্তে বধ করিতে ছিলাম। এই দুষ্কার্য্য সম্পন্ন হইলে যখন প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিতাম তখনি অসহনীয় দুঃখে আমাকেও আত্মঘাতী হইতে হইত। স্ত্রীহত্যা পুত্রহত্যা এবং আত্মহত্যা এই ত্রিবিধ মহাপাতক হইতে অদ্য ঐ স্বর্গীয় বাক্যটী আমাকে রক্ষা করিয়াছে, অনন্ত নরক যন্ত্রণা হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছে। সুদীর্ঘ প্রবাসে ভীষণ কষ্টভোগ করিবার পর এই

যে অপার সুখলাভ করিলাম ঐ পত্রিকাখানিই আমাকে তাহা দিয়াছে। আমি প্রায় দশ কোটী মুদ্রা লইয়া আসিয়াছি। অদ্য তোমাদিগকে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা করিলে এ সমস্ত কোথায় থাকিত, কে উপভোগ করিত? ঐ পত্রিকাখানি অদ্য আমাকে যে মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং যে অমূল্য রত্ন ও অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রদান করিয়াছে তাহার তুলনায় উহার প্রদাতাকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেও প্রকৃত প্রত্যুপকার করা হয় না। সাধ্বি, শীঘ্র বল ঐ অমূল্য বাক্য তুমি কাহার নিকট পাইলে? আমি সর্ব্বস্ব দিয়া এবং আজীবন তাহার চরণ সেবা করিয়া ইহার কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতে চেষ্টা করিব।"

রত্নেশ্বরের পত্নী ঐ পত্রিকা প্রাপ্তির বিবরণ সবিস্তার বর্ণনা করিয়া বলিল "নাথ, উহা আমাকেও আত্মহত্যারূপ ঘোর পাতক হইতে রক্ষা করিয়াছে। উহা না পাইলে এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে ঐ শ্রীচরণ দর্শন আর ঘটিত না। আমি ইহার পরিবর্ত্তে সহস্র মুদ্রা দিয়াছি। কিন্তু অদ্য যাহা হইল তজ্জন্য সর্ব্বস্ব দিলেও ইহার প্রকৃত মূল্য হয় না এ কথা যথার্থ বটে। যাহা হউক রজনী প্রভাতে ইহার বিহিত করা কর্ত্তব্য।"

রজনী প্রভাত হইল। সুদীর্ঘ কালান্তে রত্নেশ্বরের প্রত্যাগমনে প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের সমাগমে গৃহ পূর্ণ হইল। আনন্দ কোলাহলে ও মহোৎসব শব্দে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ভারে ভারে দ্রব্য সম্ভার নৌকা হইতে গৃহে আসিয়া স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। পৌরজন ও ভৃত্যগণ দ্রব্যগুলিকে যথাস্থানে রক্ষা করিতে ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিল। রত্নেশ্বরের উপযুক্ত পুত্র মহাউৎসাহে সমস্ত বিষয়ের সুবন্দোবস্ত ও ভৃত্যবর্গকে সমুচিত

আদেশ প্রদান করিতে লাগিল। রত্নেশ্বর সমাগত ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ আদর অভিবাদন প্রভৃতি করিয়া রাত্রিকালের বৃত্তান্ত সকলের নিকট সবিস্তার বর্ণনা করিল এবং অনন্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই কবিতাটী সকলকে দেখাইয়া বলিল "এই কবিতাটি আমাদিগকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছে তাহা আপনারা সকলেই শ্রবণ করিলেন। আমার পত্নী ইহার মর্য্যাদাস্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছে। কিন্তু ইহা আমার যে মহোপকার সাধন করিয়াছে তাহাতে ইহা অমূল্য সন্দেহ নাই। অতএব আমি স্থির করিয়াছি আমি যে সম্পত্তি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি তাহার অর্দ্ধ অংশ মর্য্যাদা স্বরূপে ইহার প্রদাতাকে প্রদান করিব।" উপস্থিত সকলেই রত্নেশ্বরের প্রস্তাব অনুমোদন করিল। রত্নেশ্বরের বৃত্তান্ত গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল, অনন্তের শ্বশুর গৃহের সকলেও ইহা শ্রবণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রত্নেশ্বর কাল বিলম্ব না করিয়া অনন্তের শ্বশুর গৃহে উপনীত হইল। দেখিল অনন্ত মলিনবেশে মৌনাবলম্বন করিয়া উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। রত্নেশ্বরের সঙ্গে অনেক লোক অনন্তকে দেখিতে আসিল। গতকল্য দ্বাদশ বৎসর শেষ হইয়া গিয়াছে। অনন্ত এক্ষণে কি ভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে, শ্বশুর শাশুড়ী পত্নী প্রভৃতিকেই বা কি বলিয়া যাইবে, এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় বহুলোকে পরিবৃত হইয়া রত্নেশ্বর সেখানে উপস্থিত হইল এবং

সহসা অনন্তের পদতলে পতিত হইয়া বলিল " মহাত্মন্‌, আপনি কি ছদ্মবেশী কোন দেবতা ? কেননা আপনি একটী মাত্র কবিতা দ্বারা যেরূপে পাঁচটী মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, আমাকে যে অমূল্য বস্তু লাভে সমর্থ করিয়াছেন, যেরূপে দূরপনেয় কলঙ্ক ও অনন্ত নরক হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন তাহাতে আপনাকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় না। এই দীন বেশ, এই দুরবস্থা আপনার ন্যায় পরম পণ্ডিত মহাপুরুষের উপযুক্ত নহে। আমি আপনাকে যথাশক্তি পূজা করিব এবং কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিব স্থির করিয়াছি। আপনার এ অবস্থা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

তখন অনন্ত বলিল " বণিকবর, আমার এই দুরবস্থা স্বকৃত। আমি কোন কারণ বশতঃ দ্বাদশ বৎসর শ্বশুরালয়ে বাস করিবার ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম। নিতান্ত অসহ্য হইলেও সেই কৃচ্ছ্র ব্রতকাল শেষ হইয়াছে। আমি উন্মাদ বা বিকৃতমস্তিষ্ক হই নাই। আমার এই ব্রতের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করা বা পত্নীর সহিত দেখা বা আলাপ পর্য্যন্ত করাও নিষেধ ছিল। কল্য দ্বাদশ বর্ষ শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি অদ্য গৃহ গমনার্থ প্রস্তুত হইতেছি। আমার প্রদত্ত কবিতাতে আপনার যদি কোন উপকার হইয়া থাকে তবে ইহা ভগবানের কৌশল মাত্র, সে জন্য কোন প্রত্যুপকারের প্রয়োজন নাই। শুনিলাম আপনার পত্নী এজন্য আমার পত্নীকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। এই সামান্য কথা কয়টির জন্য এই অর্থ প্রদান নিতান্তই অতিরিক্ত কর্ম্ম হইয়াছে। সুতরাং আর কিছু প্রয়োজন নাই, এক্ষণে আমি বিদায় হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করি।"

রত্নেশ্বর বলিল " সে কি কথা। আপনার ঐ কথা কয়টী অমূল্য বস্তু। প্রথমতঃ উহা আমার পত্নীকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিয়াছে। সেই জন্যই সে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছে, অমূল্য জীবনের পরিবর্তে ইহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তৎপর গতরাত্রে আমি যে পুত্রহত্যা স্ত্রীহত্যা এবং পরিশেষে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহা আপনার এই হস্ত লিপিই নিবারণ করিয়াছে। যাহাহউক আপনি একবার আমার গৃহে পদধূলি প্রদান করিয়া গৃহে গমন করুন। আপনার গৃহ গমনের সুবন্দোবস্ত আমিই করিয়া দিতেছি। আমরা সপরিবারে আপনার পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।" রত্নেশ্বরের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে এড়াইতে না পারিয়া অনন্ত রত্নেশ্বরের গৃহে গমন করিল। এদিকে রত্নেশ্বরের পত্নী অনন্তের পত্নীকে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিল।

উভয়ে রত্নেশ্বরের গৃহে আগমন করিলে রত্নেশ্বর তাহাদের পরিচর্য্যার জন্য বহু দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিল এবং সমস্ত পরিজনবর্গ সহ তাহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইল। অনন্তের বহুদিনের অযত্নে রক্ষিত কেশ নখাদি কর্ত্তিত হইল, সুগন্ধ তৈলে কেশ সিক্ত ও শরীর মার্জ্জিত হইল। স্নানান্তে রত্নেশ্বর স্বহস্তে অনন্তকে বহুমূল্য বসন ভূষণে ভূষিত করিয়া উত্তম আসনে উপবেশন করাইল। রত্নেশ্বরের পত্নীও স্বহস্তে অনন্তের স্ত্রীকে স্নান করাইয়া এবং অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণে সজ্জিত করিয়া অনন্তের পার্শ্বে আনিয়া বসাইয়া দিল। অনন্ত ও তৎপত্নী মেঘমুক্ত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

তখন রত্নেশ্বর করজোড়ে বলিতে লাগিল মহাত্মন্, আপনি আমাদের প্রাণদাতা। আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনারই প্রদত্ত বলিতে হইবে, কেননা গত

ঐরূপ নৃশংস ভাবে আমাদের অপমৃত্যু ঘটিলে এসম্পত্তি সমস্তই পড়িয়া থাকিত। আমি প্রায় দশ কোটি মুদ্রা লইয়া গৃহে আসিয়াছি তাহার অর্দ্ধেক পঞ্চকোটি মুদ্রা আপনাদিগকে প্রণামী দিতেছি, দয়া করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা পতি পত্নী পুত্র এবং সম্পত্তি সমস্তই এক্ষণে আপনার। আমি যাহা প্রণামী দিতেছি তাহা পর্য্যাপ্ত না হইলেও গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ঋণমুক্ত করুন, এই প্রার্থনা। যদি ইহাতে অমত করেন তবে আপনাদেরই প্রদত্ত জীবনত্রয় আপনাদের চরণে বিসর্জ্জন করিব। ধন্য সেকালের সাধুতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি।

অনন্ত অনেক আপত্তি করিলেন কিন্তু রত্নেশ্বরের দৃঢ় সংকল্প কিছুতেই বিচলিত হইল না। সুতরাং অনন্তকে সম্মত হইতে হইল। তখন নানারূপ দ্রব্য সামগ্রী এবং পঞ্চকোটী মুদ্রাতে অনন্তের চতুর্দ্দিকে গৃহপ্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। বহুলোকে এই দৃশ্য দেখিতে সেখানে সমাগত হইল এবং সকলেই অনন্ত ও রত্নেশ্বরকে ধন্যধন্য বলিতে লাগিল। অনন্তের শ্বশুর শাশুড়ী ও তৎপরিজনবর্গ অনন্তের বিদ্যার প্রভাব এবং সৌভাগ্য দর্শনে চমৎকৃত হইল, এবং তাহার ও তৎপত্নীর প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল তজ্জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতে লাগিল।

অনন্ত পত্নীসহ শ্বশুরালয়ে গমন করিল। শ্বশুর শাশুড়ী এবং বাড়ীর সকলে অনন্তের নিকট নানাপ্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। অনন্ত সকলকেই মধুর বচনে শান্ত করিল। রত্নেশ্বরপ্রদত্ত অর্থরাশি হইতে লক্ষ মুদ্রার একবস্তা লইয়া অনন্ত শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রণামী দিয়া প্রণাম করিল। বহু অনুরোধে সে দিন অনন্ত শ্বশুরালয়ে অতিবাহিত করিল। তখন তাহাদের

আদর কত ! সমস্ত পরিজন তাহাদের সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল, শ্বশুর গৃহে মহাউৎসব লাগিয়া গেল। অনন্তের এই অসম্ভাবিত সৌভাগ্য ও অর্থ প্রাপ্তি দর্শনে কেহ বিস্মিত, কেহ বা স্তম্ভিত হইল কেহ বা হিংসায় জ্বলিতে লাগিল।

রত্নেশ্বর অনন্তের গৃহ গমনের সমস্ত বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। বহুসংখ্যক শকট, ভারবাহী এবং রক্ষিবর্গসহ অনন্ত ও তৎপত্নী শিবিকারোহণে গৃহযাত্রা করিল। অনন্ত পূর্ব্বদিন তাহার গৃহপ্রত্যাগমন সংবাদ পিতার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। অনন্তের আগমন প্রত্যাশায় রামশর্ম্মা ও তৎপত্নী উদ্গ্রীব হইয়াছিল। অনন্ত পত্নীসহ গৃহে উপনীত হইলে হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া রামশর্ম্মা দৌড়াইয়া গিয়া অনন্তকে ক্রোড়ে ধারণ করিল, অনন্তের মাতা পুত্রবধূকে ক্রোড়ে লইল। উভয়ে আনন্দাশ্রুতে পুত্র ও পুত্রবধূর মস্তক সিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তের দ্রব্যসম্ভার ও অর্থ রাশিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। অনন্ত অপরিমিত অর্থ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে এ সংবাদ অনেকেই শুনিয়াছিল। এক্ষণে রামশর্ম্মার গৃহে অনন্তের দর্শনাকাঙ্খী বালবৃদ্ধ বনিতার সহস্রা জনতা জমিয়া গেল।

রামশর্ম্মা সমস্ত বস্তু যথাস্থানে সুরক্ষিত করিলেন। কয়েকদিন পর্য্যন্ত গৃহে উৎসব লাগিয়া রহিল। বৃদ্ধ রামশর্ম্মা উপযুক্ত পুত্রের হস্তে সংসার সমর্পন করিলেন। ক্রমে তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহের স্থানে বৃহদায়তন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল; প্রকাণ্ড চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অনন্ত অধ্যাপনা করিতে লাগিল। ধনে জনে ও বিদ্যায় অনন্ত দেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইল।

রজনীতে পাঠক পাঠিকার নিকট একণে আমাদের এই সানুনয় অনুরোধ তাঁহারা যেন এই কথা কয়টী সর্ব্বদা স্মরণে রাখেন—

" সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া মবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্ ।
বৃণতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ ॥ "

প্রাক্তন

—**—

একদা ভূপতি এক ত্যজিয়া সংসার-
ত্যজি স্বর্ণ সিংহাসন-পুত্র পরিবা
কৌপীন সম্বল মাত্র করিয়া গ্র
তপস্যা করিতে বনে করিল গমন

সংসার করিতে ত্যাগ দেখিয়া রাজ
অনেক খাসিরো হ'ল বৈরাগ্য উদ
করস্থ পাঁচুনী খুঁপি দূরে নিক্ষেপি
সেও সে মুহূর্ত্তে গেল অরণ্যে চলিয়া

উটজ কুটীর রচি গণ্ডকীর তী
আরম্ভিলা উগ্রতর তপ অনাহা
ক্ষুৎপিপাসায় ক্রমে কণ্ঠাগত প্র
তবু দোঁহে বারিবিন্দু নাহি করে পান

জীবন সংশয়াপন্ন দেখিয়া দোঁহার
এল এক দেবদূত' লয়ে খাদ্যভার;
পায়স মিষ্টান্ন নানা ফল সুরসাল,
রাজার নিমিত্ত আনে ভরে স্বর্ণথাল।

কদন্ন মৃত্তিকা পাত্রে বাদীর কারণ
তৎসহ মরীচ দুটো কিঞ্চিৎ লবণ;
এক যাত্রার ভিন্ন ফল—বাদী ক্ষোভান্বিত
বুঝিয়া মনের ভাব ক'ন দেবদূত;—

যে যাহা সঞ্চয় করে অতীত জীবনে,
সেই তার ফলভোগ করে বর্ত্তমানে;
কর্ম্ম অনুরূপ ফল বিধির বিধান
কর্ম্মে হয় উচ্চগতি, কর্ম্মে নিম্ন স্থান।

পূর্ব্ব জন্মে ছিলা যোগী এই মহাজন,
যোগভ্রষ্ট হ'য়ে এবে হ'য়েছে রাজন্;
বিগত জীবনে তব নাছিল সুকৃতি
তাইতে এ জন্মে তুমি ভুঞ্জিছ দুর্গতি।

আজি যে বসিয়ে হেথা পেলে অন্নজল,
সে তোমার এই কৃচ্ছ্র তপস্যার ফল;
এখনি উভয়ে যদি ত্যজ যোগাসন,
তোমার রয়েছে খুর্পি, ওঁর সিংহাসন।

ডাকঘর।

—**—

ভারতবর্ষে ডাকের প্রচলন কবে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মোগল বাদশাহগণের আমলে ডাকের সুচারু বন্দোবস্ত ছিল। অশ্বারোহীর দ্বারা পত্র বাহিত হইত। তাহারা দিনে ৫০ ক্রোশ অতিবাহন করিতে পারিত। বাদশাহের সুবিধার জন্যই ঐ ডাকের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যে তৎকালে চিঠীপত্র প্রেরণের প্রথা ছিলনা।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে বিভিন্ন কুঠীর মধ্যে চিঠী পত্র চলাচলের ব্যবস্থা তাঁহাদিগকে করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্তির পর সরকারী চিঠী পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহাতে রীতিমত ডাকবিভাগ খোলা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইবের আদেশে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ হইতে প্রত্যহ পত্র প্রেরণের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। পোষ্টমাষ্টার ও তাঁহার সহকারীগণ প্রতি রাত্রিতে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে উপস্থিত থাকিয়া কোম্পানীর প্রত্যেক উপনিবেশের জন্য পত্র বাছিয়া পৃথক ২ থলিয়াতে পুরিয়া কোম্পানীর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিতেন। কুঠীর প্রধান কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কাহারও ডাকের ব্যাগ খোলার অধিকার ছিলনা। কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ সরকারী কাগজ পত্রের সঙ্গে নিজেদের চিঠীপত্র বেখরচায় পাঠাইতেন। ফোর্ট উইলিয়ম

দুর্গস্থিত কৌন্সিল দেখিলেন যে এভাবে কাজ চলিতে পারে না। ১৭৭৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী তাঁহারা মন্তব্য করিলেন যে ডাকে অনেক তুচ্ছ ও অসঙ্গত ওজনের পুলিন্দা দেওয়া হইয়া থাকে, ডাকবিভাগের কোনও প্রণালী নাই বা ঐ বিভাগের উপর তত্বাবধানও কিছু হইতেছে না।

এত মন্থর গতিতে ডাক চলিত যে কোন সময়ে কৌন্সিলের প্রেসিডেণ্ট খুব সত্বরতার সহিত কোন কিছু পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে বিশেষ "কাশীদ" দ্বারা প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেন। সাধারণ ডাকের অর্দ্ধেক সময় মধ্যে গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে ঐ কাশীদের কখনও ত্রুটী হইত না। এই সব কারণে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ডাকবিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন হইল। একজন পোষ্টমাষ্টার জেনেরেল নিযুক্ত হইলেন এবং বেসরকারী পত্রের উপর মাসুল স্থাপিত হইল। দূরত্ব অনুসারে মাসুলের হার ধার্য্য হইল; দুই আনার কম মাসুল ছিল না। মাসুলের হার পরে সময়ে২ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমে এক তোলা পর্য্যন্ত ওজনের পত্রের কলিকাতা হইতে চন্দননগর পর্য্যন্ত ৵০, বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ৵০, বহরমপুর পর্য্যন্ত ।০, গয়া পর্য্যন্ত ।৶০, পাটনা পর্য্যন্ত ।৶০, মুজাপুর পর্য্যন্ত ॥০, এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ॥৵০, সুলতানপুর পর্য্যন্ত ॥৶০, লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত ॥৶০, এইরূপ ছিল। বোম্বাইর মাসুল ১।৵০ ছিল।

হরকরাদের পৃষ্ঠে চর্ম্মের থলিয়াতে চিঠীপত্র বাহিত হইত। প্রতি ৪ ক্রোশ অন্তর হরকরাদের পরিবর্ত্তন হইত। রাত্রিতে রাস্তা আলো করিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে মশালচি থাকিত, এবং বন্য প্রদেশে হিংস্র জন্তু তাড়াইবার জন্য তাহাদের সঙ্গে টিকারা বাদ্যকর থাকিত। ২০ তোলা

জনের পুলিন্দাগুলি বাক্সে রাখিয়া তাহা ভারে করিয়া লওয়া হইত। পার্শেলের ডাককে বাঙ্গি ডাক বলিত, হরকরা ডাক অপেক্ষা ইহা অনেক বেশী সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিত। কলিকাতা হইতে মীরাট পঁহুছিতে হরকরার ডাকে ১২ দিন লাগিত। বর্ষাকালে ১৩ হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত লাগিত। মফস্বলে জেলার সদর ষ্টেশনে কালেক্টারই পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। তাঁহার অধীনে কতিপয় বিশেষ কর্ম্মচারী চিঠী সিল্কিল করিতেন এবং ৩০।৪০ জন হরকরা ছিল, তাহাদের বেতন ১৮০৪ সালে মাসিক ৩৲ করিয়া ছিল।

এক সময়ে দস্যু কর্ত্তৃক খুবই ডাক লুট হইত। ১৮০৮ সালে কানপুর ও ফতেগড়ের মধ্যে ডাক গড়পরতায় সপ্তাহে একদিন করিয়া লুট হইতেছিল। ইহার ফলে ১৮০৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের গবর্ণমেণ্টের আদেশে টাকা, জহরত, পকেটঘড়ী ইত্যাদি ডাকে প্রেরণ বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাঙ্ক নোট অর্দ্ধাংশ করিয়া প্রেরণ পক্ষে নিষেধ হইয়াছিল না।

বোম্বাই ও কলিকাতার মধ্যে একটী বেসরকারী ডাকও ছিল। তদ্দ্বারাই প্রিবি কাউন্সিলে আফিম ঘটিত একটী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিবরণ সরকারী ডাক কলিকাতার জেনেরেল পোষ্টাফিসে পঁহুছার ৩৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রচারিত হইয়াছিল

কোম্পানীর আমলে ১৮৫৪ সালের ১৭ আইন বিধিবদ্ধ হওয়াই ডাক বিভাগের সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থা। তৎপূর্ব্বে ১৮৫০ সালে বাঙ্গালা হইতে মিঃ সিসীল বীডন, মান্দ্রাজ হইতে মিঃ ফর্ব্বেশ, বোম্বাই হইতে মিঃ কোর্টেনি

ইঁহাদিগকে লইয়া একটী কমিশন গঠিত হয়। ডাকবিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহারা রিপোর্ট করিতে আদিষ্ট হয়েন। ১৮৫১ সালে ঐ রিপোর্ট দাখিল হয়। তাহারই ফলে উল্লিখিত আইন পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী দূরত্ব অনুসারে আর মাশুল গৃহীত হয় না, ওজনের উপরেই মাশুল গৃহীত হইতেছে। ডাকটিকিটেরও প্রচলন হইয়াছে এবং ব্যারিং চিঠীর উপর ডবল মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। চিঠীর উপরে প্রেরকের নাম লিখা বন্ধ হইয়াছিল। সরকারী চিঠীর উপরে ডাকটিকিট না দিলেও চলিত, কিন্তু ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারীকে সরকারী চিঠী কিনা তাহা লিখিয়া দিতে হইত।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ১২২ মাইল ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথ খুলিলে, রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলগাড়ীতে পশ্চিমের ডাক যাইতে লাগিল। তথা হইতে ডাকের গাড়ীতে ডাক যাইত। ১৮৫৫ সালে প্রতিঘণ্টায় ১০৷৷০ মাইল হিসাবে ডাক যাইত। সে হিসাবে কলিকাতা হইতে ৺কাশীধামে যাইতে ৪০ ঘণ্টা লাগিত।

ডাক বিভাগের বর্ত্তমান প্রসার সম্বন্ধে কিছু না লিখিলে এই সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, ঐ বৎসরে ৮৯০৭৪ জন ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন এবং ১৯৪৮৫টী ডাকঘর, এবং ১৫৭৩৯৫৷৷ মাইল ডাকের লাইন ছিল। এই বৎসরে ১০৯৪০০০০০০ এর উপর চিঠীপত্রাদি সর্ব্বপ্রকার ডাক দ্রব্য ডাকযোগে বাহিত হইবার জন্ম ডাকে দেওয়া হইয়াছে এবং ৩ কোটী ৫২৷৷ লক্ষ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট মাশুলের জন্ম বিক্রয় হইয়াছে। ৭১৷৷ কোটী টাকার

৩৬০০০০০০ এর উপর মণিঅর্ডার হইয়াছে, ভ্যালুপেয়েবলে দ্রব্য প্রেরণে ব্যবসায়ী প্রভৃতি প্রায় ১২॥০ কোটি টাকা আদায় করিয়াছেন। ১১৩ কোটীর উপর মূল্যের ৩৭৫০০০০ এর উপর ইনসিওর দ্রব্য ডাকঘরে দেওয়া হইয়াছে। এই বৎসরে ডাকঘর ১৪৮/ মণেরও উপর কুইনাইন সাধারণের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। সেবিংস ব্যাঙ্কে যে ১৬৭৭৪০৭টী হিসাব ছিল, তাহাতে পোণে উনিশ কোটীর উপর টাকা আমানত ছিল। এই বৎসরে ডাকবিভাগের মোট আয় ৪৭০৫০০০০, মোট ব্যয় ৪৩২৫০০০০, উদ্বৃত্ত ৩৮ লক্ষ টাকা।

অতীতের ঝঙ্কার।

স্বপন মুরলী, গাও বনমালী
　আবার শুনিব সে মধুর তান।
হৃদি বৃন্দাবনে, ভক্তি রাধা সনে
　আবার খেলাও প্রেম অভিমান॥

হে রাখাল রাজ, পর বন সাজ
　আবার চরাও ধেনু মাঠে মাঠে,
গোচারণ ছলে, ডাক সখা বলে
　আবার আসিয়া যমুনার তটে।

শ্রীমধু সূদন, লইনু শরণ
আবার আসিয়া কংশ দর্প হর।
কুরুক্ষেত্ররণে পাণ্ডবের সনে
আবার আসিয়া ধর্ম্ম রক্ষা কর॥

কৃষ্ণ জনার্দ্দন, ভয়াম্বিত মন
আবার অর্জ্জুনে উপদেশ দাও
অমর আত্মার পার্থিব সত্ত্বায়
আবার ভারতে জাগাইয়া লও॥

মাধব মুরারি দীনবন্ধু হরি,
আবার বিদুর কুটীরেতে এস
এস শ্রীনিবাস, পূর মন আশ
আবার দরিদ্র এ ভারতে তোষ॥

স্থানীয় সংবাদ।

(প্রেরিত)

"মোহাম্মদী" তে আলবার্ট পোর্টারের যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার হইয়াছে উহাতে রাণীশঙ্কৈল থানার অধীন বহু গ্রামবাসীর প্রাণে আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে। তিনি প্রচার করিয়াছেন—"১৭ই ডিসেম্বর ১লা পৌষ বুধ শুক্র

শনি নেপচুন ইত্যাদি ছয়টী গ্রহের সমাবেশ হইবে ও সূর্য্যে একটী মহাগহ্বর সৃষ্ট হইবে। সূর্য্য হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইয়া ধরা স্পর্শ করিবে, মুহুর্মুহুঃ ভূমিকম্প হইবে, প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি হইবে, বজ্রপাত ও ঘন ঘন বিদ্যুতের সঞ্চার হইবে।

এই ঘটনাটী জনসঙ্ঘের এতদূর প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ না কি এখন হইতে প্রাতঃকালীন সূর্য্যে কলঙ্ক দেখিতে পাইতেছে, উহা দেখিতে সিংহল দ্বীপের ন্যায়।

ছয়টী গ্রহের একত্রে সমাবেশ অসম্ভব, বিশেষতঃ ১লা পৌষ তারিখে এরূপ কিছুতেই হইবে না, পণ্ডিতগণ বিশেষ ভাবে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু জনসঙ্ঘের একবার যে বিশ্বাস হইয়াছে, সেই বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা এখন বড়ই দুরূহ হইয়াছে।

রাণীশঙ্কৈল গ্রামে বসন্ত রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। এই রোগ মনুষ্য ও গো দুই জাতিকেই আক্রমণ করিয়াছে। এই রোগে বহু গরুর বিনাশ হইল, অনেকের গোয়ালঘর শূন্য হইয়াছে। রাণীশঙ্কৈল গ্রাম নিবাসী শ্রীমধুসূদন সাহার বাড়ীর গরুদের এই রোগ হইয়া একে একে প্রায় সমস্ত গরু মরিয়া গোয়ালঘর প্রায় শূন্য হইয়াছে। গরুর এই রোগ শুধু রাণীশঙ্কৈলে কেন আশেপাশের গ্রাম সমূহেও ছড়াইয়া গিয়াছে। যে সমুদয় লোকের গরুই একমাত্র সম্পত্তি ও তাহাদের উপর যাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে সেই কৃষককুলের আজকাল যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা না দেখিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব। এই মহাদুর্ভিক্ষের দিনে তাহাদের আবার এ কি বিপদ !

বসন্তের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় রাণীশকৈল গ্রামের সহৃদয় কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার সাহা বহুলোককে বিনামূল্যে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার সার্ব্বজনীন দয়ায় ও পরদুঃখ কাতরতায় আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। ঈশ্বর এই যুবকের মঙ্গল করুণ।

এই রোগের জন্য এইরূপ অসময়েও রায়গঞ্জ হাইস্কুল ৭ দিনের জন্য বন্ধ দেওয়া হইয়াছে।

রায়গঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে স্থানীয় লোকদের টীকা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ডাকাতি—

গত ১৫ই কার্ত্তিক শনিবার দিবস রাত্রিতে বলতৈড় নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাসের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছে। দুর্ব্বৃত্তগণ বহু টাকার গহনা পত্র লইয়া গিয়াছে। এবং তাঁহার জামাতার হাতে লাঠীর আঘাত করিয়াছে ও আগুন দ্বারা হাত পোড়াইয়া দিয়াছে।

লাট মহোদয়ের শুভাগমন—

বাঙ্গালার গবর্ণর শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর ৭ই অগ্রহায়ণ দুই প্রহরের পর মালদহ পরিত্যাগ করিয়া, পথিমধ্যে মোটর যোগে পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করেন। ঐ রোজ রাত্রি ২—৪ মিনিটের

সময় দিনাজপুর ষ্টেশনে পঁহুছিয়া রাত্রিতে রেল গাড়ীর মধ্যেই অবস্থান করেন। ৮ই অগ্রহায়ণ সকাল বেলা ৮ টার সময় তিনি রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করেন। সম্মানার্থে ১৭ টী বোম ধ্বনি হয়। ষ্টেশন হইতে লাট মহোদয় বরাবর সভামণ্ডপে আগমন করেন। কালেক্টরী কাছারীর পূর্ব্বদিকে অস্থায়ী সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মণ্ডপের অভ্যন্তর ভাগের স্তম্ভগুলির শীর্ষের নক্সায় যে ব্যয় করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। রেলষ্টেশনের ফটকের বাহিরে ১টী, জেলাস্কুলের নিকটস্থ গুমটীর দক্ষিণে ১টী এবং দেওয়ানী আদালতের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আর ১টী তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেগুলির সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য নাই। কিন্তু সবজজ আদালতের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে একটী অস্থায়ী তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার ব্যয়ও সমর্থন করা যায় না। ঐ তোরণের যে অংশ খিলানের অনুকরণে নির্ম্মিত, তাহার নিম্নভাগ সমস্তই পাকা ইটের, গাঁথনি কাদার, উপরে অবশ্য আস্তর করা ও চুন ফিরান। খিলানের অংশ বাঁশের বাতার বুনানির উপর কাদা লেপিয়া আস্তর করা ও চুন ফিরানও বটে। খিলানের উপরে ব্রিটীশ রাজচিহ্ন সিংহ ও ইউনিকর্ণ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহা মৃণ্ময়, নির্ম্মাণে কৌশল আছে। পূর্ব্ব লিখিত ৩টী তোরণের শেষোক্ত তোরণ হইতে এই সিংহ দ্বার পর্য্যন্ত রাস্তার উত্তর পার্শ্বে কলাগাছের সারি, ব্যবধান ভাগে অর্দ্ধ বৃত্তাকার বাঁশের বাতায় দেবদারু পাতা বান্ধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সভামণ্ডপে এবং এই সজ্জিত রাস্তাতে কাগজের সাজও যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। রাজবাড়ীর শালের সামিয়ানা ও রূপার কেদারা ইত্যাদিতে সভামণ্ডপের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতি সহরের অন্তর আর

কোন সাজ সজ্জা করেন নাই। এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছিলেন। মিউনিসিপাল আফিসের সজ্জা সুন্দর হইয়াছিল।

লাট মহোদয়ের অভ্যর্থনার জন্য বহু পূর্ব্বে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ কমিটির কার্য্য খাটিয়া খুটিয়া টাকা তোলা ব্যতিরিকে আর কিছু দৃষ্ট হয় না। কমিটির সভ্যগণকে লাট মহোদয়ের সমীপে উপস্থিতও করা হয় নাই। সরকারী কর্ম্মচারীগণ অভ্যর্থনা সভায় সমুদয় বন্দোবস্ত নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন, সে জন্য তাহার 'দরবার' নাম দিয়াছিলেন। দরবার নাম না দিয়া অভ্যর্থনা সভা নাম দিলে বোধ হয় অভ্যর্থনা সমিতির হস্তে সমুদয় বন্দোবস্ত ছাড়িয়া দিতে হইত। যে অর্থে 'দরবার' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং যে রাজকীয় উৎসব ব্যাপারকে ইংরাজী আমলেও দরবার বলিয়া অভিহিত করা হয়, এখানে সে সব ব্যাপার কিছু হয় নাই। সরকার হইতে কোনও উপাধি বা সম্মান প্রাপ্ত ব্যক্তিকে খেলাত বা সনদাদি প্রদত্ত হয় নাই, বা সম্মানিত ভূষণে ভূষিত করা হয় নাই, রাজনীতির কোন সূত্র দরবারী-গণের সমক্ষে ঘোষিত হয় নাই, এমন কি দরবারীগণের সকলের সম্বর্দ্ধনা লাট মহোদয়ের পক্ষে সম্ভবপর না হইলেও, অধীনস্থ রাজ কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তৃকও হয় নাই। খাঁটী 'দরবার' সংক্রান্ত কোন ব্যয় সরকার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়াও বোধ হয় না।

একদল গুর্খা পল্টন পুলিশকে সভামণ্ডপের বহির্ভাগে একপার্শ্বে লাট মহোদয়ের অভ্যর্থনা জন্য রাখা হইয়াছিল। অপর পার্শ্বে যে মহোদয়গণকে লাট

বাহাদুরের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার কথা ছিল, তাঁহারা অপেক্ষা করিতে ছিলেন। লাট মহোদয় সভাক্ষেত্রে আগমন করিয়া প্রথমে পল্টন পুলিশদল পরিদর্শন করেন, তৎপর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার বাহাদুর ও অপর ভদ্র মহোদয়গণের সহিত করমর্দ্দন করেন। মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান এবং সরকারী উকীল ইঁহাদিগকে সরকারী কর্ম্মচারী শ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছিল। বেসরকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার বাহাদুর ভিন্ন আর কেহ ছিলেন না।

প্রথমে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। তৎপর মুসলমান সভার পক্ষ হইতে সভাপতি শ্রীযুক্ত মৌলবী একিমুদ্দিন, জমিদার সভার পক্ষ হইতে সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত টঙ্কনাথ চৌধুরী এবং মহাজন সভার পক্ষ হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। প্রত্যেক অভিনন্দন পত্র পাঠের পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর তৎসম্বন্ধে লাট মহোদয়ের অনুমতি গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেক অভিনন্দন পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে রৌপ্যাধারে বা রৌপ্যখচিত বংশাধারে তাহা স্থাপন পূর্ব্বক লাট মহোদয়কে অর্পণ করা হয় এবং তিনি মঞ্চ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অভিনন্দন প্রদাতাগণের পক্ষে মঞ্চের সম্মুখ সমাগত ১২ জনের সহিত করমর্দ্দন করেন। তৎপরে একসঙ্গে সমুদয় অভিনন্দন পত্রের উত্তর দেন। এইরূপে 'দরবারের' কার্য্য শেষ হয়।

জমিদার সভার অভিনন্দন পাঠ কর'র পূর্ব্বে সভাপতি শ্রীল শ্রীযু মহারাজা বাহাদুরের অসুস্থতা হেতু অনুপস্থিতি নিবন্ধন তিনি পাঠ করিতেছে এরূপ শ্রীযুক্ত টঙ্কনাথ চৌধুরী বলিলে ভাল দেখাইত এবং লাট মহোদয়ে অভিনন্দনের উত্তর প্রদান কালে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের অসুস্থ জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে ভাল দেখাইত। তবে অভিনন্দন পত্রও ছাপা উত্তরও ছাপা—ছাপার বাহিরে কিছু বলা হয়তো 'দরবারের' নিয়মের বিরু হইতে পারে।

সভামণ্ডপ হইতে লাট মহোদয় সারকিট হাউসে গমন করেন। তথায় বেলা ১১টার পর নির্দ্দিষ্ট কতিপয় মহোদয়কে দর্শন দেন। বৈকালে সাহেবদে ক্লাবে টেনিস খেলেন।

পরদিন মঙ্গলবার বেলা ১০—৩০ মিনিটের সময় বাহির হইয়া মিউনিসিপা আফিস, জেলা স্কুল, মুসলমান বোর্ডিং, টেকনিকাল স্কুল, হাসপাতাল, জেল ধর্ম্মশালা, ও বালিকাস্কুল পরিদর্শন করেন। বালিকাস্কুল হইতে মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া সহর পরিদর্শন করেন। রাস্তার মোড়ে অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহার দর্শনার্থ সমবেত হইয়াছিল এবং জয়ধ্বনি করিয়াছিল। বৈকালে ৪টার সময় লাট মহোদয় রাজবাড়ীতে চা পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন। রাস্তায় ঋষিপ্রবর শ্রীযুক্ত ভুবন মোহনের দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় পরিদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত ছটুলাল আগরওয়ালার ধর্ম্মশালা ও ঋষিপ্রবরের দাতব্য ঔষধালয়ে পদার্পণ করায় শ্রীল শ্রীযুক্ত মোগ্রনস বাহাদুরের

অতি সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে এবং তিনি সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে দশটায় লাট মহোদয় দিনাজপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। দুইদিন দিনাজপুরে অবস্থান করিয়া লাট মহোদয় এতদঞ্চলের অবস্থা অতিরিক্ত কি জানিলেন তাহা বলা যায় না। সারকিট হাউসে কতিপয় রাজকর্ম্মচারী ও জমিদার এবং মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যান, ভাইস্‌ চেয়ারম্যান ও সরকারী উকীল এবং শ্রীযুক্ত মৌলবী একিমুদ্দিন ভিন্ন আর কাহারও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। শুনা যায় 'খাসমুলাকাতি' বলিয়া একটী তালিকা আছে। ঐ তালিকায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহারাই লাট মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করণের অধিকারী। সরকারী কর্ম্মচারী এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর কথা তাঁহাদের রিপোর্টে অভিনন্দন ইত্যাদিতে লাট মহোদয় জানিতে পারেন। জমিদার শ্রেণী যে তাঁহাদের খাজানা আদায় হইতেছে না ইহা ভিন্ন অধিক আর কিছু বলিতে পারিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। সুতরাং বেসরকারী মুলাকাতি মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত মৌলবী একিমুদ্দিন ছিলেন। প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার সহিত বেসরকারী অধিক সংখ্যক ব্যক্তির সাক্ষাতের সুবিধা থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অভিনন্দন পত্র সমূহের উত্তরে লাট মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে যে সহরের পয়ঃপ্রণালীর উন্নতির জন্য সরকার হইতে কতক পরিমাণ সাহায্য ও ঋণদান করিতে পারেন। সহরে চৌকীদারী

টেক্স আয়ের উপর ধার্য্য আছে, তাহা না হইয়া জোতের উপর হইলে মিউনিসিপালিটীর আয় বৃদ্ধি হইতে পারে এরূপ বলিয়াছেন। জেলার উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত একটী (সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদ দার্জ্জিলিং) রাস্তার ভার সরকারকে গ্রহণ করিবার যে অনুরোধ করা হইয়াছিল, তাহা রক্ষিত হয় নাই। তবে হিলী হইতে বালুরঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার যে অংশ পাকা করিতে বাকী আছে, তাহা সরকার হইতে করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়াছেন। সহরে একটী লোকাল বোর্ড স্থাপিত হইবে এবং ঠাকুরগাঁয়ের লোকাল বোর্ডে আগামী জুনে এবং বালুরঘাটের লোকাল বোর্ডে আগামী সেপ্টেম্বরে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে, লাট মহোদয় এরূপ বলিয়াছেন। মুসলমান বোর্ডিং এর উপরে আর একতালা গাঁথিয়া একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের হাত দিয়া প্রেরণ জন্য বলিয়াছেন। সান্তাহার হইতে বরাবর দিনাজপুর পর্য্যন্ত আর একটী রেললাইন এবং নিমাসরাইর উত্তরে একলাক্ষি ষ্টেশন হইতে রায়গঞ্জ পর্য্যন্ত একটী রেললাইন নির্ম্মাণ রেলওয়ে বোর্ড মঞ্জুর করা আনাইয়াছেন। হাসপাতালের পরিদর্শন বহিতে সাজ সরঞ্জাম বাবদ ১৪০০৲ হাসপাতালে দেওয়াইবেন লাট মহোদয় ইহা লিখিয়া গিয়াছেন।

টাউন হাই স্কুল—৩

দুই বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েসন লাভ করাতে আমরা অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। নিউ হাইস্কুলের ন্যায় বৃহৎ ইমারতের

উদ্যোগ না করিয়া অল্প ব্যয়ে যাহাতে স্বাস্থ্যকর স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে, স্কুল কমিটীকে তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে আমরা অনুরোধ করি।

স্বাস্থ্য—

এবারে সহরে এবং মফস্বলে জ্বরের অসম্ভব রকম প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দিনাজপুরের সাবেক অখ্যাতির দিন যেন ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মিউনিসিপালিটী এক স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এক্ষণে কলিকাতায় স্বাস্থ্যতত্ব শিক্ষা করিতেছেন। প্রাইমারী স্কুলে যে স্বাস্থ্যতত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতেই এই মিউনিসিপালিটীর প্রায় সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। ঐ শিক্ষা অনুসারেই কার্য্য হয় না, উন্নত বৈজ্ঞানিক শিক্ষানুসারে কার্য্য হইবার আশাতো সুদূরে।

দিনাজপুর সভা—

এক্ষণে জীবিত কি না জানি না। লাট মহোদয়কে অভিনন্দন পত্র দিবার অবসরে দেশের অবস্থা জানাইতে পারিতেন, সে সুযোগ সভা কেন লইলেন না বুঝি না। জাতীয় মহাসমিতির প্রতিনিধি নির্ব্বাচন যদি সভা হইতে না হয়, তবে সভার অস্তিত্ব কিসে বুঝিব?

দিনাজপুর পত্রিকা।

(মাসিক)

সপ্তবিংশতি ভাগ { পৌষ। ১৩২৬, } ৪র্থ সংখ্যা

ক্ষুধার্ত্তের-আর্ত্তনাদ।

(১)

সেই ত ভারত আছে লোক জনে ভরা

সেই ত শ্যামল শস্যে শোভে আগাগোড়া

সেই ত বাতাসে দোলে ফসলের কোলে কোলে

সেই ত সুন্দর খেলা মাঠে মাঠে হেলাদোলা।

সেই ত বৃষ্টির জলে প্লাবিত ভূতল

তবে কেন অন্নাভাবে হতেছি বিকল ?

(২)

সেই ধান, গম, পাট সরিষা কলাই
মটর, মশুরি বুট সীমা সংখ্যা নাই
অড়হর মুগ যব জন্মিতেছে এই সব
আর কত মানবের ফলমূল আহারের
সোণার ভারতে ফলে নশ্বর ফসল
তবে কেন খাদ্যাভাবে অস্থির সকল ?

(৩)

সেই ত হিমাদ্রি শোভে উত্তর জুড়িয়া
সেই ত সাগর জল দক্ষিণ পূরিয়া
সেই ত আকাশে উড়ে পাখী সব থরে থরে
কাতারে কাতার ধরি আকাশের অঙ্গ জুড়ি
আসে যায় নিত্য নিত্য আমোদে গাতিয়া
অথবা কি আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া ?

(৪)

সেই ত সুন্দর দেশ পৃথিবী মাঝারে
সকলেই চায় যাঁর কোলে আশ্রিবারে
যে দেশে ঋতুরা ছয় আসে যায় ক্রমান্বয়
প্রকৃতির প্রিয় কন্যা বিশ্বমাঝে এই ধন্যা
সেই দেশবাসী মোরা নাহি জোটে ভাত
অন্ন বস্ত্রে মহাকষ্টে করি দিন পাত।

(৫)

অনেক মানুষ শুধু অন্ন বস্ত্র বিনে
শরীর কঙ্কাল সার বিনা আবরণে
হায়রে সোণার দেশে, ঘেরিয়াছে মহাক্লেশে
ভদ্রতা শীলতা হায় খুঁজে নাহি পাওয়া যায়
ধেয়েতে ভরিল দেশ অভাব পীড়নে
অন্নদা ভাণ্ডারে থাকি মরে অনশনে ?

(৬)

অন্নদার মহাভাণ্ডে অন্ন নাই যার
অবশ্য বুঝিবে আছে রহস্য তাহার
চাষার আশার ধন কোথা করে পলায়ন
কেমন কৌশলে হায় দেশ দেশান্তরে যায়
অজ্ঞ কি বুঝিতে পারে আপন মরণ
আগুনে পতঙ্গ যথা করে আলিঙ্গন ।

(৭)

সব গেছে সব গেছে কিছু নাই আর
দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত হল ছার খার
হাজারে কটা বা ধনী কজনে বা নহে ঋণী
মুখস পরিয়া হায় অনেকে ঠেকেছে দায়
অন্তরে অন্তর সারা মান রাখা ভার
পড়ে গেছে চতুর্দ্দিকে যেরূপ বাজার ।

(৮)

লক্ষ্মীকৃত কুবের কল্পী যাঁরা ভাগ্যবান
অকাতরে অনায়াসে সংসার চালান
কমলার কৃপা বলে 'বেশী কমে সম চলে
তাঁদের ছাড়িয়া দিয়া কর ধরি গণ গিয়া
অনুপাতে অধিকাংশ কিঞ্চিত উপরে
আর সব একি দরে বিকাবে বাজারে।

(৯)

দিনান্তেও একাহার জুটে নাক আর
কত যে কাতর কণ্ঠে ফিরে দ্বারে দ্বার
ইহা নাকি দেখা যায় ইহা নাকি সহা যায়
মানুষ মরিয়া যায় না খাইয়া হায়হায়
(হে মাতঃ) এ হেন দুর্দ্দিন কেন আনিলে এথায়
অশান্তি উড়ায়ে নেও শান্তির হাওয়ায়।

(১০)

বিশ্বমাঝে এ ভারত সুবিখ্যাত নাম
ধর্ম্ম বলে বলীয়ান পুণ্যময় ধাম
যাগ যজ্ঞ তপস্যায় শান্তি নিকেতন প্রায়
সাগ্রাও হইতে আসে মবিবার অভিলাসে
সেই শান্তিধামে দিলে অশান্তি ঢালিয়া
কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্মফল বুঝাতে দেখিয়া?

(১১)

না দেবি, মরিয়া গেলে কি ফল দীক্ষায়
না খেয়ে মরিয়া যাওয়া ভাবাও না যায়
হা হুতাসে দগ্ধ প্রাণ   ক্ষুধার সাঁড়াশী টান
পাঁজর ভাঙ্গিয়া ফেলে   ক্ষুধিতে না ভাত পেলে
জীবনেই জীবনান্ত হয় ক্ষুধাতুর
পলকে পলকে মৃত্যু যন্ত্রণা প্রচুর।

(১২)

সন্তানের পিতা মাতা কাতর ক্ষুধায়
ততোধিক ক্লিষ্ট দোঁহে না দেখি উপায়
দে ভাত দে ভাত বলে   সন্তান জননী কোলে
কান্দিয়া আকুল আহা   সহা নাকি যায় তাহা
পিতা মাতা বুক চাপড়ি পাগলের প্রায়
উভয়েই গলে রশি দিতে ধেয়ে যায়।

(১৩)

(এখন) অবোধ শিশুর গতি ভাব দেখি মনে
কি সুখে ভারতে থাকে নিঃস্বজনগণে
ইহা নাকি শুনা যায়   ইহা নাকি ভাবা যায়
বিষম যাতনা বিষে   দেহ দহে বাঁচে কিসে
কঠোর কঠোর অতি বলা নাহি যায়
ভাষায় অবাক হয় বচন জিহ্বায়।

(১৪)

রঙ্গরসে কত অর্থ যায় অকারণ
এ দিকে দরিদ্র মরে ভাতের কারণ
তাহা যদি থেকে যায় কত নিঃস্ব ভাত পায়
পেট ভরি খেয়ে করে আশীর্ব্বাদ উর্দ্ধে করে
এ হেন ব্যবস্থা নাহি করে বিজ্ঞগণ
দুর্ব্বল দরিদ্র মরে ভাতের কারণ।

(১৫)

এ দশা কি ঘুচিবে না কখন দীনের
মরম যাতনা নিয়ে জনম হীনের
দীনে কি সুদিন পায় শীলা জলে ভেসে যায়
সত্য বটে এ কাহিনী জন্মাবধি দেখি শুনি
তথাপিও দুরাশায় না হয় প্রত্যয়
ভ্রান্ত আমি তাই ভাবি মুর্খ অতিশয়।

(১৬)

মুর্খ আমি তাই করি প্রবীণে দর্শন
খোঁড় মাটী কেল ঘাস লাঙ্গল কর্ষণ
উঠি পড়ি লাগ সবে অবশ্য সুদিন পাবে
মাটী আছে খাটী খাও কার দিকে নাহি চাও
অবশ্য জুটিবে ভাত বাঁচিবে পরাণ
অন্ন বস্ত্রে নাহি কষ্ট পাইবে সন্তান।

(১৭)

বি এ, এম এ, ভদ্রতায় কটা লোক বড়
দরিদ্র গণিয়া পরে এই সব ধর
সাগরে বুদ্বুদপ্রায় নগণ্যও বলা যায়
বাকী সব আমাদের আগে আর পাছে
না ধরিলে হাল ভাই আর বাকী আছে।

(১৮)

খাই দাই মজা লুটি গেছে সেই দিন
নিশ্চয় অবোধ আরও সম্মুখে দুর্দ্দিন
ভাল যদি চাও সবে এখনই সতর্ক হবে
মনে মুখে একি কর বক্তৃতার বোল ছাড়
আসল বুঝিয়া লও থাকিতে সময়
নতুবা ঘটিবে পরে বড় বিপর্যয়।

(১৯)

আট মণ চাউল যথা বিকাত টাকায়
সেই দেশে চারি সের পাওয়া হল দায়
(কাজেই) আশী হাত নীচে এসে পড়িয়াছ এই দেশে
এইরূপে গেছে সব দেখে কর অনুভব
বেড়েছে চটক শুধু গিণ্টীর বাজার
চতুর্দ্দিকে বসিয়াছে হাজার হাজার।

(২০)

জাতীয়তা রক্ষা কর পৈত্রিক আচার
আপনার দর বুঝি কর ব্যবহার
পিতা মাতা গুরু জনে সেবা কর কায়মনে
পাইবে হৃদয়ে বল কর্ত্তব্যে হবে অচল
মাটীর সঙ্গে খাঁটী ভাব কর আচরণ
আপনি জুটিবে ভাই ভরণ পোষণ।

—**—

প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট নিবেদন।

যাঁহারা কখনও দিনাজপুরে পদার্পণ করেন নাই, যাঁহারা কেবল মানচিত্রেই দিনাজপুর চিনিয়াছেন, তাঁহারা ইহাকে একটী নগণ্য স্থান বলিয়াই মনে করিতে পারেন। ইহার অঙ্কে যে অসংখ্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে বিলীন হইতে চলিয়াছে তাহার অনুসন্ধান কেহ করেন কি? ইতিহাসে মোটামুটি দুই একটী কথা যাহা পাওয়া যায়, প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের সংখ্যার তুলনায় তাহা অতি সামান্ত।

দিনাজপুর হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম, এবং প্রাচীন গৌড়

নগরের প্রায় ৩৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বে, মালদহ যাইবার পথে, তিন মাইল ব্যাপী একটা স্থান "কশ্‌বা" নামে অভিহিত হয়। এহ কশ্‌বা, ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া, হুজুরী কশ্‌বা, বড় কশ্‌বা, কিসমত কশ্‌বা, আরাজী হুজুরী কশ্‌বা, মিলিক কশ্‌বা ও মিলিক আরাজী কশ্‌বা নাম ধারণ করিয়াছে। স্থানটীর নামেই উহার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। উহা যে মুসলমান শাসন সময়ে একটী সুবৃহৎ নগর ছিল, এবং তাহাতে তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর আসিয়া সময় সময় বাস করিতেন তাহা "হুজুরী কশ্‌বা" শব্দেই প্রতীয়মান হয়। এহ স্থানে এক্ষণে অনেক প্রাচীন অট্টালিকার ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন আর সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই; আছে কেবল জঙ্গল, আর জঙ্গলবাসী কতিপয় সেই সাঁওতালের পর্ণ কুটীর; আর সেই সাঁওতালগণের কঠোর আয়াস কর্ষিত শস্যক্ষেত্র। এই স্থানে প্রাচীন দীঘি পুষ্করিণী বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই স্থানে শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে বাস্তবিকই সাঁওতালগণকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; অনেক প্রাচীন অট্টালিকার ভিত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে হইয়াছে। সাঁওতালগণ এক স্থানে অধিক দিবস একত্রে বাস করে না। একদল যায় আর একদল আইসে। যাহারা যায়, তাহাদের জমি স্থানীয় কৃষকগণ হস্তগত করিয়া লয়, আবার নূতন দল আসিয়া নূতন শস্যক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। এইরূপে এই প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ গুলিও যে, অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইস্থান হইতে দুইটা সুপ্রশস্ত রাজপথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান

রহিয়াছে। ইহার একটী উত্তর মুখে অপরটী পূর্ব্বস্তোর মুখে গিয়াছে। শেষোক্ত পথটি দিনাজপুরের জেলাবোর্ড অধিকার করিয়া লইয়াছেন। পূর্ব্বোক্তটি জীর্ণ শীর্ণ দেহে ধরাগর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছে। প্রথোমক্ত পথে ৮ মাইল পরিমাণ গেলেই পাঠান বীর সেরসাহের গড় পাওয়া যায় আমার "গৌড়দিব্বী" নামক প্রবন্ধে সেই গড়ের উল্লেখ করিয়াছি। সেখানে এখন কতিপয় ধ্বংসাবশেষ ও কশ্‌বা নামক একটী গ্রাম অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতঃপর এই রাস্তাটি কুশুমণ্ডী থানার নিকটবর্ত্তী থামার, কশ্‌বা অভিমুখে গিয়াছে।

শেষোক্ত পথে এক মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলেই, দৌলৎপুর নামক একটী গ্রাম পাওয়া যায়। এখানেও অনেক প্রাচীন অট্টালিকার ভিত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটী প্রাচীন দীর্ঘি পুষ্করিণীও আছে। উহাতে বোধ হয় যখন কশ্‌বার সুদিন ছিল. যখন ইহার অঙ্কে বঙ্গেশ্বর-বিলাস ভবন শোভা পাইত, যখন ইহার সৌন্দর্য্যে সকলে মুগ্ধ হইত, তখন ধনাঢ্য নাগরিকগণ এই স্থানে বাস করিতেন, তাই ইহার নাম দৌলৎপুর হইয়াছে। কিন্তু দৌলৎপরে আর সে দৌলৎ নাই, কতিপয় মুসলমান গৃহস্থ মাত্র এখানে বাস করিতেছে। আর কয়েকজন পশ্চিমা দোকানদার আসিয়া সামান্য রূপ দোকান খুলিয়াছে।

এই পথে উত্তর পূর্ব্বদিক আর তিন মাইল গেলে আর একটী স্থান পাওয়া যায়। সে মৌজাটির নামও "কশ্‌বা"। কশ্‌বা অর্থে সহর, সুতরাং এস্থানে মুসলমান শাসনকালে একটী নগর ছিল তাহা ইহার নামেই

অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত ইহার অন্তর্গত প্রাচীন দীঘি পুষ্করিণী ও অসংখ্য অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া কে এ কথা অস্বীকার করিবে? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বোধ হয় একদিন এই নগরী সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। একটী ক্ষুদ্র প্রবাহিনী ইহার মধ্য দিয়া বঙ্কিম গতিতে চলিয়া গিয়াছে। আজও সেই প্রবাহিনীর তীরে দাঁড়াইলে প্রকৃতির শোভায় মন প্রফুল্ল হয়। এই প্রবাহিনী এক্ষণে খাঁড়ী বলিয়া পরিচিত।

কশ্‌বার সৌভাগ্যের দিনে ইহাতে বোধ হয় বারমাস জল থাকিত; তাই ইহার উপর তখন একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু ছিল, কালের কঠোর আঘাতে কশ্‌বার গৌরবের সঙ্গে সেতুটীরও ধ্বংস হইয়াছে; রহিয়াছে কেবল সেই সেতুর প্রস্তরময় ভিত্তি, আর স্থানটীর নাম, "পাথরঘাটা"। মুসলমান গৌরব রবি অস্তমিত হইয়াছে কশ্‌বা ধ্বংস হইয়াছে, প্রবাহিনী আর কুল কুল নাদে কাহার গুণ গাহিবে? কোন উল্লাসে আর নাচিয়া নাচিয়া চলিবে? তাই বুঝি সে মনের খেদে শুকাইয়া গিয়াছে; তবে বর্ষার কয়েকদিন যেন শোকে উদ্বেলিত হইয়া অতীত গৌরবের শোক গীতি বৎসরান্তর একবার গাহিয়া যায়। এই কশ্‌বার পার্শ্বেই "হাবেলী" নামক একটী পল্লী। এখানেও বিস্তর অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্থানটীর নাম ও অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় কশ্‌বার গৌরবের মধ্যাহ্ন সময়ে বঙ্গের নবাবগণ সস্ত্রীক এই রমণীয় নগরের শোভা সন্দর্শনে আগমন করিতেন, এবং এই হাবেলীতেই বেগমগণের আবাস ভবন ছিল। বিলাসিতার লীলাভূমি, ঐশ্বর্য্যের নিকেতন, সেই বেগম হাবেলী আজ কতিপয় দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীর

পুরে পর্ণ কুটীর সমন্বিত সামান্য গণ্ড গ্রাম। জানি না এই সকল নগর কোন সময়ে কাহার কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে উহার কতদূর সম্পর্ক ছিল তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ চেষ্টা করিলে নির্ণীত হইতে পারে, তাই তাঁহাদের নিকট সানুনয়ে নিবেদন তাঁহারা ইহার বিস্তারিত বিবরণ উদ্ভাবন করিয়া বঙ্গের ইতিহাসের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

**

ঝরা ফুল।

ও যে তট-তরু-শাখে বিকাশিত ফুল
ভেসে গিয়েছিল নীরে ;
ও সে জোয়ার প্লাবনে আবার কেমনে
কূলে এল আজি ফিরে।
নদী, তরু-মূল-ভূমি চুমি যায়
নদী, কল্‌, কল্‌, কল্‌, গান গায়
নদী, ঝরে-পড়া-ফুল অকূলে না লয়ে
ফিরে দিতে চায় তীরে
ফুল, জোয়ার প্লাবনে আবার কেমনে
কূলে এল আজি ফিরে ?

আজ ভেসে-যাওয়া-ফুল এল বলে কূলে,
তরু কি তুলিয়া লবে ?
তার, সুরভি-সুষমা ধুয়ে গেছে জলে
তায় আর কিবা হবে ?
ওগো নয়, নয়, নয়—তাহা নয়
তবু যে দুলায় কিসলয়,
তরু, তথাপি ডাকিছে তাহারে মাগিছে
প্রীতি ইঙ্গিতে ধীরে ;
ফুল, জোয়ার প্লাবনে আবার কেমনে
কূলে এল আজি ফিরে ?

নদী, দুলিয়া ফুলিয়া লহরী তুলিয়া
ত্বরিতে চলিতে চায়,
ফুল, প্রতিকূল স্রোতে পুরাতন পথে
থামিতে নাহিক পায়;
তরু, পবন স্বননে ফেলে শ্বাস,
ছিঁড়িতে পারে না মায়াপাশ,
তরু, অগণিত-বাহু পল্লব মেলি,
চায় যে কুসুমটিরে
ফুল, জোয়ার প্লাবনে আবার কেমনে
কূলে এল আজি ফিরে ?

স্থানীয় সংবাদ।

—**—

শান্তি উৎসব—

দিনাজপুর সদরে শান্তি উৎসব উপলক্ষে সংগৃহীত চাঁদার শতকরা ৫৫৲ টাকা উৎসব দিনে সমাগত কাঙ্গালী ভোজনের জন্য এবং উৎসবের দিবস হইতে সাহায্য পাইবার উপযুক্ত অন্নক্লিষ্ট দরিদ্রদের সম্ভব হইলে ১ মাস পর্য্যন্ত কিম্বা নূতন ফসল উঠা পর্য্যন্ত ভোজনের জন্য ব্যয়িত হইবে, শতকরা ১৫৲ টাকা উৎসব দিবসে সমাগত কাঙ্গালী মধ্যে সাহায্য পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে কম্বল বিতরণ জন্য, শতকরা ২২৷৷০ টাকা ক্রীড়া প্রদর্শনে ও বালকগণের জলযোগে এবং অবশিষ্ট শতকরা ৭৷৷০ অভিনয়াদিতে ব্যয়িত হইবে এরূপ সাধারণ সভায় নির্দ্ধারিত হয়। ২৮ শে অগ্রহায়ণ দেবালয়াদিতে পূজা দেওয়া ও বৈকালে রাজবাড়ী হইতে সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। ২৯শে অগ্রহায়ণ ময়দানে সকালবেলা পুলিশের কাওয়াত এবং বৈকালে বালক ও যুবকদের ক্রীড়া প্রদর্শন হয়। ৩০শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্নে জেলা স্কুলের হাতায় কাঙ্গালী ভোজন ও বস্ত্র বিতরণ হয়। প্রায় ২৫০০ কাঙ্গালী সমবেত হইয়াছিল। ৯০০ কাঙ্গালীকে থান কাড়া ৬ হাত করিয়া কাপড় দেওয়া হইয়াছিল।

উকীল শ্রীযুক্ত মহাম্মদ কাদের বকস শান্তি উৎসব সমিতির সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। খেলাফতি সম্বন্ধীয় আন্দোলনের ফলে তিনি ঐ পদ ইস্তাফা করিয়াছিলেন। এখানে যে মুসলমান সভা আছে, তাহার এক অধিবেশনে

কয়েকজন সভ্য সমবেত হয়েন। এরূপ নির্দ্ধারণ হয় যে শান্তি উৎসবে যোগ দিতে এখানে কাহাকে নিষেধও করা হইবে না, কাহাকে প্রবৃত্তিও দেওয়া হইবে না। কাঙ্গালী ভোজনে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমান কাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী হইয়াছিল, এবং অনেক মুসলমান ভদ্রলোককে ঐ ভোজনের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। খেলাফতির সম্বন্ধে যাহাতে সুমীমাংসা হয় তদ্বিষয়ে আমাদের গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু ঐ মীমাংসা কেবল তাঁহাদের আয়ত্তাধীনে নহে। এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণের ধর্ম্ম কর্ম্ম বা তীর্থস্থানাদির কোনরূপ অনিষ্টেরও আশঙ্কা নাই। সেস্থলে রাজার সুখ দুঃখে প্রজা সাধারণের সহানুভূতি না হওয়া ভারতীয় স্বভাবের বিপরীত বলিয়া মনে হয়।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড

ইতিমধ্যে কলিকাতার লাট প্রাসাদে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের প্রতিনিধিগণের একটী সভা হইয়াছিল। সেই সভাতে শ্রীল শ্রীযুক্ত লাট মহোদয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে কয়েকটী জেলাবোর্ডে বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন, তদতিরিক্ত আরও অনেকগুলি জেলাবোর্ড আগামী বৎসর হইতে বেসরকারী চেয়ারম্যান পাইবার অধিকারী হইবেন। তদনুসারে আগামী বৎসর হইতে দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া এবং চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি ভিন্ন বাঙ্গালার আর সমুদয় জেলা ঐ অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। ইতঃপূর্ব্বে অত্রত্য শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরকে জেলা বোর্ডের সভাপতিত্ব

গ্রহণ জন্য গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাদি নিবন্ধন তিনি সম্মত হয়েন নাই। শুনা যায় সম্প্রতি দিনাজপুর ঐ অধিকার প্রাপ্ত না হইলেও সত্বরেই প্রাপ্ত হইবে। যে বোর্ডের সভ্যগণের নির্দ্দিষ্ট নিম্ন সংখ্যা উপস্থিত না হওয়ার জন্য মধ্যে মধ্যে অধিবেশন হইতে পারে না, সে বোর্ডের সমুদয় অধিকার একেবারে পাইবার আশা দুরাশা।

রাজধানী

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর ইহার মধ্যে কলিকাতায় বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কিছু ভাল আছেন। সম্প্রতি ৫২নং দক্ষিণ রসা রোড টালীগঞ্জে তিনি অবস্থান করিতেছেন। ৪ঠা পৌষ বৈকালের গাড়ীতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী মহোদয়া তথাতে গিয়াছেন। নিখিল বিশ্বনিয়ন্তার চরণে তাঁহাদের অগণিত প্রজাপুঞ্জের অন্তরের প্রার্থনা যে শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়া রাজধানীতে প্রতিগমন করেন।

বিয়োগ

মুন্সেফী আদালতের প্রাচীন উকিল ৺কৈলাশ চন্দ্র সেন মহাশয় শিলিগুড়িতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য আমরা প্রার্থনা করি।

নূতন রেলওয়ে—

দিনাজপুর হইতে ঠাকুরগাঁ পর্য্যন্ত বোচাগঞ্জের দিক দিয়া সম্প্রতি নূতন রেল লাইনের সর্ভে হইতেছে।

মুন্সেফীতে নিয়োগ করণ জন্য মহামান্য হাইকোর্টে লিখিয়াছেন। রাজসাহীর জজ শ্রীযুক্ত বসু সাহেব বাহাদুর এখানে ৩।৪ মাসের জন্য জজ হইলেন। এপ্রিল মাসে পাকা জজ শ্রীযুক্ত ডসন সাহেব বাহাদুর আগমন করিবেন।

শান্তি-উৎসব (প্রেরিত)

শান্তি উৎসব উপলক্ষে বালুরঘাটের সহৃদয় সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সি, আর, মুখার্জ্জী মহোদয়ের অদম্য চেষ্টা ও যত্নে, ১৩ই ডিসেম্বর শনিবার প্রফেসার সেন গুপ্তের ম্যাজিক ও ১৪ই ডিসেম্বর রবিবার প্রাতে হরি সংকীর্ত্তন, মসজিদে নমাজ ও দান গ্রহণ ও অপরাহ্ন বেলা ১টা হইতে গরীবদিগকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ, ১৫ই ডিসেম্বর সোমবার অপরাহ্নে স্কুলের মাঠে নানারকম খেলা প্রদর্শন ও উপযুক্ততা অনুসারে পারিতোষিক বিতরণ ও রাত্রিতে ঝুমুরগান ও থিয়েটার, এবং ১৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্নে ঝুমুরগান ও স্কুলের মাঠে মেলা ও আতস বাজী পোড়ান ও বনফায়ার ইত্যাদি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বালুরঘাট চেরিটেবল হসপিটালের ডাক্তার বাবু হরিচরণ শীল মহাশয়ের বাসায় একটী ছাগলের ৩ তিন চক্ষু বিশিষ্ট একটী বাচ্চা হইয়া ৩ ঘণ্টা জীবিত থাকিয়া পরে মারা গিয়াছে।

——:0:——

শোক-সংবাদ—

এই পত্রিকা মুদ্রিত হইয়াছে, এমন সময়ে ৬ই পৌষ বেলা ৩॥টার সময় অশনি সম্পাতের ন্যায় কলিকাতা হইতে তারযোগে সংবাদ আইসে যে দীনপালক ধর্ম্মপরায়ণ প্রজাবৎসল আমাদের মহারাজা বাহাদুর ঐ দিনে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৩২৫ সালের মহাষ্টমী পূজার দিন হইতে পীড়িত ছিলেন ; কিন্তু এত শীঘ্র যে ধরাধাম পরিত্যাগ করিবেন, ইহা সাধারণে মনে করিতে পারে নাই। এক্ষণে দেখা যায় সঠিক সংবাদ সাধারণকে জানিতে দেওয়া হইত না। ইহার কি উদ্দেশ্য তাহা দুরধিগম্য। আজ মাতা ভাগীরথীর শীতল ক্রোড়ে মহারাজা বাহাদুরের সকল রোগ জ্বালা চিরদিনের তরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তারযোগে এই দুর্ব্বিসহ সংবাদ আগত হওয়া মাত্র তাহা উদ্দাম অগ্নিশিখার ন্যায় সহরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সকলেরই মুখ গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়। সেই সবই আছে কিন্তু এক মহারাজা বাহাদুর না থাকায় আজ সবই ম্লান পরিদৃশ্যমান হইতেছে। আজ অচল শিখরের পতন হইয়াছে, প্রভাদীপ্ত জ্যোতিষ্ক কেন্দ্রচ্যুত হইয়া মহাশূন্যে বিলীন হইয়াছে, অমূল্য নিধি ভাগীরথী প্রবাহে অনন্ত সমুদ্রে ভাসিয়া গিয়াছে। আজ দিনাজপুর যে রত্ন হারাইল তাহার আর পূরণ হইবে না।

মহারাণী মাতা এবং মহারাজকুমার জগদীশনাথকে আমরা কি বলিয়া বুঝাইব ? যদি অগণিত প্রজাপুঞ্জ, সমুদয় দেশবাসীর সম্মিলিত সমবেদনাতে তাঁহাদের শোকের কিঞ্চিৎমাত্রও প্রশমন হইতে পারে, তবে অযাচিতভাবে ঐ সহানুভূতি তাঁহাদের দিকে প্রসারিত হইয়াছে ইহা তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন। কালপূর্ণ হইলে কেহই থাকিতে পারেন না। মহারাজা বাহাদুরের অমর-আত্মা যখন শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন শারীরিক ধর্ম্মের অধীন হইতেই হইয়াছে। কিন্তু কীর্ত্তিমান ব্যক্তির দেহান্তরেও তিনি চিরজীবী থাকেন।

তাই মহারাজা স্যর গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর চিরজীবী হইয়া থাকিবেন। আজ আমরা অশ্রুজলের সহিত তাঁহার অনন্যসাধারণ সদ্‌গুণ রাশি স্মরণ করিতেছি। আমরা আগামী সংখ্যায় তাঁহার প্রতিকৃতি এবং জীবনী প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিব। বিশ্বনিয়ন্তার চরণে প্রার্থনা যে স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের পরলোকগত আত্মার শান্তি এবং শোক-সন্তপ্ত রাজ পরিবারকে এই দুর্বিসহ শোক সংবরণের শক্তি প্রদান করুন। তাঁহাতে একান্ত নির্ভরতা ভিন্ন দুর্ব্বল মনুষ্যের আর কি উপায় আছে ?

মহারাজ বাহাদুরের পরলোকগমন সংবাদে দিনাজপুর হইতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৫০ খানার অধিক সহানুভূতি ও সান্ত্বনা সূচক টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে। মহারাজ কুমার বাহাদুর সেগুলির যথাযথ উত্তর দিয়াছেন। ৭ই পৌষ ড্রামেটীক ক্লাব গৃহে সহরস্থ সাধারণের একটী শোক সভা হয়। তাহাতে ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্লুমফিল্ড বাহাদুর, ডিঃ জজ শ্রীযুক্ত গারলিক বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কর্ণেল পিটার্স সাহেব এবং সহরস্থ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ অনেক রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সভার কথা ভাল-রূপে প্রচারিত হইতে পারে নাই, তথাপি লোক সংখ্যা কম হয় নাই। সহরস্থ সমস্ত স্কুল পূর্ব্ব হইতে বন্ধ ছিল জন্য ছাত্র সংখ্যা অধিক হয় নাই। বড় দিনের ছুটীর পর সমুদয় জেলার অধিবাসীর একটী বৃহৎ সভা হইবে। তাহার বিজ্ঞাপন পূর্ব্ব হইতে প্রচার করা হইবে। ঐ সভায় স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের স্মরণ চিহ্ন প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। আমরা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি ঐ সভা খোলা জায়গায় না হইলে ঘরের মধ্যে লোকের সমাবেশ হইবে না।

জজ আদালতে উকীলগণ সমবেত হইয়া মহারাজ বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করেন। জজ গারলিক মহোদয় ভাবপ্রবণতার সহিত তাহার উত্তর দেন। ঐ দিন আফিস আদালত সমস্ত বন্ধ হয়, কেবল খাজানা খানা ২ঘণ্টার জন্য খোলা ছিল। সেদিন সমস্ত বাজার বন্ধ থাকে।

—:0:—

দিনাজপুর পত্রিকা।

(মাসিক)

সপ্তবিংশতি ভাগ { মাঘ, ১৩২৬। } ৫ম সংখ্যা

মহারাজ গিরিজানাথ।

—:0:—

স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পরদিন (৭ই পৌষ, ১৩২৬ ; ২৩ শে ডিসেম্বর, ১৯১৯) "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ" ও "বাঙ্গালী" পত্রিকায় নিম্নলিখিত মত প্রকাশিত হইয়াছিল:—

We regret to announce the death of Maharaja Bahadur Sir Girija Nath Roy of Dinajpur which melancholy event took place yesterday morning. Dinajpur is one of the ancient houses in Bengal and the Maharaja who represented it with credit, was the *type* of

A fine old Bengali, religious, charitable and urban, always anxious to do his fellowbeings a good turn. He was associated with many public organisations and a patron and friend of the Sangit Samaj the premier Bengali Club in Calcutta, which remained closed yesterday as a mark of respect. The Maharaja was an excellent gentleman. I. D. News.

দিনাজপুরের মহারাজা-বাহাদুর স্যর গিরিজানাথ রায় কে,সি,আই,ই মহোদয় গত রবিবার রাত্রি সাড়ে চারিটার সময়ে (ইংরেজী হিসাবে সোমবার সূর্য্যোদয়ে) ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। মহারাজ-বাহাদুর আজ প্রায় বৎসরেক কাল ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত হইয়াছিলেন ; বায়ুপরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এবং সুচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়। নগরের প্রায় সকল বড় বড় চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করেন ; কিন্তু নিয়তির উপর ত মনুষ্যের কোন চেষ্টা চলে না, সকলই ব্যর্থ হয়। মহারাজ গিরিজানাথ তাঁহার পুত্রপরিবারবর্গকে, মহারাণীকে, বন্ধু-বান্ধব-স্বজন-পরিজনবর্গকে কাঁদাইয়া পুণ্যতিথি অমাবস্যার দিনে দেহ রাখিয়া স্বধামে গমন করিলেন। মৃত্যুকালে মহারাজ-বাহাদুরের মোট সাতান্ন বৎসর বয়ঃক্রম চলিতেছিল। দিনাজপুরের রাজবংশ অতি পুরাতন ; মোগল সম্রাট শাজাহানের শাসনকালে উহার প্রতিষ্ঠা হয়। মোগলদের শাসন যতদিন বজায় ছিল তত দিন দিনাজপুর রাজ পশ্চিম বঙ্গের সামন্ত রাজের সম্মান, অধিকার ও পদ ভোগ করিয়াছিলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেবী সিংহের ইজারার সময়ে দিনাজপুররাজের

প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠার খর্ব্ব হয়। রাঢ়ে বর্দ্ধমান, বগড়ীতে নবদ্বীপ-রাজ, পশ্চিম বরেন্দ্রে দিনাজপুর, পূর্ব্ব বরেন্দ্রে এবং বগড়ীর পূর্ব্বাংশে নাটোর আর সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে ও গারোপ্রদেশে সুসঙ্গ,—এই পাঁচ মহারাজই এককালে বাঙ্গালার পাঁচদিক জুড়িয়াছিলেন, বাঙ্গালী জাতিকে মোগল আমলে হিন্দু আদর্শানুকূল সুশাসনে রক্ষা করিতেন। এখন ইঁহারা সবাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন জমিদার মাত্র; পরন্তু বনীয়াদী ঘরের মর্য্যাদা এখনও ইঁহাদের নামের সহিত সংলগ্ন আছে। মহারাজা গিরিজানাথ সে পুরাতন ধারা, দিনাজপুর রাজবংশের মর্যাদা স্বীয় চরিত্রের ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে অক্ষুন্ন এবং অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। দিনাজপুর রাজবংশ জাতিতে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। বলা বাহুল্য মহারাজা গিরিজানাথ উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের চূড়াস্বরূপ ছিলেন। ধর্ম্মে আচারী বৈষ্ণব—অতি কঠোর সদাচারী ও ব্রতপরায়ণ, ব্যবহারে নিষ্ঠাবান হিন্দু, দেবদ্বিজে ভক্তিমান এবং সমাজ বিন্যাস রক্ষায় সদা সচেষ্ট,—মহারাজ গিরিজানাথ চরিত্রে আদর্শ পুরুষ ছিলেন, অজাতশত্রু ছিলেন, পঞ্চচূড় বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের চূড়ার নির্ম্মল নিরাবিল কনক কলস স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী হিন্দু যাহা হারাইল তাহা আর মিলিবে না, সে বনীয়াদী ঘরের শিষ্টাচার এবং নির্ম্মৎসর ভাব, সে সনাতন-হিন্দুত্বের—হিন্দু সভ্যতা এবং আদর্শের পোষক ও রক্ষক আর মিলিবে না। মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহনের পরে বাঙ্গালার আদর্শস্বরূপ—মুখপাত স্বরূপ মহারাজ গিরিজানাথই ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার সনাতন আদর্শ লোপ পাইল। বড় পণ্ডিত, বড় বুদ্ধিমান, বড় বক্তা, বড় রাজনীতিক আমরা পরে অনেক পাইব, বাঙ্গালার

উর্ব্বর ক্ষেত্রে মনীষার অভাব হইবে না, পরন্তু সে সকলই বিলাতের বা ইয়োরোপের আদর্শানুকূল হইবে, আমাদের বাঙ্গালার বাঙ্গালিত্ব মণ্ডিত আদর্শ মহারাজ আর পাইব না। ইহাই বড় ক্ষোভের—বড়ই নৈরাশ্যের কথা।

মহারাজ গিরিজানাথের পদমর্য্যাদা কতটা ছিল ও কেমন ছিল তাহা তাঁহার মৃত্যুতে অনেকটা প্রকট হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশে নিজের খাস মুন্সী গোকে সাহেবকে এবং একজন এডিকংকে মহারাজের শবদেহের সহিত শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত যাইবার জন্ত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, নবদ্বীপের মহারাজা বাহাদুর, নাটোরের মহারাজা প্রমুখ বাঙ্গালার অভিজাতবর্গের কলিকাতায় উপস্থিত, সকল অধিনায়কই শ্মশান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের পরে এমন শ্মশানযাত্রা আর কোন মহারাজা বাহাদুরের ভাগ্যে ঘটে নাই। ইহা ছাড়া নগরের শতাধিক গণ্যমান্ত বরেণ্য পুরুষ শব বাহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কাঙ্গালী বিদায়, চান্দ্রায়ণ ও বৈতরণী প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত কার্য্য মহারাজ বাহাদুরের পদোচিত হইয়াছিল।

মহারাজ গিরিজানাথের উত্তরাধিকারী ও পোষ্যপুত্র মহারাজ কুমার জগদীশনাথ রায়কে আমরা শোকাপনোদন উদ্দেশ্যে এমন নূতন কথা কিছুই বলিতে পারি না। পরম ভাগবত পিতার পুত্র তিনি, সংযমী ব্রতাচারী সচ্চরিত্র পিতার পুত্র তিনি, এমন পিতার আশীর্ব্বাদে তাঁহার কল্যাণ হইবেই। তাঁহাকে আর নূতন আদর্শ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না, পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিলে তিনি ধন্ত হইবেন। আশীর্ব্বাদ করি

তিনি যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হউন, দিনাজপুর রাজবংশের ধারা রক্ষা করুন। সত্যই আজ বাঙ্গালার কুলশীমকের স্নেহের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। সে প্রদীপ যাহাতে আবার প্রজ্বলিত হয় এমন সাধনা মহারাজ কুমার জগদীশনাথ করুন, এবং সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

———:০:———

মর্ম্মাহতের শোকোচ্ছ্বাস।

———**———

দেব বালা দেবপুরে আকাশের গায়
অমরাবতি সন্ধ্যা বাতি দিতে দ্রুত যায়
এদিকে দুন্দুভি বাজে, ত্রিদিবে মঙ্গল বাজে
বহিয়া ত্রিদশা লয় করিয়া সৌরভ ময়,
তরঙ্গ ভঙ্গেতে মন্দাকিনী দ্রুত বয়
আনন্দে আনন্দ ময় ত্রিদশ আলয়।

দেব দ্বারে দৌবারিক কহে দেব রাজে
কেন দেব আজি সাজে নব নব সাজে
অপ্সরা কিন্নরী গণে সাজিছে গন্ধর্ব্ব সনে
নব রাগে দেব বালা গাঁথিয়া মন্দার মালা
পরাইবে কাকে যেন করি অনুমান
জানকি হে প্রভু এর নিগূঢ় সন্ধান?

এদিকে কৈলাসে আদি-দেব-দেবতার
মহা যোগে মগ্ন মাত্র উমা-তত্ত্ব সার
মহামায়া হর্ষ মনে   কন্ গিয়া পঞ্চাননে
শোন দেব ত্যজ যোগ   ফুরায়েছে রাজা ভোগ
সেই মহা যোগী রাজা দয়া-অবতার
দিনাজপুরে মুর্ত্তিমান সাধক তোমার।

গিরিজা নাথের বার্ত্তা শুনি ভোলানাথ
অমনি সমাধি ভাঙ্গি করি দৃষ্টিপাত
কহিলেন হে ঈশানি   কহ দেবি সে কাহিনী
দয়া মায়া স্নেহ ময়   ও মানুষ মানুষ নয়
ক্ষণিক পিপাসা হেতু গেছে ভুলিবারে
শীঘ্র কহ দেবি তাঁর সন্দেশ আমারে।

শেষে দেবী মহালাপ কৈলাসে ব্যাপিল
গিরিজা নাথের গুণ সকলে শুনিল
বেতাল ভৈরব নাচে   ভূতগণ পাছে পাছে
বাজিল ডমরু শিঙ্গা   উথলিল শিরে গঙ্গা
বৃষভ ছাড়িল নাদ কাঁপায়ে কৈলাস
পুচ্ছ ঊর্দ্ধে করি [illegible] [illegible] উল্লাস।

বহিয়া মলয় কহে গিরি শৃঙ্গ ধরি
গাছে গাছে পাতে পাতে উঠিল লহরী
সেই যে মোদের সেই   মার প্রিয় শিষ্য যেই
ভোগ শেষ হয়ে তাঁর   আসিছেন কোলে মার
তাই এত কৈলাসেতে পড়ে গেছে ধুম
দেবগণের হুলুস্থুলু ভেঙ্গে দিল ঘুম ।

বেতাল ভৈরব নাচে তাথেই তাথই
পার্ব্বতী গর্জ্জিয়া বলে মা কই মা কই
ডমরু শিঙ্গার বুলি   কর্ণদেশে লাগে তালি
গাজন বহিয়া লয়   প্রতিধ্বনি বিশ্বময়
প্রসন্না প্রসন্ন মনে বাহু প্রসারিয়া
গিরিজা নাথেরে দন পথ আগুরিয়া ।

শিব কন শিবানীকে শোন মহামায়া
বিশ্বের আদিতে তুমি আমি মাত্র ছায়া
গিরিজা নাথের আছে   গিরিজা নাথের কাছে
দিব্যাসন শিবপুরে   রয়েছে কদিন ধরে
দাও দেবি সেই স্থানে মুক্ত নরবরে
তুমি আমি সুখী হব সেহারী ভক্তেরে।

(কথা) বিপুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য অমূল্য গৌরব

ফেলি দিলা অনায়াসে অতুল বৈভব

প্রায় চারি বর্ষ হতে চাহনি আর কথাসিক্তে

বৈরাগ্যে থাকিয়া বুক ছেড়ে দিলে ভোগ সুখ

চৌদ্দই শ্রাবণ দিলে মর্ম্মকথা তার

জুলুন সাগরে কিবা সাধ্য ব্যবহার।

এদিকে গঙ্গার তটে কালী গঙ্গা পেয়ে

গিরিজা নাথের দিব্য দেহ দিল ধুয়ে

দিব্য লোকে দিব্য জ্যোতি প্রসন্ন ললাটে ভাতি

জ্ঞান বৈরাগ্যের রাজা ভাসাইয়া যত প্রজা

চলি গেলা দেবপুরে গিরিজার নাথ

যশঃ কীর্ত্তি রাখি, ধর্ম্ম নিয়ে গেলা সাথ।

ভূপতির দিব্য দেহ গৌরাঙ্গ সুন্দর

ব্যবহারে ততোধিক রূপ মনোহর

সব রাখি একটী নিয়ে চিতায় শুইলা যেয়ে

অন্তিম শয্যায় কিবা শোভে জিদিবের শোভা

হুতাশন যোগে শেষ দিব্য কলেবর

যশঃ কীর্ত্তি রাখি, ধর্ম্ম সঙ্গের দোসর।

সর্ব্বকুক নাহি পাও হেন কলেবর
সার্থক করিয়া লও তোমার অন্তর
আঁধার এদেশ হায় বিনে সেই মহাত্মায়
পাবেনা এ হেন রাজা জানিও সকল প্রজা
ঘুচিল সকল সুখ ক্রম সবাকার
আকাশে দিনেশ বিনে দিনে অন্ধকার ।

হায়রে শ্মশান তুই ধন্য এতদিনে
এমন জিনিস কটা মিলেরে শ্মশানে ?
ফুরাইল রাজ্য ভোগ সোমবারে গঙ্গাযোগ
ধন্য তুমি নররাজ দেখায়ে বৈরাগ্য সাজ
নর দেহ ধরি এই বাহিত আচার
রাখি গেলে এ অঞ্চলে মহিমা তোমার ।

হায়রে এহেন রাজা কেহ নাকি পায়
এই যুগে কটা মিলে অধম তরায়
চলি যায় রেলগাড়ী ধুম পড়ে থাকে তারি
সেইরূপ গেলা চলি স্মৃতিপট ভুমে ফেলি
অাই অগ্নি আই তম অন্ধকার রাখিয়া
গেলরে দয়াল রাজা সংসার ছাড়িয়া ।

সহা নাকি যায় ইহা কহা নাকি যায়
স্মরণে মরমে অহো হৃদয় জ্বালায়
শোকের সাঁড়াশী টানে পাঁজর ভাঙ্গিয়া আনে
ভাবিতে আকুল করে পরাণে না দেহ ধরে
সে তপ্ত অঙ্গার ছাই বালুর কণায়
দহে দিবানিশি অহো ঘোর যন্ত্রণায়;

কতদূরে কতদূরে কতদূরে কুল
চলি গেলা আমাদের সোণার দেউল।
দিনাজপুর কাণা করি নিয়ে গেল হরি হরি,
আমাদের সে দেবতা নিত্য স্বচ্ছ সরলতা
আচণ্ডাল আপনতা কেবারে এমন,
আছেরে মোদের সেই রাজার মতন।

যেতেছ চলিয়া যাও সুখে দেবপুরে
জানি আমি কেহ নাহি থাকিবে সংসারে
নিত্য আশা যাওয়া তাই অবিরাম ক্ষান্ত নাই
মূর্খ আমি তাই করি বিকারেতে বাড়াবাড়ি
শান্তি সুধা সর্ব্বৌষধি পেলে ভাগ্যবান
কর্ম্ম ডুরি না কাটিলে না পায় সন্ধান

(গিয়ে) নিজাসনে বসিলেন গিরিজার নাথ

(অমনি) দেববালা নিয়ে ডালা করিল সাক্ষাত

চামর ঢুলায় এসে গন্ধর্ব্ব কিন্নরী হেসে

অপ্সরা অপ্সরী গণে শিবনাম উচ্চারণে

কৈলাস মুখর করি জয়ধ্বনি করিল

ডালা ভরা মালা দিয়ে ভূপে সাজাইল ।

বম বম বম বম বেতাল ভৈরব

নাদ নিনাদিত কিবা কৈলাসের সব

কি সুখ সৌভাগ্য আহা বলা নাকি যায় তাহা

মনে বুঝিবার কথা সে অমৃত ভাব গাথা

ভাবুক বুঝিতে পারে বলা নাহি যায়

ভাবিলে হৃদয় গলে পরাণ জুড়ায় ।

থাক দেব থাক সুখে মুক্ত দেহ ধারী

শিব শিবানীর ধন কৈলাস বিহারী

শোক তপ্ত রাজপুরী হাহাকার রাজ্য ভরি

শোকোচ্ছ্বাস ঘরে ঘরে দেও শান্তি শোকাতুরে,

তোমার রাজ্যের লাগি কর শান্তিদান

বাঁচুক তোমার প্রজা বাঁচুক সন্তান ।

মুক্ত দেহ ধারী দেব আশীর্বাদ কর
শোকাতুরা রাজলক্ষ্মী তাঁর শোক হর
রাজপুরে শান্তি দিয়া রাজলক্ষ্মী বাঁচাইয়া
রাখ দেব যত্ন করি তোমারি ত রাজপুরী
তব পুণ্যবলে শান্তি করি বরিষণ
রাখহে রাজর্ষি তব রাজক ভবন।

হায় মাতঃ হায় লক্ষ্মী রাজ্ঞীমা আমার
নিজে না বুঝিলে বুক দিতে সাধ্য কার ?
জগতের এই রীতি সদা দেখি এই নীতি
উত্থান পতন হয় দিবানিশি বৃদ্ধি ক্ষয়
জন্ম মৃত্যু ব্যাধি বাধা জীবনের সঙ্গে
থাকিলে মরণ আছে প্রত্যেকের অঙ্গে।

এ রহস্য গূঢ় তত্ত্ব ভরা বিশ্বময়
সত্য ত্রেতা আদি মাগো যুগ চতুষ্টয়
সাগরে অতুল জলে কতবা বুদ্বুদ খেলে
জলে উঠে জলে মিশে কিছু নাহি থাকে শেষে
সাগরের জল যথা সাগরে সমান
দুদিনের হাস্য বাদি লয় করি জ্ঞান।

কর আশীর্ব্বাদ নাথ কুমারে তোমার
তব গুণে গুণী হয় করুন সংসার
ঘুচুক যন্ত্রণা দুঃখ ভুঞ্জুন সংসার সুখ
বুঝুক সকলে তাঁর সৎকার্য্যের পুরস্কার
দীর্ঘজীবী কর তাঁয় এ ভিক্ষা আমার
অর্থ সর্ব্ব গুণে গুণী হউন কুমার।

রাজধানী ছাড়ি গেলে ফিরিলে না আর
এই বড় খেদ মনে রহিল সবার
পঁচিশ বছর গেছে আশ্রিত তোমার কাছে
একদিন কটু কথা বল নাই দিয়ে ব্যথা
সানন্দে করেছি কাজ তোমার কৃপায়
আগে গিয়ে শেষে দিলে যাতনা আমায়।

এ পারে ও পারে বহু দূর পারাবার
তা না হলে গা ছাড়িয়া দিতাম সাঁতার
তবু তব কৃপা বলে শীঘ্রই আসিব চলে
দর্শন করিব লাভ ঘুচাইব মনস্তাপ
ছিষট্টি চলিয়া যায় আর কতক্ষণ
বেশী নাথ বাকী নাই হইতে মরণ।

আশ্রিতের পুণ্যবলে শেষ দরশন
আটাশে কার্ত্তিক রাণী গিরীশ-ভবন
রয়েছিনু ধন্য আমি   মিষ্টালাপে তুষি তুমি
বিদায় করিয়া দিলে   কার্য্যের গুরুত্ব বলে
জানিনা জানিনা অহো শেষ দরশন
জানিলে কি ছাড়িতাম গিরীশ-ভবন ?

জনমের মত সেই শেষ দরশন
মূল মন্ত্র সম মোর যাবৎ মরণ
সে স্মৃতি রাখিয়া মনে   যাপিব হে সযতনে
স্তিমিত বর্ত্তিকা প্রায়   জীবন সায়াহ্নে হায়
(তবু) শান্তিময় কান্তিখানি সুধামাখা বাণী
সেই শেষ সুখ স্মরি জুড়াই পরাণি।

শোকোচ্ছ্বাস।

রাজ প্রতিনিধি আগমন জন্য
না থামিতে হায় আনন্দ রোল
নির্ম্মম পবন চালে শ্রুতিমূলে
'নাই' বারতা তপ্ত হলাহল।

সকলের মুখে   শুধু হায় হায়
সকলের মুখ কালিমা ময়,
সকলে নির্ব্বাক   শুধু তপ্ত শ্বাস,
অবিরল ধারা নয়নে বয়।

কাঁদ কাঁদ কাঁদ কাঁদ উত্তরায়
কাঁদ কাঁদ কাঁদ দিনাজপুর,
ছাড়িয়া গেছেন আজিরে মোদিগে
গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর ।

নির্ব্বাত নিষ্কম্প পয়োধির মত
সেই ভীম সৌম্য মূরতি আর,
পাবনা দেখিতে কভু দু'নয়নে
দিনাজপুর আজি অন্ধকার ।

আছিলেন যিনি ন্যগ্রোধের মত
দিনাজপুরীর আশ্রয় স্থল,
জ্ঞান বিজ্ঞানের উতসাহ দাতা
সহায় দীন দুর্ব্বলের বল ।

আছিলেন যিনি মোদের গৌরব
প্রখ্যাতি সূর্য্যাস্ত যতেকদূর,
গিয়াছেন ছেড়ে সেই মহারাজা
কাঁদ কাঁদ কাঁদ দিনাজপুর ।

সরস্বতী গঙ্গা যমুনা যেমতি
ত্রিবেণী একত্র মিলিত হ'য়ে
করেছে মহান্ তীর্থে পরিণত;
তেমতি নৃপতি গিরিজা রায়ে ।

ভকতি করম জ্ঞানের প্রবাহ
সবে মিলি করেছে পুণ্য তীর্থ,
যোগীর আদর্শ ভোগীর আদর্শ
লুব্ধ রাজপদ প্রজা হিতার্থ ।

আভিজাত্য স্পর্দ্ধা তিতিক্ষা বিনয়
সংযোগ বিরোধী গুণ নিচয়
অপূর্ব্ব ভাবেতে মিলিয়া স্বভাবে
করেছে যাঁহারে গরিমা ময়।

গিয়াছেন ছেড়ে সেই মহাত্মা
গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর
কাঁদ কাঁদ কাঁদ কাঁদ উত্তরাঢ়
কাঁদ কাঁদ কাঁদ দিনাজপুর।

কে আর রক্ষিবে প্রকৃতি পুঞ্জে
কে মুছাবে দীনের অশ্রুজল,
কে আর শারদ চন্দ্রিকার মত
তপ্ত অঙ্গ করিবে শীতল।

কে পালিবে দীন প্রজাগণে অহো
করিবে ব্যথিত বেদনা দূর
গিয়াছেন ছেড়ে আজি আমাদের
গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর।

কাঁদ কাঁদ কাঁদ কাঁদ দিনাজপুর
কাঁদিবার আজ দিন তোমার ;
গিয়াছে তোমার সৌভাগ্য ও শান্তি
আজিকে ভাগ্যে শুধু হাহাকার।

হে শ্রীকান্ত পদ প্রান্তে তব
জীবদ্দশায় যাঁর আছিল প্রাণ
সেই নৃপতি গিরিজা নাথে
তব শ্রীপদ প্রান্তে দাও হে স্থান।

জয় জগদীশ　　জগদীশ নাথে
তাঁহারই মত আদর্শ রাজা
পিতার পদাঙ্ক　　অনুসরি যেন
পিতার মতন পালেন প্রজা।

——:০:——

"অপেক্ষায়"

——**——

তাঁরি তরে আমি
দিবস রজনী
নয়নের বারি করি বরিষণ।
আসিব　বলিয়া
গেছেন　চলিয়া
(তাই) শূন্য মনে পথ করি নিরীক্ষণ॥
নিরজনে　একা
তাঁরি সনে দেখা
হবে না কি পুনঃ জীবনে কখন।
আনমনে　ভাবি
ওই বুঝি দেখি
ঐ বুঝি আসেন বাঞ্ছিত রতন॥

(শুধু) দিন চলে যায়
না আসেন কায়
আসেন না ত যাঁরে চায় প্রাণ।
আসিবার হলে
আসিতেন চলে
নাহি রাখিতেন আশায় এমন ॥

চারিদিকে মন
ধায় অনুক্ষণ
মিলাতে তাঁহারে করিয়ে সন্ধান।
ফিরে শুধু আসে
নিরাশায় ভাসে
দিন চলে যায় করিয়ে ক্রন্দন ॥

মরণের পরে
যদি দেখি ফিরে
তথাপি তাঁহারে চাহিবে এ প্রাণ
তাঁহারি আশায়
চাতকের প্রায়
রহিবে বসিয়ে তৃষিত—পরাণ

জন্ম জন্ম ধরি
তাঁরি আশে ঘুরি
ভগ্ন আঁখিজল ফেলিবে নয়ন

আপার বন্ধনে
জনমে জনমে
চাহে মাত্র তাঁর প্রেম-আলিঙ্গন ॥

স্থানীয় সংবাদ।

স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর—এর পরলোকগমনে স্থানীয় প্রায় সমুদয় সভা সমিতি শোক প্রকাশ করিয়াছেন। নব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সভার উৎযোগে ১১ই পৌষ তারিখে ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারে একটি সাধারণ সভা হয়। তাহাতে শ্রীমান কামাখ্যা প্রসাদ নিয়োগী রচিত নিম্নলিখিত শোক-গীতি গীত হইয়াছিল। সাহিত্য সভার স্থায়ী সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন ঐ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মরণ মিলন গীতি মরতে গাহিয়া যায়,
মা'র কোলে ছেলে গেছে—
ঘুমাতে মায়েরি ছা'য়।

কাঙ্গালের তরে প্রভু,
এতকাল বেঁচেছ,
অপরের তরে শুধু,
অবিরত খেটেছ ;
বিরাম লভিতে তাই গেলে বুঝি অমরায় ।
এত ছেলে রেখে গেছ,
ভাবিলনা তাকি মনে,
কেমনে কাটালে মায়া
চলে গেলে সঙ্গোপনে,
আর না কাঁদিব প্রভু,
আঁখিজল ফেলিব না,
শান্তি পথে আর তব,
দুখ গান গাহিব না,
যাও প্রভু মুক্ত তুমি মা তোমায় ডাকিছে 'আয়' ।

ডাকাতি—

গঙ্গারামপুর থানার এলাকা নওয়া বাজারের আধ ক্রোশ দক্ষিণে ৩০ শে অগ্রহায়ণ রাত্রিতে ডাকাতি হইয়াছে । ১০ খানা গাড়ী একত্রে যাইতেছিল । তন্মধ্যে সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ মর্দ্দার ও শ্রীভিখাদাস বৈরাগীর গাড়ী ছিল । হরনারায়ণ বাবু মাড়োয়ারী বস্ত্র ব্যবসায়ী, তাঁহার গাড়ীতে ৭।৮ শত টাকার কাপড় ও নগদ ১০০৲ টাকা ছিল । ভিখাদাস কেরোসিন, লবণ ও সুপারির কারবার করিত । তাহার গাড়ীতে ৪০০৲ টাকা ছিল । ডাকাইতেরা ঐ দুই গাড়ী লুট করিয়াছে । পূর্ব্ববর্ত্তী ৮খানা গাড়ীর গাড়োয়ান জোরে বয়েল তাড়াইয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিল । একখানা গাড়ীতে কিছু ছিল না,

তাহার আরোহী গাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। ভিখাদাস খুব জখম হইয়াছে, হরনারায়ণ বাবুর গাড়োয়ানকেও ডাকাইতেরা লাঠির আঘাত করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছেন। শুনা যায় নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে ১৫০।১৭৫, টাকা পরিমাণ মূল্যের কাপড় পাওয়া গিয়াছে।

সম্রাট মহোদয়ের ঘোষণা পত্র—

শাসন সংস্কার আইন পার্লেমেন্ট মহাসভায় বিধিবদ্ধ হইয়া ২৩ শে ডিসেম্বর তারিখে মহিমবর শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারত সম্রাট মহোদয়ের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ আইন দ্বারা ভারতবাসীকে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

বাঙ্গালার শাসন পরিষদে বর্ত্তমানে ২ জন ইংরেজ ও একজন দেশীয় সভ্যের পরিবর্ত্তে ১জন ইংরেজ ও ১জন দেশীয় সভ্য এবং ২জন দেশীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, পূর্ত্ত প্রভৃতি বিভাগে দেশীয় মন্ত্রীদ্বয় কর্ত্তৃত্ব করিবেন। মন্ত্রীদ্বয় যদি সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তবে দশ বৎসরের মধ্যে না হইলেও ১০ বৎসর পরে আরও বিভাগের কর্ত্তৃত্ব তাঁহাদের উপর অর্পিত হইবে।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিতে ২৲ টাকা পথকর, ১৲ টাকা চৌকীদারি টেক্স এবং ইনকম টেক্স দাতা মাত্রেই অধিকারী হইবেন। অনুন্নত শ্রেণী হইতে গবর্ণমেন্ট বাছিয়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত করিবেন। বাঙ্গালা দেশে প্রায় ১৬০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আছেন। ৭বৎসরের উপাধিধারী মাত্রেই নির্ব্বাচনে অধিকারী হইবেন। মুসলমান সম্প্রদায়কে বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা ৮০ জন বেসরকারী সভ্য থাকিবেন। বক্রী ২০ জনকে গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু তন্মধ্যেও সরকারী কর্ম্মচারী সংখ্যা বেশী হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সম্বন্ধে সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভার অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। এবং কোন ২ বিভাগের কার্য্য পরিচালনের সহায়তা জন্ত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

পার্লেমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর অভিজ্ঞ একজনকে প্রথমতঃ ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি পদে গবর্ণর নিযুক্ত করিবেন। ৪বৎসর পরে সভ্যগণ সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন। গবর্ণর সভাপতি থাকিতেছেন না।

ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদে ৬জন সভ্য মধ্যে এক্ষণে একজন মাত্র এদেশীয় আছেন, নূতন আইনানুসারে ৩জন দেশীয় সভ্য হইবেন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও বেসরকারী সভ্য সংখ্যা বেশী হইবে। এবং সভ্যগণ আয় ব্যয় সম্বন্ধে ভোট দিতে পারিবেন এবং পার্লেমেণ্ট মহাসভার বিধানের বিপরীত কিছু কার্য্য না করিয়া বাণিজ্য শুল্ক স্থাপন করিতে পারিবেন।

ভারত সচিবের মন্ত্রণা পরিষদের ব্যয় বিলাতের রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। ঐ পরিষদের সভ্য সংখ্যা ৮জন মধ্যে ৪জন ভারতবাসী থাকিবেন। আর ১বৎসর পরে নূতন আইনের বিধানুযায়ী কার্য্য হইতে থাকিবে। খুব সম্ভবতঃ আগামী নবেম্বর মাসে নির্ব্বাচন হইবে।

আমাদিগের সম্রাট মহোদয় শাসন সংস্কার আইন মঞ্জুর করিয়া এক ঘোষণা পত্র দ্বারা নবযুগের সূচনা করিয়াছেন। ঘোষণা পত্রে বলিয়াছেন যে ১৭৭৩ ও ১৭৮৪ সালের আইন কোম্পানির আমলে শাসন ও বিচারের একটা পদ্ধতি স্থাপনোদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮৩৩ সালের আইনে ভারতবাসীগণের জন্য রাজকার্য্যে নিয়োগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। ১৮৫৮ সালের আইন দ্বারা কোম্পানির হাত হইতে স্বর্গীয় মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার হস্তে ভারত শাসন অর্পিত এবং জাতীয় জীবন গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৬১ সালের আইন প্রতিনিধি মুলক শাসনের বীজ বপন করিয়াছিল, ১৯০৯ সালের আইন দ্বারা ঐ বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে যে আইন বিধিবদ্ধ হইল তদ্বারা জন-সাধারণের প্রতিনিধিগণের হস্তে শাসন সংক্রান্ত বিশেষ ২ ভার ন্যস্ত করিল এবং অতঃপর পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্ব শাসন প্রণালীর পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিল। সম্রাট মহোদয় আশা করেন যে এই আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তাহা মানবের উন্নতির ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে।

এই সময়ে ভারতবাসী ও রাজকর্মচারীগণের মধ্যে মনোমালিন্যের চিহ্ন যথাসাধ্য দূর করিতে সম্রাট মহোদয় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইতেছে, একই উদ্দেশ্যে প্রজা ও রাজকর্মচারীগণের এক প্রাণ হইয়া কার্য্য করিতে সংকল্প করিয়া তাহার সূচনা করুন। তজ্জন্য আদেশ করিয়াছেন যে রাজপ্রতিনিধির বিবেচনা মত বিপদ সম্ভাবনার স্থল যেখানে নাই, সেরূপ সকল স্থলেই রাজনীতিক অপরাধীদিগের প্রতি রাজকীয় দয়া প্রকাশিত হইবে।

দেশীয় রাজন্যবর্গের [একটী] সভা স্থাপন সম্বন্ধেও সম্রাট মহোদয় সম্মতি দিয়াছেন এবং তাঁহাদের অধিকার, [] ক্ষমতা ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন[]।

আগামী বৎসর শীতকালে[] রাজন্যবর্গের সভা এবং নূতন আইনানুসারে ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদির উদ্বোধন জন্য শ্রীলশ্রীযুক্ত যুবরাজ[]মহোদয় এতদ্দেশে আগমন করিবেন।

সর্ব্বশেষে সমগ্র প্রজার সহিত সম্রাট মহোদয় বিশ্বনিয়ন্তার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে ভারতবর্ষ যেন অধিকতর উন্নতি ও সন্তোষের পথে অগ্রসর হইতে পারেন এবং পূর্ণাঙ্গ রাজনীতিক অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।

সম্রাট মহোদয়ের এই ঘোষণা বাণী প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হইবে এবং প্রজাপুঞ্জের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি ও তাহাদের হিতেচ্ছা জানাইয়া দিবে! ঘোষণা বাণীর পশ্চাতে ভারত সচিব শ্রীযুক্ত মণ্টেগু মহোদয়ের হস্ত প্রচ্ছন্নে রহিয়াছে। ভারতবাসীর জন্য তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারেনা। তিনি আমাদের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র।

২৬ শে ডিসেম্বর বেলা ১০ টার সময় অত্র সহরের ময়দানে শ্রীযুক্ত কালেক্টার সাহেব বাহাদুর ইংরাজীতে উক্ত ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। তথাতে রাজকীয় পতাকা স্থাপন করা হইয়াছিল এবং রিজার্ব পুলিশদল সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। পূর্ব্বে এই সংবাদ ভালমত প্রচার না হওয়াতে উপস্থিতের সংখ্যা বেশী হয় নাই, তবে সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ ছিলেন।

দেওয়ানী আদালত—

শ্রীযুক্ত জে, এ, রস সাহেব বাহাদুর এই জেলার জজ হইয়া আসিয়াছেন, এপ্রিল মাসে পাকা জজ শ্রীযুক্ত ডসন সাহেব বাহাদুর আগমন করিবেন।

শ্রীযুক্ত শশিকুমার ঘোষ অত্রত্য ২য় সদর মুন্সেফ হইয়া আসিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ইনি বালুরঘাটের মুন্সেফ ছিলেন।

অগ্নিদাহ—

গত ৮ই পৌষ রাত্রি ৭ঘটিকার সময় ৺খাঁ সাহেবের বাড়ীর নিকটে পশ্চিম দেশীয় কতিপয় মুচি রাত্রিতে আগুন পোহাইতেছিল। সেই আগুন গায়ের কাপড়ে লাগিয়া একটী মেয়ের শরীর পুড়িয়া গিয়াছিল, এবং তাহার বাড়ীর ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। মেয়েটীকে সেই রাত্রেই সরকারী হাসপাতালে লওয়া হয়, সেখানে দুইদিন অবস্থানের পর মারা গিয়াছে।

হিন্দু-মুসলমান সভা—

৩রা মাঘ নাট্য সমিতির গৃহে পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত মৌলানা পীর মহম্মদ গিলানী হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অমৃত সহরে বড় দিনের বন্ধের মধ্যে যে বিরাট মুসলমান সভা হয়, তাহাতে এইরূপ মন্তব্য পরিগৃহীত হইয়াছে যে ঈদ্ প্রভৃতি পর্ব্বে মুসলমানগণ যতদূর সম্ভব গো-হত্যা হইতে বিরত হইবেন। আমাদের বিশ্বাস ঐ এক মন্তব্য পরিগ্রহণে হিন্দু-মুসলমানের একতা দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

অবসর প্রাপ্ত লেফটেনেণ্ট কর্ণেল ডাঃ মুখোপাধ্যায় ৫।৬ই মাঘ দুইদিন নাট্য-সমিতির গৃহে ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু জাতি ও তাহার উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে দুইটী হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষদিন আমাদের নবীন মহারাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দুই দিনই সভাস্থল জনতাপূর্ণ হইয়াছিল। ডাঃ মুখোপাধ্যায় স্থানীয় ক্লাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। শেষ দিনের বক্তৃতার পরে তাঁহার বক্তৃতার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার জন্য তিনি একটী সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সাব ডাক্তার রেবতীপ্রসাদ

সরকারী মাদকতা নিবারণ উদ্দেশ্যে একটী সমিতি এখানে সংগঠন করিয়াছিলেন। ঐ সমিতির আর কোনও সংবাদ আমরা জানি না। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের সমিতিরও সেই দশা না হয়।

পল্লীবার্ত্তা

১৩ই মাঘ মঙ্গলবার দিবা ২॥ টা ও টার সময় সদর থানার এলাকাধীন সদরপুর গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দুখানা বাড়ীর মধ্যে একখানা ঘরও বাঁচাইতে পারা যায় নাই। অতিকষ্টে একখানা বাড়ী রক্ষা পাইয়াছে। মাঝখানে ইজিরৎদ্দিন সাহার টিনের বাড়ী থাকাতে এই বাড়ীখানা রক্ষা করিতে পারা গিয়াছে। মাঠ হইতে সংগৃহীত ধান্য সকলেরই বাড়ীতে পুঞ্জীকৃত ছিল। বহুকষ্টেও পুঞ্জীকৃত ধান্যগুলি রক্ষা করিতে পারা যায় নাই। প্রায় হাজার টাকার ধান্যই ভস্মীভূত হইয়াছে। ইজিরৎদ্দিন সাহা ধনী লোক, যদিও তাঁহার ক্ষতির পরিমাণ সকলের অপেক্ষা বেশী, তাহা হইলেও তাহা পূরণ করিতে তাঁহার বেশী দিন লাগিবে না, কিন্তু তাঁহার গরীব দুঃখী আত্মীয়দের ও প্রতিবেশীবৃন্দের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর পূরণ হইবার উপায় নাই। তাহারা একেবারেই বিপন্ন ও নিরাশ্রয়। তাহাদের উপস্থিত মাথা লুকাইবার একটু স্থান নাই, অনেকের এক বেলা খাইবারও সংস্থান নাই। এই সকল গরীব দুঃখী লোক কি খাইয়া যে সারাটী বৎসর কাটাইবে ভাবিতেও প্রাণ আতঙ্কিত হয়। এদিকে ধানের দর ধু ধু করিয়া চড়িয়া উঠিতেছে, আজকাল এই "কাটা মাড়া" দিনেই ধান টাকায় কাঁচি ১৪।১৫ সের। জানি না এই ঘোর অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলময়ের কি মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

ধান্য কর্ত্তন প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। কিছু কিছু মাড়াইও হইতেছে। ধান্যের ফসল দেখিয়া অনেকেই কিন্তু গালে হাত দিয়া ভবিষ্যৎ ভাবনায় ম্রিয়মাণ হইয়াছে। বৃষ্টি অভাবে রবি শস্যের অবস্থাও শোচনীয় হইতে চলিয়াছে। এদিকে ধান্যের দর অসম্ভব রূপে চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। পাটের দর পড়াতে দরিদ্র কৃষকদের গায়ের কাপড় পর্য্যন্তও জোটে নাই—, অনেকের লজ্জা ও শীত নিবারণ দায় হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, উপযুক্ত খাদ্য ও শীত নিবারণোপযোগী বস্ত্রের অভাবই এবম্বিধ ব্যাধিব্যাধির এক মাত্র কারণ।

দিনাজপুর পত্রিকা।

(মাসিক)

সপ্তাবংশতি ভাগ | ফাল্গুন, ১৩২৬। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সন্ধান।

—:0:—

কত বন উপবন নগর প্রান্তর

ভ্রমিনু বিফলে হায়!—

ছায়ামাত্র লক্ষ্য করি নিরাশা সম্বল

কত দেশ দেশান্তর ভ্রমিনু নিরন্তর,

কিন্তু সকলি বিফলে যায়, না হেরিনু

কোথা মোর সেই দেবতায়।

উপরে অনন্ত নীল আকাশ অসীম
সৃষ্টির গরিষ্ঠ জীব দিতে নারে সীমা
ওই যে, প্রশান্ত জলধি দূরে করে আহ্বান
মনুষ্যের সাধ্য কিবা করে নির্ধারণ।
সম্মুখে প্রান্তর দীর্ঘ লতাবৃক্ষহীন
ধূ ধূ করে সদা, গরবে নহে তো দীন।
এ সবারি মাঝে কোথা আছে স্থান মোর—
কেবা তাহা করে নিরূপণ ?

জীবনের ব্রত মম করিতে সফল
কত যত্ন কত চেষ্টা কার্য্য আড়ম্বর
সাধিতে আপন কর্ম্ম সদাই তৎপর।
কোথা যত্ন কোথা চেষ্টা কোথা কার্য্য মোর ?
স্বপনের ছায়া সম করি নিরীক্ষণ—
ব্যর্থ চেষ্টা ব্যর্থ কার্য্য ব্যর্থ শ্রম মোর
বুঝিনু এতদিনে হায়, জানিনা—পাইব
কিনা মোর সেই দেবতায়।

ফুলে জলে গড়েছি মানস-প্রতিমায়
ষোড়শ বিধানে পূজি সেই দেবতায়।
কিন্তু কোথা দেব কোথায় বসতি তাঁর ?
কোথায় মন্দির কেবা করিবে প্রচার ?
পূজা অর্ঘ্য কেবা মোর করিছে গ্রহণ ?
কোথা দেব কোথা তুমি কোথায় ভবন ?
আশার কাননে মোর ফুটিবে না ফুল ?
সমগ্র বিশ্বের মাঝে বাকি দেখি ভুল।

বাধা-ভরা-পদে, সে যে কাঁটা পথে পথে
তবুও ছুটেছি নাহিক বিরাম মোর
চিরদিনের আশা যে মোর সাথে হায়।
ভুলিতে কি পারা যায়, কোথা দেব তুমি—
পাব কি তোমায় দেবতায় ?

—:0:—

স্বর্গীয় মহারাজা সার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে, সি, আই, ই।

—:0:—

প্রায় আটশত বৎসর গত হইল উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ মহোদয়গণের পঞ্চ বীজপুরুষ বঙ্গে আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে সৌকালীন গোত্রীয় সোমেশ্বর ঘোষ অযোধ্যা হইতে আগমন করিয়া উত্তর রাঢ়স্থ জয়যান গ্রামে বসতি করেন। জয়যান এক্ষণে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। জয়যানে ও তৎসন্নিহিত বহু স্থানে ঘোষ বংশের কীর্ত্তি কলাপ বিদ্যমান ছিল; কালে সকল লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে কেবল মাত্র সোমেশ্বর মহাদেব ও মাতা সর্ব্বমঙ্গলা ঘোষ বংশের প্রাচীন কীর্ত্তি বিঘোষিত করিয়া জয়যানে বিরাজমান আছেন। বংশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানা কারণে ঘোষ বংশীয়গণ এক্ষণে বহু স্থানে বসতি

করিতেছেন; কিন্তু সমর্থ হইলে সকলেই বিবাহাদি শুভকার্য্যে সোমেশ্বর মহাদেবের ও মাতা সর্ব্বমঙ্গলার নির্ম্মাল্য আনাইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হন। বিশেষতঃ বিবাহ সময়ে মাতা সর্ব্বমঙ্গলার প্রসাদ মালা ঘোষ বংশের কন্যাগণ সভাস্থ পাত্রের গলদেশে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া লন ও শিব শিবার যুগল চরণ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সংসার ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন।

উক্ত পঞ্চ বীজপুরুষের অন্যতম কাশ্যপ গোত্রীয় দেবদত্ত মায়াপুরী হইতে আগমন করিয়া উত্তর রাঢ়ে বরুট গ্রামে বাস করেন। কালক্রমে কর্ম্মসূত্রে তাঁহার বংশধরেরা বহু স্থান গত হইয়াছেন। এই বংশে বিষ্ণুদত্ত নামে একজন বিদ্বান ও কর্ম্মদক্ষ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের সুবাদার তাঁহাকে উত্তর বঙ্গের কানুনগো পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। কর্ম্মোপলক্ষে বিষ্ণুদত্ত দিনাজপুরে বসতি করেন ও কিছু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীমন্ত দত্ত পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করেন এবং বাঙ্গালার রাজকোষে কর প্রদান করিয়া উহা ভোগদখল করিতে থাকেন। চতুরাশ্রমের সম্যক সম্মান বিধান ও পরিপালন জন্য শ্রীমন্ত দত্ত চতুর্ধুরীণ (চৌধুরী) উপাধি প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্ত চৌধুরীর এক পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও এক কন্যা গৌরী। গৌরী যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী ছিলেন। সোমেশ্বর ঘোষ হইতে দ্বাবিংশ পুরুষ হরিরাম ঘোষ এই সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং শ্বশুরের আগ্রহাতিশয়ে দিনাজপুরেই বাস করিতে থাকেন। গৌরীর গর্ভে হরিরাম

ঘোষের এক পুত্র জন্মে। ইঁহার নাম শুকদেব ঘোষ। ইনিই বর্ত্তমান দিনাজপুর রাজবংশের আদিপুরুষ।

শ্রীমন্ত চৌধুরীর মৃত্যুর পর হরিশ্চন্দ্র পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া ভাগিনের শুকদেবের উপর সম্পত্তি পরিচালনের ভার ন্যস্ত করিলেন। শুকদেব অল্প বয়স্ক হইলেও ন্যায় ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যশস্বী হন ও বাঙ্গালার রাজকোষে দেয় কর যথা সময়ে প্রদান করিয়া সুবাদার ও তাঁহার অমাত্যবর্গের প্রিয় হইয়া উঠেন। হঠাৎ অপুত্রক অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হইল। ভাগিনের শুকদেব সুবাদারের নিকট সুপরিচিত ছিলেন; সুতরাং মাতুলের সম্পত্তি ভোগাধিকারের ফরমান তিনিই প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে সম্পত্তি লাভ করিয়া শুকদেবের সুশাসনে মান গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ক্রমে তাঁহার যশঃসৌরভ সুদূর দিল্লী সিংহাসন পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই সময় দিনাজপুর অঞ্চলের কতকগুলি পরগণা অশাসিত হইয়া উঠে; দিল্লীশ্বর উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় সেই গুলি শুকদেবের শাসনাধীন করিয়া দেন। নীতিকুশল শুকদেবও শাসননীতি সুপরিচালন করিয়া পরগণাগুলিকে সত্বর নিজ আয়ত্বাধীন করেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজ অধিকার বিস্তার করিতে থাকেন। বৃত্তিসংস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বসতি প্রদান, চতুষ্পাঠী ও অন্নসত্র স্থাপন, অর্থিগণকে অভিলষিত বস্ত্রদান, জলাশয় খনন প্রভৃতি নানা সদনুষ্ঠান শুকদেব করিয়াছিলেন। রাজধানীর অদূরে পূর্ব্বদিকে তিনি এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া উৎসর্গ করেন; অদ্যাপি উহা শুকসাগর নামে খ্যাত। বিস্তীর্ণ ভূভাগ শাসনে ও পালনে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়া মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ শুকদেবকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন।

এই স্থানে একটী বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইতেছে। এই রূপ জনশ্রুতি যে রাজা গণেশ দিনাজপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত এই রাজ্য নানা বিপদ সম্পদের মধ্য দিয়া স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। নহমূলা জনশ্রুতিঃ। মহাত্মা আকবর খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিস্থলে সুবা বাঙ্গলাকে যে চব্বিশটী সরকারে বিভক্ত করেন তন্মধ্যে ছয়টি সরকার আংশিক ভাবে তৎকালীন দিনাজপুর প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। মিঃ বুকানন ও মিঃ ওয়েষ্টমেকটের পুস্তক পাঠে জানা যায় যে সম্ভবতঃ এই সময়ে রাজা গণেশের বংশোদ্ভব এক রাজা বর্ত্তমান দিনাজপুর ও মালদহ জেলার অধিকাংশ ভূখণ্ডের উপর রাজত্ব করিতে ছিলেন। ইঁহার নাম কাশী। এই নরপতির কথা বড় শুনা যায় না বলিয়া ওয়েষ্টমেকট সাহেব তাঁহার অস্তিত্বে কিছু সন্দিহান। পক্ষান্তরে শ্রীমন্ত চৌধুরী যে এক সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার কৃপায় শ্রীমন্তের শ্রীবৃদ্ধি হয় একথা সর্ব্বজন বিদিত। উক্ত সন্ন্যাসীর সমাধি রাজ-ধানীতে এখনও বিদ্যমান আছে এবং রীতিমত পূজিত হইয়া আসিতেছে। ওয়েষ্টমেকট বলেন কাশী ও সন্ন্যাসী একই ব্যক্তি। এই সন্ন্যাসীর নাকি বহু দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, তন্মধ্যে শ্রীকালিয়া জীউর দেবোত্তর, হাবেলি পাঁজরা প্রধান। এই হাবেলি পাঁজরা ও অন্যান্য দেবোত্তর সম্পত্তি তত্তৎ সম্পত্তির মালিক দেব-বিগ্রহগুলি সহ শ্রীমন্ত চৌধুরী সন্ন্যাসীর নিকট প্রাপ্ত হন। এইরূপ সম্পত্তি প্রাপ্তির অনুকূল প্রমাণ স্বরূপ অনেকে বলেন যে বহুকাল ধরিয়া দিনাজপুর রাজ এষ্টেট হাবেলি পাঁজরা নামে অভিহিত হইত। কিন্তু অতঃপর দেখা যাইবে যে শ্রীকালিয়া জীউর সেবা মহারাজা প্রাণনাথ

প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব দেবোত্তর রূপে হাবেলি পাঁজরা পাওয়ার কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। দেবোত্তর হইলে রাজা রাধানাথ ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ঐ সম্পত্তি দেবোত্তর বলিয়া উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেন। যতদূর বুঝা যায় তাহাতে কাশী ও সন্ন্যাসী একই ব্যক্তি। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিম্বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কাশীর সময় নিরূপিত হইয়াছে। বিষ্ণুদত্তের মৃত্যুর পরই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সন্ন্যাসী শ্রীমন্ত দত্তকে শিষ্য করেন; সুতরাং কাল হিসাবে কাশী ও সন্ন্যাসীর একতা প্রমাণে কোন বাধা দেখা যায় না। তৎপর রাজা গণেশ যে দিনাজপুরের একজন ভূস্বামী ছিলেন তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালায় স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। তিনি, তাঁহার পুত্র যদু (জেলাল উদ্দিন) ও পৌত্র সমস্ উদ্দিন (আহম্মদ শাহ) প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল এই স্বাধীনতা ভোগ করেন শুনা যায়। এতদ্ভিন্ন ইতিহাস তাঁহাদের সম্বন্ধে নীরব। এক্ষণে বঙ্গীয় স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে গণেশের বংশধরেরা যে পূর্ব্বপুরুষ হইতে আগত দিনাজপুরের রাজ্য হারাইয়া ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। বড় বড় রাজাধিরাজগণকেও সসাগরা সদ্বীপা ভূখণ্ডের আধিপত্য হারাইয়া তাঁহাদের অধীনে নিজ রাজ্য মধ্যেই সাধারণ প্রজা স্বরূপে অর্জ্জিত অথবা তদ্রূপে পূর্ব্বপুরুষ হইতে আগত সামান্য সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখা যায়। ভাগ্য বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী জ্ঞানে ভবিষ্যৎ দূরদর্শিতা মানবগণকে এই পথ প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু তিনি যে পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন তাহা বলা যায় না। সুতরাং চতুর্দ্দিক পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে দিনাজপুরের রাজ্য রাজা গণেশের হিন্দু-

বংশধর বাপী ভোগ করিতেছিলেন, পরে তীব্র বৈরাগ্য প্রযুক্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাহা শ্রীমন্ত চৌধুরীকে অথবা চৌধুরী মহাশয়ের দৌহিত্র শুকদেবকে দিয়া যান। ইহা দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল না।

উল্লিখিত সমস্যার এইরূপ সমাধান স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছিলাম বলিয়া একটু বিস্তৃত ভাবে এখানে বিবৃত করিলাম। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। এ বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান জন্য স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি রাজা গণেশের রাজধানী, তাঁহার গুরুর বাসস্থান প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শীঘ্রই তাঁহার প্রবন্ধ বাহির হইবে আশা করা যায়।

রাজা শুকদেবের দুই পত্নী। প্রথমার রামদেব ও জয়দেব নামে দুই পুত্র এবং দ্বিতীয়ার প্রাণনাথ নামে এক পুত্র হয়। ১৬৮১ খৃঃ অব্দে রাজা শুকদেব পরলোক গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদেব রাজা হন; কিন্তু রাজ্য প্রাপ্তির তৃতীয় বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপর তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা জয়দেব রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইঁহার রাজত্বকালও তিন বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই ইনি কালকবলে পতিত হন। তখন সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রাণনাথ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

রাজা প্রাণনাথ পুত্র শোকাতুরা বিমাতার চিত্তশুদ্ধি জন্য তাঁহার দ্বারা বহু দান ধর্ম্মাদি আচরণ করাইয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহু পুরাণ ব্যাখ্যা তাঁহাকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পরিশেষে পুণ্যশীলা বিমাতাকে সর্ব্বভূত হিতার্থ জলদানে কৃতসংকল্প দেখিয়া এক দীঘিকা খনন করাইয়া তাঁহার দ্বারা মহাসমারোহে উৎসর্গ করান ও পাহাড়ে মন্দির নির্ম্মাণ ও শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

দিনাজপুর হইতে রঙ্গপুর যাইবার রাজপথপার্শ্বে অবস্থিত মাতাসাগর নামে এই দীর্ঘিকা অদ্যাপিও রাজা প্রাণনাথের অকপট বিমাতৃভক্তি ও ধর্ম্মপ্রাণতার অক্ষয় সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান আছে। যিনি বিমাতার ধর্ম্মবৃদ্ধি ও শোকশান্তির জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় ও প্রযত্ন করিয়াছিলেন তিনি যে স্বীয় গর্ভধারিণীর ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যে ও অন্যান্য প্রিয় সাধনে মুক্ত হস্ত হইবেন তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সময়ে আলমগির বাদশাহ দিল্লীতে শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন এবং আজিমোসন বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন। সরকার ঘোড়াঘাটের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা রাঘবেন্দ্র প্রজাপীড়ক ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠায় আজিমোসন উক্ত সরকার নিজ অধিকারে আনয়ন জন্য শুকদেবকে আদেশ করেন। আদিষ্ট হইয়াও শুকদেব সহসা ঘোড়াঘাট অধিকার করিতে উদ্যত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা রামদেবের প্রতি ঘোড়াঘাট অধিকারের নিদেশপত্র দিল্লীশ্বরের মোহরাঙ্কিত হইয়া বাহির হয়। ইতিমধ্যে রামদেবের মৃত্যু হওয়ায় উক্ত নিদেশপত্র জয়দেবের হস্তগত হয়। নিদেশানুসারে জয়দেব রাঘবেন্দ্রের দেশ কর দিতে থাকেন অথচ তাঁহাকে বশে আনিতে পারেন না। কিন্তু প্রাণনাথ রাজা হইয়া রাঘবেন্দ্রের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। রাঘবেন্দ্র ভীত হইয়া বহু অর্থসহ ঘোড়াঘাট সরকারের নয় আনা অংশ প্রদান পূর্ব্বক প্রাণনাথ নৃপতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

রাঘবেন্দ্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন বটে কিন্তু প্রাণনাথের প্রতি বিদ্বেষবহ্নি হৃদয়ে গোপনে পোষণ করায় তাঁহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। শান্তি পাইবার জন্য পরশ্রীকাতর অপর কয়েক ব্যক্তির সহযোগে রাঘবেন্দ্র দিল্লীশ্বরের নিকট প্রাণনাথের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। দিল্লীশ্বর

কর্ত্তৃক অভিযোগের উত্তর দান জন্য আহূত হইয়া প্রাণনাথ ১৬১৪ শকে দিল্লীযাত্রা করেন এবং পথে শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শন ও পরিক্রমণ মানসে তথায় কয়েক দিবস অবস্থিতি করেন। একদিবস যমুনায় স্নান কালীন নৃপতিবর প্রথমে এক ধাতুময়ী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী দেবী মূর্ত্তি ও পরক্ষণে মণিময় এক অপরূপ দেব মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্নে প্রাণনাথের বিশুদ্ধ চিত্তে এই দুল ভগবানের আভাষ অঙ্কিত হওয়ায় শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় প্রাপ্তিতে সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রসাদ জ্ঞানে পরম বৈষ্ণব প্রাণনাথের হৃদয়ে প্রেমভক্তি উথলিয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে কোন এক দুঃস্থ ব্রাহ্মণের নিকট তিনি শ্রীকালিয়াজীউর শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠা করেন ও তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক সেবার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। এক্ষণে দিল্লীর দরবারে উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া ও গুণগ্রাহী বাদশাহ হইতে রাজোপাধি লাভ করিয়া তিনি দিনাজপুরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং যমুনায় প্রাপ্ত যুগল মূর্ত্তি শ্রীরুক্মিণীকান্ত নামে প্রতিষ্ঠা করিয়া চরিতার্থ হইলেন। ইনিই শ্রীকান্তজীউ নামে সাধারণতঃ অভিহিত।

কথিত আছে রাজা প্রাণনাথ স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া রাজধানী হইতে ছয়ক্রোশ পশ্চিমে উত্তর গোগৃহ বলিয়া প্রসিদ্ধ স্থানে শ্রীকান্তজীউর মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। জগদ্বিখ্যাত এই শ্রীকান্ত মন্দির প্রাণনাথ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র মহারাজা রামনাথ ইহা সম্পূর্ণ ও উৎসর্গ করেন। রাজধানীতে কালিয়াজীউর মন্দির নির্ম্মাণ, বোড়াঘাটে রসিকরায়জীউর মন্দির নির্ম্মাণ, শুকসাগরের তীরে শুকেশ শিবস্থাপন, দিনাজপুর হইতে ছয়ক্রোশ দক্ষিণ মুশিদাবাদ যাইবার রাস্তার পার্শ্বে প্রাণসাগর নামে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা

খনন ও তত্তৃত্তরতটে শিব স্থাপন প্রভৃতি রাজা প্রাণনাথের কীর্ত্তি। ইনি বহু দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও মহত্রান ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। ঔরস পুত্র অভাবে তিনি এক জ্ঞাতিপুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রাখেন রমানাথ। ইনিই দিনাজপুর রাজ বংশের উজ্জ্বল রবি এবং মহারাজা রামনাথ রায় নামে সুপরিচিত। ১৬৪১ শকে মহারাজ প্রাণনাথ স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার সময় ১১২ পরগণা দিনাজপুর রাজের শাসনাধীন ছিল। রাজত্বকাল ১৬১০-১৬৪১ শকাব্দ।

মহারাজা রামনাথ রাজগদিতে আসীন হইয়া বাঙ্গলার সুবাদারকে প্রায় সওয়া চারি লক্ষ টাকা নজর প্রদান করেন। ইনি অতি বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্থির, ধীর ও নীতিজ্ঞ রাজা ছিলেন। ইহাঁর সৈন্যবল নিতান্ত কম ছিল না এবং ইনি নিজে একজন অসামান্য বীরপুরুষ ও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। রণক্ষেত্রে তাঁহাকে স্বয়ং সৈন্যপরিচালন করিতেও দেখিতে পাই। তাঁহার বর্ম্ম ও বল্লম রাজধানীতে বহুকাল সুরক্ষিত ছিল। তদানীন্তন বাঙ্গলার সুবাদার মুর্শিদকুলিখাঁ রাজা রামনাথের গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে তোপ বন্দুক প্রভৃতি বহু অস্ত্র শস্ত্র দিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে থানা পত্তিরাম, পত্নীতলা ও গঙ্গারামপুর মহলত্রয়, সুবাদার তিন খানি ফরমান দ্বারা রামনাথের রাজ্যভুক্ত করিয়া দেন।

শালবাড়ী পরগণার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা প্রজাপীড়ক হইয়া উঠায় ও দেয় কর সময়মত রাজকোষে প্রদান না করায় উক্ত পরগণা নিজ শাসনাধীন করা জন্য রামনাথ আদিষ্ট হন। উক্ত শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া প্রথমে অকৃতকার্য্য হইলেও তিনি অধ্যবসায় বলে নাই

বিপুল আয়োজন করিয়া দ্বিতীয় যুদ্ধে রামনাথ তাঁহাকে পরাস্ত করেন ও শালবাড়ী পরগণা স্বাধিকা ভুক্ত করিয়া লন এই যুদ্ধে বহু তোপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। জনশ্রুতি এই যে শালবাড়ীর জমিদারের গৃহদেবতা চামুণ্ডা ও কালিকা মাতাকে ঘোরাঘাটের নিবাসী কোন এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের যোগে বিরোধরীতে আনয়ন পূর্ব্বক লক্ষ পশুবলি ও তদুপযুক্ত পূজোপকরণ দ্বারা পূজা করিয়া রামনাথ প্রসন্ন করেন ও রাজধানীতে আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীকালিয়াজীউর মন্দিরের একাংশে স্থাপন করেন। এইরূপে দেবীদ্বয় প্রসন্না হইলে রামনাথের যুদ্ধে জয়লাভ হয়। ইনি অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। বাণরাজার ভগ্নাবশিষ্ট প্রাসাদ হইতে ইনি বহু সুবর্ণ রজত মণি মুক্তাদি আহরণ করিয়াছিলেন শুনা যায়।

মুর্শিদকুলিখাঁর পরামর্শানুসারে দিল্লীশ্বরের দর্শন মানসে রামনাথ ১৭৩৭ শকে দিল্লীযাত্রা করেন। রামনাথের গুণগ্রাম পূর্ব্ব হইতেই বাদশাহ অবগত ছিলেন; সুতরাং রামনাথ দিল্লীনগরীতে উপস্থিত হইলে মহম্মদশাহা বাদশাহ এক খাস দরবার করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপর রামনাথের সহিত বঙ্গরাজ্য সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচনা করিয়া সদুত্তর লাভে তাৎকালিক রাজনীতিক্ষেত্রে রামনাথের দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও প্রাধান্য অবগত হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে ছত্র চামর প্রভৃতি রাজচিহ্ন সহ বংশগত মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন; এবং দুর্গ রচনা ও যুদ্ধোপকরণসহ রীতিমত সৈন্য সংগ্রহ করিতে উৎসাহ দেন। পূর্ব্ব হইতেই রামনাথ স্বাধীনভূপতির ন্যায় অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতেছিলেন এবং বন্দীগণের জন্য কারাগৃহও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

রামনাথ এইরূপ ভাবে রাজ্যপরিচালন করিতেছেন এমন সময় রঙ্গপুরের ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ দিনাজপুর আক্রমণ করিলেন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া রামনাথ সপরিবারে গোবিন্দনগর আশ্রয় লইলেন। ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া ফৌজদার চলিয়া গেলে, রামনাথ রাজধানী প্রত্যাগমন করেন এবং এই অত্যাচার বৃত্তান্ত সুবাদারকে জানাইয়া তাঁহার আদেশে মুর্শিদাবাদ হইতে বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত সৈন্য দ্বারা নিজ বাহিনীর পুষ্টিসাধন করতঃ ফৌজদারের বিরুদ্ধে স্বয়ং সৈন্য পরিচালন পূর্ব্বক রামনাথ রঙ্গপুরে উপনীত হন। তুমুল যুদ্ধের পর ফৌজদার পরাজিত ও নিহত হইলেন। ফৌজদারকে আবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদ পাঠাইবার আদেশ ছিল। তিনি নিহত হওয়ায় প্রচুর উপঢৌকন দিয়া রামনাথ সুবাদারকে প্রসন্ন করিলেন। এই যুদ্ধে বাতাসন, বড়বিল প্রভৃতি পাঁচ পরগণা দিনাজপুর রাজের অধীনে আইসে।

রামনাথ যেমন সৌভাগ্যশালী তেমনই কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অগণিত কীর্ত্তিকলাপ মধ্যে কান্তনগরের মন্দির সম্পূর্ণকরণ ও তৎপ্রতিষ্ঠা, ১৬৭৭ শকে ⁄কাশীধামে শিব স্থাপন, গোপালগঞ্জে দুইটী সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ (১৬৭৬ শকে উৎসর্গ), ১৬৬৮ শকে কাঞ্চন ঘাটে মহিষমর্দ্দিনী মাতার বাটী নির্ম্মাণ ও তৎপ্রতিষ্ঠা, ১৬৭১ শকে শুকসাগর-তীরে শুকেশ মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ, করদহা গ্রামে গোপাল মূর্ত্তি স্থাপন, মোহনবাগে রাধারমণজীউর সেবা প্রকাশ, মালদহ জেলার অন্তর্গত ভীমতড় গ্রামে গৌরীপতি শিব স্থাপন ও তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ, উক্ত জেলার রাজনগর গ্রামে রাধামাধবজীউর বিগ্রহ স্থাপন ও তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ, টাঙ্গন নদীর

তীরবর্ত্তী গোবিন্দনগর হইতে পূর্ণভবা তীরবর্ত্তী প্রাণনগর পর্য্যন্ত খাল খনন এবং দিনাজপুরের দুই ক্রোশ দক্ষিণে রামসাগর নামে সুবৃহৎ পুণ্য সলিলা দীর্ঘিকা খনন প্রধান।

রামনাথের রাজত্বকালে বর্গিগঙ্গামা হইয়াছিল। আক্রমণ আশঙ্কায় তিনি স্বীয় রাজধানী পরিখা ও প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করেন ও বহু যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এই হাঙ্গামায় ভীত ও এতদ্বারা সর্ব্বস্বান্ত বহু লোককে তিনি অভয় দান পূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাগণের সাহায্য নিমিত্ত বাদশাহ যখন অধীন নৃপতিগণের উপর মাঙ্গন আদায়ের হুকুম জারি করেন তখন রামনাথ ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রভূত অর্থ দিল্লীর রাজকোষে প্রেরণ করেন ও তজ্জন্য রাজধুরন্ধর খ্যাতি প্রাপ্ত হন।

মহারাজা রামনাথ বাহাদুরের আর একটী কীর্ত্তির কথা উল্লেখ যোগ্য। প্রাচীনকালে স্বনামধন্য কোন কোন ভূপতি কল্পতরুব্রত গ্রহণ করিতেন। দীন দুঃখী, অন্ধ খঞ্জ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কৃষক শিল্পী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক দুরদুরান্তর হইতে ব্রতধারীর নিকট আগমন করিতেন এবং তিনিও সকলের আকাঙ্খা মিটাইয়া দান করিতেন। এই আদান প্রদানে একদিকে যেমন দাতার চিত্তশুদ্ধি হইত, অপরদিকে সাময়িক অভাব পুরণ জন্য হাহাকার নিবৃত্তি, জ্ঞান ধর্ম্ম বৃদ্ধি, কৃষি শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধিত হইত; আধুনিক অর্থনীতির প্রধান সমস্যা এইরূপে পূর্ণ হইয়া যাইত। রামনাথও এই মহৎ উদ্দেশ্যে রামসাগর তটে দুই দণ্ডকাল কল্পতরু হইয়া দেশের ও দশের উন্নতিকল্পে ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিহার পূর্ব্বক অনন্তধামের অধিকারী হইয়াছিলেন।

মহারাজা রামনাথের ৪ পত্নী, ৪ পুত্র, ৪ কন্যা ও ৪ জামাতা ছিলেন। সংসারের এই চারি রূপ বন্ধনের চতুর্গুণত্ব উপলক্ষ করিয়া রাজধানীস্থ তদীয় দ্রব্যজাতে, বিশেষতঃ যুদ্ধোপকরণ ও যোদ্ধৃবর্গের পরিচ্ছদে ৪ অঙ্ক অঙ্কিত থাকিত। তদবধি এই অঙ্কণ প্রথা রাজধানীতে চলিয়া আসিতেছে।

৪২ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া ১৬৮২ শকে রামনাথ নিজ সুকৃত অর্জ্জিত লোকে গমন করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণনাথ পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র রূপনাথের পিতা বর্ত্তমানেই মৃত্যু হইয়াছিল। ভ্রাতা বৈদ্যনাথ ও কান্তনাথকে অসূয়াপরবশ দেখিয়া কৃষ্ণনাথ দিল্লীর দরবার হইতে রাজ্যপ্রাপ্তির সনন্দ আনয়ন করেন; কিন্তু প্রত্যাগমনকালে বরদহে জ্বর রোগে কালকবলে পতিত হন। তখন তৃতীয় ভ্রাতা বৈদ্যনাথ ১৬৮২ শকে রাজা হইলেন। এ সময় মীরকাশিম বাঙ্গালার সুবাদার পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করেন। রামনাথের সময়েই রাজকর বৃদ্ধি হইয়া ১২½ লক্ষ টাকা হয়। এক্ষণে মীরকাশিম ঐ কর ২৬½ লক্ষ ধার্য্য করিলেন। সৈন্য সামন্ত রক্ষণ এবং রাজ্য শাসন ও রক্ষণের অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহান্তে ২৬½ লক্ষ টাকা কর দেওয়া মহারাজা বৈদ্যনাথের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই তিনি বর্দ্ধিত কর দিতে অশক্ত হইলেন। এ জন্য মীরকাশিম বৈদ্যনাথকে মুঙ্গেরে আহ্বান করিয়া কেল্লায় অবরুদ্ধ করিলেন। এই সংবাদ গূঢ় চর দ্বারা কান্তনাথ প্রাপ্ত হইয়াও ভ্রাতার উদ্ধার সাধনে নিশ্চেষ্ট রহিলেন এবং ব্রিটীশদিগের নিকট রাজ্য প্রাপ্তির আবেদন করিলেন। এ দিকে মীরকাশিম ব্রিটীশদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থী হইয়া লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের নিকট গমন করিলে বৈদ্যনাথ দুর্গপালকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া দিনাজপুরে আগমন

করেন এবং খালিশা দপ্তরে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইয়া পুনর্ব্বার রাজ্য গ্রহণ করেন। ১৬৯১ শকে বাঙ্গলা দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাগণকে অন্নদান করিয়া বৈদ্যনাথ অর্থের সার্থকতা করেন। ইনি এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়া নিজ পত্নী রাণী আনন্দময়ীর দ্বারা উৎসর্গ করান। এই দীর্ঘিকার নাম আনন্দ সাগর। আনন্দসাগর হইতে মাতাসাগর পর্য্যন্ত দুইটী খাল খননও বৈদ্যনাথের কীর্ত্তি। ইনি বহু ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বপুরুষদের দত্ত ব্রহ্মোত্তরাদির অনুমোদন করিয়া নূতন সনন্দ দান করিয়াছিলেন। ঔরস সন্তান হয় নাই বলিয়া ১৬৯৮ শকে বৈদ্যনাথ এক জ্ঞাতি পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন ও তাঁহার নাম রাখেন রাধানাথ। এই সময় ব্রিটীশগণের ভারত রাজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৯ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭০১ শকাব্দে মহারাজা বৈদ্যনাথ দেহ ত্যাগ করেন।

ব্রিটীশগণকে ৭৩০ মোহর নজর দিয়া রাধানাথ ওয়ারণ হেষ্টিংসের দস্তখতী এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। কোন্ কোন্ সরকার ও পরগণা এই সময় দিনাজপুর রাজের দখলে ছিল তাহার উল্লেখ এই সনন্দে আছে। রাধানাথের নাবালক অবস্থায় প্রথমে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দিলওয়ারপুর নিবাসী রাজা দেবী সিংহ দ্বারা এই সম্পত্তি পরিচালিত হয়। তৎপর রাণী সরস্বতীর (আনন্দময়ীর) ভ্রাতা জানকীরাম উহা পরিচালন করেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকে কর দেওয়ার তত বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। কর দানের সময় ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও তাহার ব্যতিক্রমে সহসা কড়াকড়ি করা হইত না। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভেই এ বিষয়ে বিশেষ বাঁধাবাঁধি নিয়ম

হইল এবং নিয়ম লঙ্ঘনের দণ্ডদানও সঙ্গে সঙ্গে হইতে লাগিল। মাতুল জানকীরামের নিকট করের টাকা বাকী পড়ায় তিনি অপসৃত হন এবং ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে রাজআত্মীয় রামকান্ত রায় রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। রামকান্ত রায় কার্য্য কর্ম্ম ভালই চালাইতে লাগিলেন কিন্তু রাণী সরস্বতী তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না বলিয়া রাজা রাধানাথ তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতেন না। রাণী সরস্বতীর প্ররোচনায় সুকুমারমতি রাজা রাধানাথ ইংরাজদের সহিত সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ওয়েষ্টমেকট সাহেব বলেন যে রাণী সরস্বতীর স্বামী ২০ বৎসর ব্যাপিয়া একরূপ স্বাধীন রাজা স্বরূপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার ভাই জানকীরামও সেই রূপেই রাজ্য চালাইতেছিলেন। হঠাৎ খাজানা বাকী জন্য জানকীরামকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল, রাণী এ জীবনে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। আর ব্যয় সম্বন্ধে রাণীর কোন হাত রহিল না। এমন কি বাটী মেরামত ও চাকর বাকরদিগের মাহিনা দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার মতামত লওয়া হইত না। দীন দুঃখী আত্মীয় স্বজনদিগকে কিছু দিতে হইলে নিজ তহবিল হইতে তাঁহাকে দিতে হইত। ধার্য্য করের উপর বাবভান যাহা আদায় হইত তাহা উঠাইয়া দেওয়ায় রাজ্যের আয় কমিয়া গেল এই সকল নানাকারনে রাণীর মন বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কাজেই ব্রিটীশদিগের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাব মার্জ্জনা যোগ্য।

—:0:—

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্ম ও মায়া।

—:():—

১৯১৯ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সারস্বত সমাজের বার্ষিক সম্মিলনে শ্রীলশ্রীযুক্ত লর্ড রোণাল্ডসে লাট বাহাদুর, ব্রহ্ম ও মায়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

উপনিষদের মূল শিক্ষা অনুসারে সমগ্র চরাচর বিশ্ব যদি মিথ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা সম্ভূত হয়, তবে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু স্থলে এই অবিদ্যার উৎপত্তি কি করিয়া হইল ? মৈত্রায়ণ উপনিষদে আছে যে সত্য ও মায়া দুইয়েরই আস্বাদন করার জন্য দ্বৈত ভাব বিশিষ্ট বিশ্বে আত্মন্ প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বলিলে ব্রহ্মের স্বরূপের সঙ্কোচ করা হয়। নির্গুণ ব্রহ্মে কামনা আরোপ করা হয়। সুতরাং প্রশ্ন এই যে কি করিয়া পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপ ভ্রান্তির উৎপত্তি হইল ?

এই প্রশ্নের সমাধানার্থ এই জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমায় ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইংরাজী ভাষায় এক খণ্ড পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়াছেন। আমরা ঐ পুস্তিকা পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। গোকুল বাবু লিখিয়াছেন যে অবিদ্যা অর্থে জ্ঞানের অভাব নহে। বিদ্যা যেমন ব্রহ্মে অবস্থান করে, অবিদ্যাও তেমনি। ব্রহ্ম এতদুভয়ের উপরে। অবিদ্যারও শক্তি আছে এবং বিদ্যা ও

অবিদ্যা উভয়ের শক্তি সদা বিরোধমানা। ঐ বিরোধের শান্তি ব্রহ্মে। ঐ উভয় শক্তির বিরোধেই সমুদয় বস্তু পরিদৃশ্যমান হইতেছে। জীবনও ও ঐরূপ প্রকট বিরোধ বটে। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু একীকরণ সংহরণ আত্মবিসর্জ্জন উদ্দেশ্যে কেমন প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে ও প্রত্যেক বস্তু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে। একদিকে যেমন এই বিরোধ অপরদিকে আবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যাবস্থা। এই ভাবেই বিশ্ব প্রবাহ চলিতেছে। নির্গুণ ব্রহ্মেরও গুণ আছে। যৎকর্ত্তৃক সৌন্দর্য্য, কামনা, প্রেম ও মানব হৃদয়ের অন্যান্য গুণাবলী সৃষ্ট হইয়াছে, তদীয় সত্তায় মধ্যে কি ঐ গুণাবলী নাই? তাহা নহে। আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মে মগ্ন হইতে হইলে ঐ গুণাবলীর ঊর্দ্ধে মানবকে উঠিতে হইবে।

ব্রহ্ম একমাত্র সৎস্বরূপ, যদিও তাঁহার বর্ণনা তিনি ইহা নহেন, তিনি উহা নহেন এই ভাবে করা হইয়া থাকে। তিনি অবাঙ্মনসগোচর। কিন্তু সৎস্বরূপ ব্রহ্ম কেন বিশ্ব রূপে প্রকট হইলেন? এই যে প্রকট বিশ্ব, ইহাও ব্রহ্মের স্বরূপের বহির্ভূত নহে। ইহাও তাঁহার একটী স্বরূপ। কিন্তু পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মের অভিব্যক্তির সর্ব্বনিম্নস্তর বটে। সেই মানব সর্ব্বাপেক্ষা সুখী যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির চিরবিসম্বাদের, শান্তি স্থাপন করিয়া ব্রহ্মে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে।

এই বিষয়গুলি কিছু বিস্তার করিয়া তাঁহার পুস্তিকাতে গোকুলবাবু বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টী যেরূপ জটিল তাহাতে অল্প কথায় তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করা দুরূহ। তথাপি তাঁহার এই চেষ্টায় আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। মুদ্রাঙ্কনের জন্য টাইপ করিয়া পুস্তিকা লিখিত বিষয় লাট

মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহা প্রকাশিত করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান রাসনালিষ্টিক সোসাইটীর বুলেটীন নামে একটী পত্রিকা আছে। বর্ত্তমান ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের বেদান্ত সম্বন্ধীয় ফরাসী ভাষায় বক্তৃতার ইংরাজী ভাষান্তর তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতেও ব্রহ্ম ও মায়া সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে বেদান্ত অর্থে জ্ঞানের চরম সীমা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। তিনি নিজকে বিশ্বরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। ব্রহ্মই একমাত্র সৎবস্তু। তাঁহার জ্ঞানই বিস্তায়, দার্শনিকের ভাষা তিনিই সত্য, বিচার দ্বারায় লব্ধ সত্য, কেননা অনন্তকাল হইতে তিনি আছেন।

ব্রহ্মের আপাত প্রকাশকে মায়া অভিহিত করা যায়, প্রকৃত পক্ষে তাহার অস্তিত্ব নাই, কারণ তাহার অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার উপর নির্ভর করে। কোমল বস্তুর জ্ঞান আছে বলিয়াই কঠিন বস্তুর অনুভূতি হয়। বিশ্ব বস্তুর বহির্ভূত ব্রহ্ম পদার্থ নহেন। প্রত্যেক বস্তুই পবিত্র; মনুষ্য হইতে পৃথিবীর সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর জীব পর্য্যন্ত পবিত্র। বৈদান্তিকের মতে জীবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

পক্ষাঘাতের রোগীর অনুভব শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, অন্ধ ব্যক্তি দেখিতে পায় না। যদি সমস্ত ইন্দ্রিয় অসাড় হইয়া যায়, তবে মস্তিষ্কের ক্রিয়াও লুপ্ত হয়। এই প্রকারে অভিভূত ব্যক্তিকে মৃত গণ্য করা হইয়া থাকে। তাহার পক্ষে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না, তাহার পক্ষে উহা মায়া মাত্র।

কিন্তু মায়া ও ভ্রান্তি এক নহে। ইন্দ্রিয় দ্বারায় বস্তুর ধারণাকে মায়া বলা যায়। তাহা অস্থায়ী। অবিদ্যা হইতে মায়ার উৎপত্তি। তাহাতেই চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু সকলকে সত্য বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি ও তাহার তারতম্য করি। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী কোন বস্তুরই পার্থক্য দেখেন না, তিনি বস্তুর মধ্যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। রসায়ণ শাস্ত্রানুসারে চিনি ও কাষ্ঠ খণ্ডের মৌলিক পদার্থ একই। আবার ঐ সকল মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি আদি শক্তি হইতে। মনুষ্য দেহেরও বিশ্লেষণ করিলে ঐ আদি শক্তিই পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি বিশ্বের একত্ব বুঝিয়া থাকেন। ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, নির্ম্মমতা ইত্যাদি মানব জীবনের দুর্দ্দশার একমাত্র কারণই অবিদ্যা।

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে যে ব্যক্তি কেবল বিদ্যার আলোচনায় নিরত, সে সমস্ত জীবন অন্ধকারে থাকে। কারণ এই পৃথিবীতে তাহাকে যে সকল কার্য্য ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে তাহার প্রতি সে উদাসীন থাকে। যদি তাহা করিতে যায় তবে উপনিষদের শিক্ষার বিরুদ্ধে চলিতে হয়। আবার যে ব্যক্তি অবিদ্যায় পূর্ণ, তাহার মানসিক অবস্থাও ঐরূপ এবং সেও সারা জীবন অন্ধকারে বাস করে, কারণ পৃথিবীর সকল দুঃখ কষ্টের একমাত্র উৎসই অবিদ্যা। তজ্জন্য বিদ্যা ও অবিদ্যার সামঞ্জস্য বিধান করা কর্ত্তব্য।

বেদান্তের এই উপদেশে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম আছেন, সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রে যে কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। সমস্ত সাংসারিক বিষয় হইতে সত্য গ্রহণ

করিতে হইবে. আমাদের সমুদয় কার্য্যকে আক্রোশ, ঈর্ষ্যা ও কর্কশ ব্যবহারের অতীত রাখিতে হইবে কারণ সমস্ত বস্তু ব্রহ্মের সত্বায় লীন আছে । তাহা হইলেই সমগ্র মনুষ্য সমাজ যে সকল দুঃখ ভোগ করে তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ হইবে ।

——:0:——

স্থানীয় সংবাদ ।

——:0:——

বিভাগীয় কমিশনার—

শ্রীযুক্ত ডি, এস, লিস বাহাদুর বর্ত্তমান মাসে এথায় আগমন করিয়াছিলেন । ৪ঠা ফাল্গুন মিউনিসিপাল মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রদর্শনে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং ৫ই ফাল্গুন উক্ত বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

মুসলমান ছাত্রাবাসের—

সম্মুখে সামিয়ানা খাটাইয়া ৩রা ফাল্গুন রবিবার বার্ষিক মৌলুদ শরিফ পাঠ এবং বক্তৃতা হইয়াছিল । এবারের প্রাধান বক্তা ছিলেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ সাহুল্লা এম এ, বি এল । ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত ফজলাল হক সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন বলিয়া কথা ছিল, তিনি আসিতে পারেন নাই । কিন্তু মৌলবী সাহুল্লা সাহেব তাঁহার বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ রাখিয়াছিলেন । হিন্দু শাস্ত্রে এরূপ সুপণ্ডিত মুসলমান বক্তা আমরা আর দেখি নাই । ধর্ম্মের সমন্বয় ও সকল ধর্ম্মের সার গ্রহণ

এই বক্তার উদ্দেশ্য। বক্তৃতা প্রভৃতি সুখকর; সর্ব্বথা বিদ্বেষ ভাব বিবর্জ্জিত এবং তাঁহাতে কোনও ধর্ম্মের গ্লানি নাই। মৌলবী সাহেবের নিকট আমাদের অনেক শিখিবার আছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশের কল্যাণ করিতে থাকুন।

ব্রহ্মবিদ্যা—

৮ই ফাল্গুন স্থানীয় নাট্য সমিতির গৃহে বাঁকীপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। এখানে কিছুকাল হইল থিয়সফিকাল সোসাইটীর একটী শাখা সভা খোলা হইয়াছে। তাহারই উৎযোগে রায় বাহাদুরের অত্রত্য রাজধানীতে আগমনোপলক্ষে এই সভা হইয়াছিল। বিহার প্রদেশের লজ গুলি পরিদর্শক (জনৈক মান্দ্রাজী ভদ্রলোক) ও ঐ সময়ে আসিয়াছিলেন। তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে নূতন সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

নাট্যসমিতি গৃহে—

ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺রাধাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের একখানা তৈল চিত্র স্থাপিত হইয়াছে।

শাসন পরিষদের—

সভ্য স্যার হেনরি হুইলার বাহাদুর ১০ই ফাল্গুন সন্ধ্যার ট্রেণে রঙ্গপুর হইতে এখানে পঁহুছিয়া ১১ই ফাল্গুন সকাল বেলা হাসপাতাল ও জেলখানা পরিদর্শন, মধ্যাহ্নে দর্শনদান, অপরাহ্নে রাজবাটীতে চা পান এবং ১২ই ফাল্গুন কাছারী, জেলা স্কুল ও বালিকা স্কুল পরিদর্শনান্তে মধ্য রাত্রির অব্দু গাড়ীতে বগুড়া রওনা হইয়া গিয়াছেন।

পল্লীবার্ত্তা— (প্রেরিত)

কোতয়ালী থানার এলাকাধীন গাড়গাঁও সদরপুর প্রভৃতি গ্রামে স্বাস্থ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামে লোক বসতি যদিও বিরল তথাপি এই মাসখানেকের মধ্যেই ১৩। ১৪ জনের মৃত্যু হইল। জ্বর ও বসন্ত গ্রামের মধ্যে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়াছে। ইহার উপর ইনফ্লুয়েঞ্জাও মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিতে ছাড়িতেছে না। বর্ষার সময়ে যদিও দুই এক বাড়ীতে বসন্ত দেখা যাইত, তথাপি এত প্রকোপ ছিল না। শীতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জ্বরের তেমনি বসন্তেরও প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদঞ্চলের অধিকাংশ লোকেই অশিক্ষিত; ইহাদের "বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না"। ইহারা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সকল কষ্ট সকল দুঃখ জ্বালা অকাতরে সহিয়া থাকে, প্রতীকারের কোন চেষ্টা করে না। গ্রামের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের একান্ত অভাব। গ্রামে দুইটী বিশুদ্ধ পানীয় জলের কূপের জন্য গত বৎসর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে আবেদন করা হইয়াছে, এ পর্য্যন্তও তাহার ফলাফল কি হইল বা হইবে জানিতে পারা যায় নাই। সরকার বাহাদুরের কৃপা দৃষ্টি একান্ত প্রার্থনীয়। এতদঞ্চলে একটীও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের খনিত পানীয় জলের কূপ বা পুষ্করিণী নাই।

বসন্তের প্রকোপ যেমন বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং তজ্জন্য যেমন মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আর অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা যায় না গ্রামের লোকেরা ওঝা, বৈদ্য এবং অদৃষ্টের উপর একান্ত নির্ভরশীল, আমরা সবিনয়ে সরকার বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করি যেন এ অঞ্চলে সত্বর একজন টিকাদার প্রেরণ করা হয়।

সভা—

বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার দিনাজপুর ইনষ্টীটিউট গৃহে দিনাজপুর জেলার অনুন্নত হিন্দু জাতীয় লোকের উন্নতি কল্পে একটী সভা হইয়াছিল। তাহাতে এই সহরের অনেকগুলি ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় উকিল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

১ম নির্দ্ধারণ—ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠা বিধান জন্য দিনাজপুরে "ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠা বিধায়িনী সভা, দিনাজপুর" এই নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক।

২য় নির্দ্ধারণ—এই সভার সভ্যগণ প্রত্যেকেই নিম্নলিখিত মূল সূত্র (Creed) গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।

১। সমস্ত হিন্দুই এক।

২। পরস্পরের মধ্যে ইতর ও পৃথক জ্ঞান হিন্দু জাতির অবনতির কারণ।

৩। হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষা সার্ব্বজনীন প্রেম ও উদারতা। নরমাত্রই নারায়ণের অংশ।

৪। হিন্দুজাতীর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লোপ না করিয়া সার্ব্বজনীন একত্ব সম্পাদন।

৫। ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতির রক্ষার এক মাত্র উপায়—আত্ম নির্ভরতা ও আত্মশক্তি জাগরণ ও পরস্পরের সহানুভূতি ও সহকারিতা।

৩য় নির্দ্ধারণ—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাঁহারা উপরোক্ত মূল সূত্র (Creed) গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারাই এই সমিতির প্রথম সভ্য বলিয়া গণ্য হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গভর্ণমেন্ট উকিল।
২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, উকিল।
৩। ,, মাধবচন্দ্র শিকদার উকিল।
৪। ,, অবিনাশচরণ সেন উকিল।
৫। ,, কেদারনাথ সেন জমিদার।
৬। ,, কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার।
৭। ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মার্চেন্ট।
৮। ,, দুর্গাকমল সেন অবসর প্রাপ্ত সবরেজিষ্ট্রার।
৯। ,, নিকুঞ্জবিহারী ধর হেড্‌ক্লার্ক মিউনিসিপাল অফিস।
১০। ,, মহেন্দ্রনাথ সেন শিক্ষক দিনাজপুর জেলা স্কুল।
১১। ,, সুরেন্দ্রকুমার সেন উকিল।
১২। ,, অশ্বিনীকুমার লাহিড়ী নিয়োগী ক্লার্ক সিভিল কোর্ট।
১৩। ,, যামিনীকান্ত ঘোষ ডাক্তার।
১৪। ,, সতীশচন্দ্র রায় উকিল।
১৫। ,, তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী ডাক্তার।
১৬। ,, যোগেশচন্দ্র সেন উকিল।
১৭। ,, [illegible]চন্দ্র সেন উকিল।

১৯। ,, বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন উকিল।
২০। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ খাসনবিশ উকিল।
২১। ,, যতীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ উকিল।
২২। ,, সারদাচন্দ্র কাব্যতীর্থ হেডপণ্ডিত জেলাস্কুল।
২৩। ,, রামচন্দ্র সেন উকিল।
২৪। ,, শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকিল।
২৫। ,, মতিলাল সরকার উকিল।
২৬। ,, নীরদবন্ধু রায় উকিল।
২৭। ,, নরেন্দ্রকুমার সরকার উকিল।
২৮। ,, যাদবলাল রায় উকিল।
২৯। ,, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উকিল।
৩০। ,, নরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত উকিল।
৩১। ,, সত্যচরণ গুহ উকিল।
৩২। ,, সুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত উকিল।
৩৩। ,, ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত উকিল।
৩৪। ,, নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল।
৩৫। ,, সুরেশচন্দ্র সেন উকিল।
৩৬। ,, রমেশচন্দ্র গুপ্ত উকিল।
৩৭। ,, দিগিন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সহকারী ম্যানেজার ছোটকুঠী।
৩৮। ,, প্রফুল্লচন্দ্র সেন এজেণ্ট জীবনবীমা কোং।
৩৯। ,, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত উকিল।
৪০। ,, সুরেশ্বর সেন মুন্সী, হেডমাষ্টার হাইস্কুল।
৪১। ,, জীবিতনাথ দাস মোক্তার।
৪২। ,, হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, জমিদার।
৪৩। ,, যামিনীকান্ত সেন গুপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার।
৪৪। ,, পণ্ডিত ভুবনমোহন কর।

৪র্থ নির্দ্ধারণ—আপাততঃ তিন মাসের জন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়গণ উক্ত সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

৫ম নির্দ্ধারণ—এই সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার ও কার্য্য পরিচালন জন্য একটী তহবিল (Fund) সংস্থাপন করা হউক। এই সমিতির সম্পাদকদ্বয় এই তহবিলের অর্থ সংগ্রহ করিবেন।

৬ষ্ঠ নির্দ্ধারণ—উক্ত তহবিলের অর্থ হইতে এই সমিতির মূল সূত্র ও উদ্দেশ্য মুদ্রিত ও বিতরণ করা হইবে।

৭ম নির্দ্ধারণ—অনুন্নত হিন্দু জাতিয় লোকের শিক্ষার জন্য এই সহরে একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হউক। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ সেন ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়গণের উপর এই বিদ্যালয়ের কার্য্যভার ন্যস্ত করা হউক।

৮ম নির্দ্ধারণ—এই সমিতির সভ্যগণকে লইয়া প্রতি বাঙ্গলা মাসে একটী করিয়া অধিবেশন হইবে।

দিনাজপুর পত্রিকা।

(মাসিক)

সপ্তবিংশতি ভাগ } চৈত্র, ১৩২৬। } ১০ সংখ্যা।

মিলন।

—:0:—

চপলা ও সরলা পুতুলের বিয়ে লইয়া বড়ই ঝগড়া বড়ই বাদানুবাদ আরম্ভ করিয়াছে। চপলার ইচ্ছা তার মেয়ের বিয়ে আজই হয়, মেয়ে বড় হইয়াছে, আর রাখা যায় না; সরলা ছেলের বিয়ে আজ কোন মতেই দিতে পারিবে না, সে বিয়ের কোন যোগাড়ই এ পর্যান্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই, তা'র ছেলের বিয়ে না দিবার প্রধান কারণ এই যে, সে যে সমস্ত অলঙ্কার, দান সামগ্রী চাহিয়াছিল চপলা তা কিছুই লইয়া আসে নাই, তাই সরলা তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর করিল "না ভাই ছেলের বিয়ে এখন দেওয়া হ'বে না"। গাল ফুলাইয়া ক্ষুন্নমনে বক বক করিতে করিতে চপলা আদরের মেয়েটী লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যায় দেখিয়া, ঝগড় বিবাদ মীমাংসা হইয়া গেল, দুই সখীতে মহা উৎসাহে বিয়ের কাজে ব্যস্ত হইল। নানাপ্রকার মূল্যবান অলঙ্কারে,

রং বেরঙের পোষাকে বর ক'নে মনোমত সাজান হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে চাটুর্য্যে মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে যে কিছু ইট ছিল প্রায় সমস্তই ভিতরে আনিয়া রান্না ঘর, বাসর ঘর, আত্মীয় কুটুম্বগণের শোবার ঘর প্রস্তুত হইয়া নিকান পোছান সমাধা হইয়া গেল। রাস্তা হইতে, আঙ্গিনা হইতে, জঙ্গল হইতে স্তূপে স্তূপে আহার্য্য পদার্থ সংগৃহীত হইয়া রান্না বান্না সম্পন্ন হইয়া গেল। বারেন্দার খুঁটা, সুপারী গাছ, তুলসী গাছ, মরিচ গাছ প্রভৃতি আত্মীয় কুটুম্ব ও নিমন্ত্রিতবর্গ দণ্ডায়মান। চাটুর্য্যে গৃহিণীর সযত্নে রোপিত ছোট লাউ গাছ ও বেগুন গাছের প্রায় সমস্ত পাতাগুলি আনিয়া, মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আত্মীয় কুটুম্ব ও নিমন্ত্রিত লোকদের সম্মুখে পাতাগুলি রাখিয়া নানাপ্রকার চাব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি উপাদেয় আহার্য্য সমূহ পরিবেশন করিল। বৈকালে বিশ্রামান্তে চাটুর্য্যে গৃহিণী ঘরের বাহির হইয়াই আঙ্গিনাটীর দুরবস্থা এবং সাধের লাউ ও বেগুন গাছের দুর্দ্দশা দেখিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া তাড়া করিলেন, চপলা দৌড়িয়া বাড়ী চলিয়া গেল, সরলা ধরা পড়িয়া গেল। তাহার উচ্চ ক্রন্দনে চপলা বাড়ীতে আর স্থির থাকিতে পারিল না, চোরের ন্যায় চাটুর্য্যে গৃহিণীর সম্মুখে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এ দৃশ্যে চাটুর্য্যে গৃহিণীর রাগ জল হইয়া গেল উভয়কে শান্তনা করিয়া নিজ সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু বিয়ে আর হইল না, সন্ধ্যাকালে চপলা "যাই ভাই সন্ধ্যা বয়ে গেল মা বকবেন" বলিয়া চলিয়া গেল। এইরূপ প্রতিদিন দুই সখীতে মেশা মিশি মাথা মাখি করিয়া একত্রে তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত সাধ মিটায়। দুইজনে ঝগড়া মারামারি করিয়া সময় সময় দেখা শুনা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেয় আবার পরস্পর পরস্পরকে না

দেখিলেও মুহূর্ত্তকাল থাকিতে পারে না। একজনের দুঃখে অপরের চক্ষে জল আইসে একজনের সুখে অপরে আনন্দে আটখানা হয়।

সংবাদ আসিল চাটুর্য্যে মহাশয় স্থানান্তরে বদলী হইলেন। তিনি এ স্থানের সম্পর্ক একবারেই মিটাইয়া যাইতেছেন। সংসারের অনাবশ্যকীয় এবং অতিরিক্ত জিনিস বিক্রয় করা এবং আবশ্যকীয় জিনিস সমুহ প্যাক করার ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। বিচ্ছেদ আশঙ্কায় দুই সখী বড়ই ম্রিয়মাণ, বড়ই শঙ্কিত, কেহই আর ছাড়াছাড়ি হয় না। নির্দ্দিষ্ট দিনে অনেক কান্দাকাটীর পর উভয়ে চিঠি পত্র লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সরলা পিতা মাতার সহিত শুভ মুহূর্ত্তে যাত্রা করিল। যতদূর দেখা যায় চপলা এক দৃষ্টে সজল নয়নে সরলার গো-শকটখানির পানে চাহিয়া থাকিল, গাড়ীখানি অদৃশ্য হইয়া গেলে চপলা প্রাণে একটা অসহ্য যাতনা লইয়া বাড়ী ফিরিল। তাহার আর সে স্ফুর্ত্তি নাই, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি একবারেই খালি হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বদাই বিষণ্ণ।

কিছুদিন পর সরলার একখানা পত্র আসিল, চপলার আনন্দ দেখে কে, সরলা খুব বড় অক্ষরের পর ক্ষুদ্র একটী অক্ষর, অতি ক্ষুদ্র অক্ষরের পর বড় একটী অক্ষর, অনেক স্থানে এক অক্ষর কাটিয়া অপর এক অক্ষর তাহা মুছিয়া অন্য আর এক অক্ষর লিখিয়া ২০।৩০টী শব্দে নূতন ভাষায় মসিরঞ্জিত কাগজে ৪পৃষ্ঠা ভরিয়া পত্রখানি লিখিয়াছে চপলাও ঐ রকম অক্ষরে ঐ ভাষায় তাহার পত্রখানির উত্তর দিল। এই রকম চিঠী পত্রের স্রোত কিছুদিন খুব প্রবল বেগেই বহিতে থাকিল। কত নূতন ভাষা কত নূতন কবিতা পত্রের মধ্যে সংযোজিত হইতে থাকিল! উভয়ে এখন লিখা পড়া শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়া পড়াশুনায় মন দিয়াছে, দিবা রাত্রি কেবল চিঠিরই

সদাসর্বদা কবিতার চিন্তা লইয়া উভয়ে ব্যস্ত. কিন্তু এ উৎসাহ আর বেশী দিন থাকিল না, পত্র লিখার স্রোত ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিল, পরিণামে পত্র লিখা উভয়েরই বন্ধ হইয়া গেল, আর কাহারো খোঁজ খবর কেহ করে নাই, চঞ্চল মনের গতি ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে।

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অনেক শিষ্য অনেক যজমান, অবস্থাও বেশ সচ্ছল, সন্মানেও বেশ প্রতিপত্তি। সংসারে গৃহিণী এবং ৮ বৎসরের কন্যা চপলা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা কোন সৎ ব্রাহ্মণের একটী পুত্র পাইলে গৌরীদানের ফললাভ করিয়া স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখেন। অনেক চেষ্টায় প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে উপযুক্ত ও মনেরমত বর জুটিয়া গেল। উভয়ের কোষ্ঠীর ফল রাজ যোটক মিল আছে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর গৌরীদানের ফললাভের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আর কাল বিলম্ব না করিয়া পঞ্জিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিনে এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লগ্নে গৌরীদান করিয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়া লইলেন এবং পিতৃ পুরুষগণের অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। তিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও বুঝিলেন না, যে মানবের কর্ম্মে অধিকার আছে কিন্তু কর্ম্মফল লাভ মানবের অধিকার নাই, তাহা অপর একজনের হাতে, যে খানে মানবের বুদ্ধিতে কিছুই কুলাইয়া উঠে না, তাই মানব এক ভাবিয়া কার্য্য করে, ফল হয় অন্য রকম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতৃ পুরুষগণের অক্ষয় স্বর্গবাস হইয়াছিল কি না জানি না কিন্তু এক বৎসর গত হইতে না হইতেই প্রিয়তমা কন্যার হাতের শাঁখা খসিয়া গেল। চপলা বুঝিল না যে তাহার কি সর্ব্বনাশ ঘটিল, সে যেমন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল সেই রকমই ছুটাছুটী করিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া

দিন কাটাইতে থাকিল, সে কেবল দেখিল তাহার কাল যাহা ছিল আজ তাহা নাই, শাড়ী ফেলিয়া থানের কাপড় পরান হইয়াছে, সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলান হইয়াছে। ২।১ খানা অলঙ্কারের জন্য বড়ই আব্দার অনেক কান্নাকাটি করিয়াছে, মাতা হাহাকার শব্দে কাঁদিয়া অচৈতন্য হইয়া যাইতেন, ইহার কারণ সে খুঁজিয়া পায় নাই; মায়ের কান্না দেখিয়া সেও কাঁদিয়া আকুল হয় আর অলঙ্কার চায় না, শাড়ী, অলঙ্কারের কথা বিস্মরণ হইয়া যায়।

আজ একাদশী। কন্যার জন্য সকলেই একাদশী ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত দিনটি ভট্টাচার্য্য গৃহিণী কোন মতে কন্যাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন কিন্তু আর পারিলেন না, সন্ধ্যাকালে চপলা ক্ষুধা তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া বিছানায় এলাইয়া পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল, প্রাণ কণ্ঠাগত. থাকিয়া থাকিয়া এক একবার অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতেছে জল—একটু জল—প্রাণ যায়—বাবা গো—একটু জল,—মা, তোমার পায় পড়ি একটু জল দিয়া প্রাণ বাঁচাও; মাতা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঘরের এক কোণে পড়িয়া আছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাঁহার বাড়ীতে কি শাস্ত্রের অনিয়ম হইতে পারে? তিনি অতি সতর্ক দৃষ্টিতে শাস্ত্রের বচন রক্ষা করিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিতেছেন, নানাপ্রকার বাক্য বিন্যাসে কন্যাকে শান্ত্বনা করিতেছেন, গৃহিণীর কাকুতি মিনতি করুণ ক্রন্দন তাঁহার নিকট জল স্রোতের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে, কোন দিকে তাঁর লক্ষ্য নাই, কেবল হিন্দুর নিষেধ শাস্ত্রই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য, ইহাই প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত, আজ তাঁহার পিতৃ হৃদয় অসুর হৃদয়ে পরিণত হইয়াছে, আজ তিনি হৃদয় হইতে স্নেহ মমতা দূরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যই তাঁহার হৃদয়খানি জুড়িয়া বসিয়া আছে। স্বামীর অনানুষিক

পৈশাচিক ব্যবহারে গৃহিণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—হা ভগবান বলিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন।

হায় হিন্দু মা! তোমাকে এ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেই হইবে যে হেতু তুমি হিন্দু মা, এ ভীষণ দৃশ্য তোমাকে চক্ষে দেখিতেই হইবে যে হেতু তুমি হিন্দু মা, তোমার উপর সমাজের ও শাস্ত্রের এই অমানুষিক ও পৈশাচিক অত্যাচার তোমার সহ্য করিতেই হইবে যে হেতু তুমি হিন্দু মা, তোমার হৃদয়-খানি ফাটিয়া ছিন্ন হইয়া যাউক, তোমার চক্ষের জলে নদী বহিয়া যাউক, তোমার উচ্চ করুণ ক্রন্দনে হিমালয় দ্রব হইয়া যাউক, তোমার দুঃখে আজ সমাজ নীরব, শাস্ত্র ঘোর প্রতিদ্বন্দী, কাঁদিতেই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ—কাঁদিয়াই তোমার শান্তি, এক ভগবানের শান্তিময় ক্রোড় ব্যতীত তোমার শান্তির অন্য উপায় নাই—যে হেতু তুমি হিন্দু মা।

হায় ব্রাহ্মণ! তোমার এ দৃশ্য দেখিয়া কি চিন্তা করার একটুও অবসর নাই? তোমার পাষাণ হৃদয় কি একটুও বিচলিত হয় না? তোমরা শাস্ত্রের অভিনয় করিয়া নিরাশ্রয়া বাল বিধবার প্রতি এই ভীষণ অত্যাচার করিয়া বড়ই তৃপ্ত পাও—বড় গর্ব্ব অনুভব কর, তোমরা একবার অন্যের দোষ অনুসন্ধান না করিয়া নিজের দিকে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া দেখ তোমরা কি ছিলে আজ কি হইয়াছ, এবং তোমার পরিণাম কি। তোমার যে সমস্ত গুণে হিন্দু মাত্রেই জাতি নির্ব্বিশেষে তোমার পদানত ছিল, যে স্বভাব গুণে সম্রাট হইতে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত তোমায় পূজা করিত, তোমার সে স্বভাব সে গুণ এখন কোথায়? তুমি নির্লোভী, নিরহঙ্কারী, নিষ্কামী, অক্রোধী, উদার, সরল, ক্ষমাবান, সর্ব্বভূতে তোমার সমান দয়া, ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস,

জপতপ পরায়ণ তোমার স্বভাব, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম তোমার অঙ্গের প্রধান ভূষণ, আজ তোমার সে গুণ সে লক্ষণ সে স্বভাব কোথায় ? আজ তুমি স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী, ক্রুর, লোভী, ক্রোধী, ঘোর পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর এবং উৎশৃঙ্খল, তাই তুমি এখন উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত, আজ তোমার শত অপরাধে সমাজ নিদ্রিত, শাস্ত্র স্তব্ধ। তোমাকে শাসন করিবার কেহই নাই, কারণ শাস্ত্র তোমার হাতে, তাই অপরের উপর বিশেষতঃ নিরাশ্রয়া, উপেক্ষিতা বাল বিধবার উপর তোমার এত প্রখর দৃষ্টি।

অতি কষ্টে এই ভীষণ রাত্রি কোন মতে কাটিয়া গেল, দুঃখের রাত্রি দীর্ঘ হইলেও কোন মতে কাটিয়া যায়, সুখ দুঃখের জন্য সময় কাহারো অপেক্ষা করে না, সময়ের কার্য্য এক ভাবেই চলিতে থাকে, তবে মানবের মনের সুখ দুঃখে সময় হ্রস্ব দীর্ঘ বলিয়া অনুমান হয় মাত্র! প্রভাতে দেখা গেল, চপলা অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় মৃতবৎ পড়িয়া আছে, সময় সময় প্রলাপ বকিতেছে, চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ, গাত্র অগ্নিবৎ উত্তপ্ত। যথা নিয়মে চপলার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিতে থাকিল, অষ্টম দিবসে জ্বর ত্যাগ পাইল, ক্রমে চপলা সুস্থ হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর শাস্ত্র শাসন বা সমাজ শাসন মানিয়া চলিতে সাহসী হইলেন না ; তাঁহার মন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত, তাঁহার একমাত্র কন্যার অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া সহানুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি চপলার ভবিষ্যৎ জীবন উপযুক্ত ভাবে গঠিত করার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার পর আবশ্যকীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, চপলা গ্রন্থের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া লয়, গ্রন্থের উপদেশ মত চপলার জীবনও ক্রমে গঠিত হইতে

আরম্ভ হইল, এখন আর বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের জন্য কোন শাসন আবশ্যক হইল না। বুদ্ধি হইলে আপনা হইতেই সমস্ত শিক্ষা হয় তখন আর ভিন্ন শাসনের আবশ্যক হয় না।

আজ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা এবং পরম সুহৃদ কালীচরণ রায় মহাশয়ের একখানি পত্র পাইলেন, তাঁহার একমাত্র পুত্র শরতের বিবাহে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সপরিবারে যাইতে লিখিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য গৃহিণী কোন মতেই যাইতে স্বীকৃত নন, তিনি আর এ মুখ লোক সমাজে দেখাইবেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, যাইতে হইলে চপলাকে রাখিয়া যাইবারও উপায় নাই, সঙ্গে লইয়া এ দৃশ্য দেখানও প্রাণে সহিবে না সুতরাং নানাপ্রকার ওজর আপত্তি করিয়া পত্রের উত্তর দিলেন। চার দিন পর রায় মহাশয় স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, চপলাকে দেখিয়াই তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল, বুঝিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যাইবার আপত্তির মূল কারণ কোথায়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এবং গৃহিণীর আর কোন আপত্তিই খাটিল না তাঁহাদের সমস্ত আপত্তি স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। রায় মহাশয় যথা সময়ে সকলকে লইয়া মনের আনন্দে বাড়ী আসিলেন। বিয়ের বাড়ীতে অলক্ষণের দৃশ্য লইয়া আইসায় রায় গৃহিণীর শরীরে বৃশ্চিক দংশন আরম্ভ হইল কিন্তু মুখে কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। বিয়ের বাড়ীতে চপলার উৎসাহ বড়ই বাড়িয়া গেল, সকল কাজেই সে অগ্রগামিনী প্রতি কাজেই সে রায় গৃহিণীর নিকট বাধা পাইতে লাগিল, বিয়ের জিনিসে বিধবার হাত দিতে নাই, অকল্যাণ হইবে। চপলা নিজের অবস্থা বুঝিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইল, তা'র প্রাণে অদম্য উৎসাহ, সম্মুখে প্রবল বাধা, এও কি প্রাণে সয়? সমাগত

আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই অনন্ত স্ফূর্ত্তি অদম্য উৎসাহ লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পরস্পরের কার্য্যের কত সমালোচনায়, কত উপদেশ কত হাস্য পরিহাসে উন্মত্ত, চপলার মুখে আর বাক্য নাই প্রাণে স্ফূর্ত্তি নাই, উৎসাহ নাই, নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া সে মনের সমস্ত উৎসাহ সমস্ত স্ফূর্ত্তি দমন করিয়াছে।

কাল বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আজ বর ক'নে বাড়ী আসিবে। বাড়ীর সকলেই আনন্দে উৎসাহে মাতিয়া গিয়াছে, ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র হৈ চৈ ব্যাপার, কাহারো বিশ্রামের সময় নাই, সাময়িক আবশ্যকীয় কাজ কর্ম্ম যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার জন্য সকলেই ব্যস্ত। সন্ধ্যা হইতে সকলে মহা-উৎসাহে বর কন্যার আগমন অপেক্ষায় উদগ্রীব হইয়া আছে। যথাসময়ে বর ক'নে আসিয়া পিঁড়ির উপর দণ্ডায়মান হইলেন, সকলেই বৌ দেখার জন্য ব্যস্ত। চপলা বৌ দেখার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, ধীরে ধীরে বর ক'নের সম্মুখীন হইল, বৌ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সে স্তব্ধ হইয়া স্থির দৃষ্টে বৌ দেখিতে লাগিল, নিজ দুরবস্থা ভুলিয়া গিয়াছে, আপন ভুলিয়া গিয়াছে রায় গৃহিণীর প্রবল বাধা ভুলিয়া গিয়াছে, কোন বাধাই আর তা'র মনের বেগ দমন করিতে পারিল না, দৌড়িয়া গিয়া নববধূকে দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। এ যে তার প্রাণের সখী সরলা। নববধূও চপলার মুখখানি দেখিয়া তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। অনেক দিন পর আজ দুইটী হৃদয় আবার এক হইয়া গেল। রায় গৃহিণীর চক্ষু মদন ভস্ম কালীন মহাদেবের চক্ষুর ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, ভট্টাচার্য্য গৃহিণীর একটী গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস আকাশে মিলাইয়া গেল।

মহারাজ গিরিজানাথ।

—:0:—

ধন্য জন্ম লভেছিলা, হে দানেন্দ্র দিনাজপুরীর,
শুভক্ষণে। শ্রীকান্তের শ্রীচরণে নশ্বর শরীর
উৎসর্গিলে,—পূর্ণাহুতি পূত হোমানলে করমের ;
রাখিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তি আত্ত মর্ত্ত্যধামে, ত্রিদিবের
দিব্য সিংহাসনে লভিছ বিরাম, রোগ-শোক-জরা
অতিক্রমি'।

তোমা সম কেবা ভাগ্যবান ? দীনা ধরা
কাঁদে অনাথিনী প্রায়, প্রজাপুঞ্জ করে হাহাকার,
রাজলক্ষ্মী আভরণ হীনা, কার্ত্তিকেয় প্রতিম কুমার
মুহ্যমান নিদারুণ শোকে, সমীরণ শ্বসিছে সঘনে
দুখবার্ত্তা তার দিশি দিশি, বিকচ কমল-বনে
নাহি গুঞ্জে মত্ত মধুকর, পিক-বধূ-মূক সম—
ডাকে না দয়িতে, বিরহের এ বেদনা নিরমম
বেজেছে তটিনী-বুকে শেলের মতন,—সাঙ্গ তার
কল-গান,—আঁকি বাঁকি কূলে কূলে নৃত্য বারবার
না করিছে আর।

প্রতিক্ষণে কত আসে, চলে যায়
কত শত জীব,—অনন্ত সাগর-বক্ষে উর্ম্মিমালা প্রায়,
ঝরে পড়ে অযুত কুসুম,—কেবা তার পরিমাণ
করে ? সংসারে জীবের মেলা,—লভি জন্ম, ত্যজে প্রাণ,
জলবিম্ব জলেতে মিলায়,—কে করে গণনা তার ?
তবে পড়ে যবে দিক্‌পাল,—সহিতে না পারি ভার

বসুন্ধরা কেঁপে উঠে, কক্ষে-কক্ষে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল
নিষ্প্রভ উল্কার মত শূন্যে ছোটে, অচল—অটল
দেব-দেহ,—শক্তিহীন শিশুসম—শিহরে সঘনে।
কহ দেব, কোন গুরু মহাপাপে এ দীন ব্রাহ্মণে
দীনতম করিলে ধরায়? সখা বলি সম্ভাষিলে
যবে,—মানিলাম মনে, রঘুমণি গুহক চণ্ডালে
দিল কোল।

তোমার মধুর বাণী এখনও বাজিছে
কর্ণে মোর স্বরগ-সঙ্গীত সম। সকলি গিয়াছে
আজ,—তবে স্মৃতি কেন রেখে গেলে, বিরহ-দহনে
জ্বালাইতে রোগে—শোকে জর্জ্জরিত-দীন-হীন জনে?
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ রবে ঘেরি, জগদীশ নাথ
তোমার জীবন-পথে, দিবা নিশা ঈশ পদে প্রণিপাত
করি, ভিক্ষা মাগে ভিখারী ব্রাহ্মণ। পিতার পদাঙ্ক
স্মরি, হও আগুয়ান কর্ত্তব্যের ব্রতে নির্ব্বিশঙ্ক।
প্রজাপুঞ্জে পাল নিত্য সন্তানের প্রায়, শ্রীকান্ত চরণে
রাখি' মতি,—রোগে-শোকে আর্ত্ত দীন নর-নারায়ণে
কর সেবা,—যেমতি পণ্ডিত-ঋষি রাজ্য-প্রান্তে তব
নিত্য করে।

লভ শান্তি, পুত্র-পৌত্র, বিভব—গৌরব।
সংসারের শত সুখ প্রতিক্ষণ ভুঞ্জি ইহকালে,
পাইবে—পরম-পদ শ্রীকান্তের শ্রীচরণ-তলে;

—:০:—

জল্পেশ্বর দর্শন ।

——:0:——

জল্পেশ্বর যাত্রা । বি, ডি, রেলওয়ের ভোটপাটী ষ্টেশন হইতে তিন মাইল উত্তর জল্পেশ্বর । বৈদ্যনাথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতির ন্যায় ইহা একটি তীর্থ স্থান । হাঁটিয়া বা গরুর গাড়ীতে যাইতে হয় । শিবরাত্রি উপলক্ষে এ স্থানে বহু যাত্রী সমাগম হয় এবং এক মাস কাল ব্যাপী বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে ।

কর্ম্ম শ্রান্ত দেহ মনকে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্রাম দেওয়া এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্ম সঞ্চয় বাসনায় শিবরাত্রি উপলক্ষে জল্পেশ্বর যাওয়া পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলাম । তদনুসারে আমি ১৩২৫ সালের ১২ই ফাল্গুন সিরাজগঞ্জ হইতে রওনা হইয়া সান্তাহার শিলং মেল ধরিয়া ভোর ৪টার লালমণিরহাট ও তথা হইতে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া প্রাতে ৬৷৷টায় বি, ডি, আর এর ট্রেণে বেলা ১১টার ভোটপাটীর পরবর্ত্তী বার্ণেশ জংশন পঁহুছিলাম । বার্ণেশে কার্য্যোপলক্ষে আমার পুত্র বাস করে । ১৩ই ফাল্গুন শিবরাত্রি ছিল, কিন্তু রেলওয়ের দীর্ঘ পথ অতিবাহন জনিত শ্রান্তি অপনোদন করিয়া লইবার জন্য পূর্ব্বেই রওনা হইয়াছিলাম । তিন দিন বিশ্রাম করিয়া ১৬ই ফাল্গুন বেলা ১১টার সময় দুইটি ভদ্রলোক, কয়েকটি স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা যাত্রীসহ দুই খানি গরুর গাড়ীতে জল্পেশ্বর রওনা হইলাম । বার্ণেশ হইতে জল্পেশ্বর ৭ মাইল । রাস্তা মেটে হইলেও মন্দ নয়, কিন্তু ধূলি ও রৌদ্রে বিশেষতঃ গাড়ীতে লোক সংখ্যা অধিক হওয়ায় কিছু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল । রাস্তার উভয় পার্শ্বে হরিৎ ধান্য ক্ষেত্র, প্রস্ফুটিত ফুল ও ফল সমন্বিত বন, কোথায়ও বা ক্ষুদ্র পল্লী প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া গেলাম । ক্রমে

বেলা ৩টার সময় ময়নাগুড়ি নামক স্থানে পঁহুছিলাম। এ স্থানে পুলিশ ষ্টেশন, গবর্ণমেন্টের তহশীল কাছারী, পোষ্টাফিস, ডাক বাঙ্গালা ও হাট বাজার আছে। নদীর ধারে স্থানটী মন্দ নয়।

তথা হইতে এক মাইল গিয়া একটি পার্ব্বত্য নদী পার হওয়া গেল। নদীতে জল অল্প হইলেও অত্যন্ত স্রোত। নদী পার হইয়া আমি হাঁটিয়া চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই মেলার স্থল দেখা যাইতে লাগিল এবং মুহুর্মুহুঃ বোম বোম ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। উপবাসে ও রাস্তার ক্লেশে শরীর অবসন্ন থাকিলেও বোম বোম ধ্বনি শুনিয়া মহাদেব দর্শন আশায় মনে মহা স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল। অনতি বিলম্বে মন্দির দৃষ্টি পথে পতিত হইবা মাত্র আমরা আনন্দে বোম বোম হর হর ধ্বনি করিয়া উঠিলাম এবং করযোড়ে মহাদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম।

আশাভঙ্গ। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মন্দিরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলাম। সে স্থান হইতে মন্দির পর্য্যন্ত শত শত গাড়ী রহিয়াছে, আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই দেখিয়া গাড়ী তথায় রাখা হইল। আমাদিগের সঙ্গে এক বৃদ্ধা ঠাকুরাণী ছিলেন; তাঁহার একজন আত্মীয় ঐ স্থানে আমাদিগের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল, এবং গাড়ী মন্দিরের অতি নিকট রাখিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা আর পারা গেল না। বৃদ্ধা ঠাকুরাণী প্রতি বৎসর শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে আসিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার অভিজ্ঞতার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইয়াছিল। সহযাত্রী ভদ্রলোক দুইটিকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরাণী তাঁহার আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মন্দিরে গেলেন। অন্ধকার রাত্রি হইলেও মন্দিরের চারি পাশে

কেরোসিন গ্যাস জালিয়া দিবালোকের ন্যায় করিয়াছে। শত শত দলে সঙ্কীর্ত্তন ও মুহুর্মুহুঃ ব্যোম ব্যোম ধ্বনি হইতেছে; অসংখ্য লোকের জনতা। এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া ভয় ও ভক্তিতে হৃদয় অভিভূত হইয়া উঠিল। মনে হইল, বাঙ্গলার উত্তর প্রান্তে হিমালয়ের সন্নিকট অরণ্য মধ্যে এতদিন মহাদেব যেন ধ্যান মগ্ন ছিলেন; আজ তাঁহার ভক্তগণ দর্শন আশায় আগমন করাতে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই এত আনন্দ উচ্ছ্বাস, আনন্দময়ের পুরীতে নিরানন্দের লেশ মাত্রও নাই। অবাক হইয়া এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় ঠাকুরাণী ফিরিয়া আসিলেন; শুনিলাম তাঁহার আত্মীয়ের সহিত দেখা হয় নাই। এ লোকসমুদ্রের মধ্যে বিশেষতঃ রাত্রিকালে একটি লোক খুঁজিয়া বাহির করা কখনই সম্ভবপর যে নহে, পূর্ব্বেই তাহা মনে করিয়াছিলাম। সুতরাং আমরা এ সংবাদে মাত্রও নিরুৎসাহ না হইয়া সকলে মহাদেব দর্শন জন্য চলিলাম। কিছুদূর গিয়া মন্দিরের দ্বার হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত লোকের জনতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এই লোকসমুদ্র পার হইয়া দর্শন করা কি সম্ভব? সঙ্গে বালক বালিকাগণও আছে। বিশ্বাস ভক্তি স্ত্রী জাতির সাধারণ সম্পত্তি। তাঁহারা বলিলেন "বাবার কৃপা থাকিলে নিশ্চয় যাইতে পারিব।" তখন আমার লুপ্তপ্রায় সাহস ফিরিয়া আসিল, "জয় জয় মহাদেব" শব্দে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদিগের যাইতে কোনই বাধা পাইতে হইল না। মন্দিরের দ্বারে একটি করিয়া যাত্রীকে এক আনা দর্শনী লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে, আমরাও দর্শনী দিয়া প্রবেশ করিলাম।

মহাদেব দর্শন। মন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে মহাদেব আছেন। তাঁহার

চারিদিকে চক মিলান দালান, বাহিরের দিকে বারান্দা, ভিতর হইতে দালানে যাইবার পথ নাই। মহাদেব এক গর্ত্তের ভিতর আছেন, হাতের অর্দ্ধেক প্রবেশ করাইয়া মহাদেবের মস্তক স্পর্শ করিতে হয়। ঐ গর্ত্ত ও তাহার চতুস্পার্শ্ব উৎকৃষ্ট মারবল প্রস্তরে বাধান। ভিতরে যাত্রী সংখ্যা কম থাকায় আমরা দীর্ঘ সময় অবস্থান করিয়া পূজা ও দর্শনাদি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পরে অন্য দ্বারের নিকট ভৈরব দর্শন করিয়া বাহিরে আসিলাম এবং অন্য একটি মন্দিরে দ্বার দেবতার লিঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। তথা হইতে পূর্ব্বমুখে কিছুদূর গিয়া শক্তিপীঠ দর্শন করা গেল। লোকে শক্তিপীঠ বলিলেও প্রকৃত পক্ষে নৃসিংহ মূর্ত্তি। এই স্থানে বলিদান হয়, কিন্তু পাঁঠা বলির নিয়ম নাই, খাশী ও পায়রা বলি হইয়া থাকে। নিয়মটি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। এই স্থানের চারিদিকে দুধ, গঙ্গাজল, ফলমূল, চিড়াগুড়, মিঠাই ইত্যাদি বিক্রয় হইতেছে। আমরা বালক বালিকাদিগের জন্য কিছু খাদ্য দ্রব্য কিনিয়া গাড়ীতে ফিরিলাম।

রাত্রি যাপন। একে পাহাড়িয়া দেশ উন্মুক্ত আকাশ তলে মাঠের মধ্যে শীতের রাত্রি, তাহাতে উপবাস ক্লিষ্ট শ্রান্ত দেহ. শীতে হাত পা আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছে, তারপর দীর্ঘ রাত্রি শয়ন না করিলে চলিবে কেন? এ দিকে দুইখানি গাড়ীর পক্ষে লোক সংখ্যা বেশী। অনেক পরামর্শের পর বালক বালিকাদিগকে এক গাড়ীতে শয়ন করান গেল, স্ত্রীলোক যাত্রীরা অন্য গাড়ীতে বসিয়া ঝিমাইয়া রাত্রি যাপনের বন্দোবস্ত করিলেন। আমরা বিস্তীর্ণ মাঠে উন্মুক্ত আকাশতলে লেপ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িলাম। এত কষ্টের ভিতরও যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিবার নহে।

বলা বাহুল্য এত কষ্ট ও কোলাহলের ভিতরও নিদ্রা দেবীর কৃপা লাভে বঞ্চিত হইলাম না।

জটোস্তবা ও মেলা। উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিতা তীব্র স্রোতা জটোস্তবা নদীর পূর্ব্বতীরে মন্দির ও পশ্চিম তীরে মেলা বসিয়াছে। শিবের জটা হইতে উৎপন্ন বলিয়া জটোস্তবা নাম হইয়াছে। স্থানীয় লোক জবদা নদী বলে ও গঙ্গার ন্যায় পবিত্র মনে করে। জল অতিশয় স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা, নীচে মোটা বালি ও পাথরের নোড়াতে পূর্ণ, এক হাতের বেশী জল কোথায়ও নাই।

ভোর ৪টার সময় আমাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইলে উঠিয়া গাড়ীসহ মেলার পারে চলিলাম। মন্দিরের এ পারে মলমূত্র ত্যাগ অনেকে সঙ্গত বোধ করে না। নদী পার হইয়া বালিচরে একত্রে ২।৩টী কুল গাছ দেখিয়া তাহার নিচে আড্ডা স্থাপন করা হইল। পরে হাত মুখ ধুইয়া স্নানান্তে পুনরায় মন্দিরে গিয়া পূজা ও দর্শনাদি করা হইল। মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া মেলার ভিতর বাজার করিতে গেলাম। খাদ্য ও অন্যান্য প্রকার সমস্ত দ্রব্যই যথেষ্ট আমদানী হইয়াছে, কিন্তু আমাদিগের দেশের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত বেশী, কেবল কপি অতি সস্তা দেখিলাম। মেলা অতি বৃহৎ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমস্ত প্রকার দ্রব্যই পাওয়া যায়। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ভুটীয়ারা ভূটান জাত চামর, মৃগনাভি কস্তুরী, হরিণ চর্ম্ম, ভুটীয়া ঘোড়া, কুকুর, বানর প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আনিয়াছে। আমরা যখন গিয়াছিলাম তখনও জিনিস পত্র আমদানী শেষ হয় নাই।

প্রত্যাবর্তন। বাজার হইতে আসিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করা হইল। এমন সময় হঠাৎ ঠাকুরাণীর সেই আত্মীয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং

আমাদিগকে রাত্রি হইতে যথেষ্ট খুঁজিতেছেন বলিলেন, আমরাও তদুত্তরে সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিলাম। পরে স্নানান্তে আহারাদি করা গেল। এখন স্ত্রীলোক যাত্রীরের মেলা দেখা পর্ব্ব। আমি পূর্ব্বেই মেলার ভিতর বেড়াইয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং আমাকে গাড়ীতে পাহারা স্বরূপ থাকিতে হইল; অপর দুইটি ভদ্রলোক সহ সকলে মেলা দেখিতে গেলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পর সকলে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ধুলায় ধূসরিত অবস্থায় কতকগুলি কাঠের খেলানা, বাঁশী, মেটে পুতুলাদি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং এক কলসী জলের সদ্ব্যবহার করিবার পর প্রায় ৩টার সময় গাড়ী ছাড়িয়া রাত্রি ৮টায় বার্ণেশ পঁহুছা গেল।

জল্পেশ্বর মহাদেব সম্বন্ধে জনশ্রুতি। } জল্পেশ্বর মহাদেব সম্বন্ধে লোক মুখে যেরূপ ইতিহাস শুনিলাম, এ স্থলে তাহাই লিখিতেছি, সত্য মিথ্যার জন্য আমি দায়ী নহি। একদা যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য ভূটান রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য পুনঃ পুনঃ পরাজিত হন। পরে তিনি কোঁচবিহার রাজের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া উভয়ে একত্র ভূটান রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন। এরূপ অবস্থায় মহারাজা প্রতাপাদিত্য এক রাত্রিতে স্বপ্নে আদেশ পাইলেন যে তাঁহারা যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তথায় জল্পেশ্বর মহাদেব আছেন, মহারাজ তাঁহাকে প্রকাশ করতঃ পূজা করিয়া যুদ্ধে গেলে জয়লাভ করিবেন। তদনুসারে মহারাজ পর দিবস হইতে মহাদেবের খোঁজ করিতে লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর তাহারা একটি দুগ্ধবতী গাভীকে প্রতিদিন বনমধ্যে যাতায়াত করিতে দেখিয়া একদিন গাভীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। বনমধ্যে কিছুদূর গিয়া গাভী এক স্থানে দাঁড়াইবা মাত্র তাহার

দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল, পরে গাভিটী চলিয়া গেলে, মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে এই সংবাদ জানান হইল। তিনি ঐ স্থান খনন করাতেই মহাদেবের অনাদি লিঙ্গ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। অতঃপর মহারাজ ভূটান রাজের সহিত যুদ্ধ না করিয়া বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে চতুঃস্পার্শস্থ কয়েকখানি গ্রাম সহ ঐ স্থান গ্রহণ করিলেন। পরে তথায় মন্দির নির্ম্মাণ ও পূজার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া পূজার ব্যয়াদি নির্ব্বাহের নিমিত্ত গ্রামগুলি ব্রাহ্মণদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া এবং মন্দির ও পূজার তত্ত্বাবধানের ভার কোঁচবিহারের মহারাজকে দিয়া চলিয়া আসিলেন।

পুরাতন শাস্ত্রাদিতে জল্পেশ্বর মহাদেবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় মহাদেব কোন ঘটনা ক্রমে অপ্রকাশিত হইয়া পড়েন এবং মহারাজা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত হন।

যাহাহউক পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থামত বহুদিন পূজাদি কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি বিশেষ কোন কারণে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া পূজার নিমিত্ত বার্ষিক বৃত্তি ও তত্ত্বাবধান জন্য ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

আশ্চর্য্য ঘটনা। জল্পেশ্বর মহাদেব সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। বৎসরের মধ্যে একমাত্র শিব চতুর্দ্দশীর দিন, যখন হইতে চতুর্দ্দশী তিথি আরম্ভ হয়, তখন হইতে মহাদেব যে গর্ত্তে আছেন, তাহা ক্রমে জল পূর্ণ হইতে থাকে, এই জল বাড়িয়া মহাদেবের মস্তকোপরি অর্দ্ধহস্ত পর্য্যন্ত হয়। যাত্রীরা অনবরত দুগ্ধ, গঙ্গাজল, জটোস্তবার জল ইত্যাদি ঢালিতেছে, তথাপি জল উহার বেশী হয় না। আবার চতুর্দ্দশী তিথি ত্যাগ হইতে থাকিলে জলও ক্রমশঃ কমিয়া শেষ শুষ্ক হইয়া যায়। অনেকে নাকি জল বাহিরাতের

কোন কৌশল আছে কিনা, পরীক্ষা করিয়া কিছু দেখিতে পান নাই। আমাদিগের সেরূপ সুযোগ না ঘটিলেও গর্ত্ত যেরূপ মার্ব্বল পাথর দিয়া বান্ধান, তাহাতে কোন কৌশল থাকা বলিয়া মনে হইল না।

নানা কথা। শুনা যায় সাধারণের দর্শনের সুবিধার নিমিত্ত মহাদেবকে গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করিতে চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু খনন করিয়া অনাদি লিঙ্গ বুঝিতে পারিয়া সে চেষ্টা ক্ষান্ত দেওয়া হইয়াছে।

মহাদেবের লিঙ্গ মূর্ত্তি যে গর্ত্তের ভিতর আছে, তাহা আনুমানিক ১॥ হাত গভীর ও ১ হাত পারাবর। স্থানীয় মহাত্মা দিননাথ দাস মহাশয় নিজ ব্যয়ে গর্ত্ত ও চতুস্পার্শ্ব বহু অর্থ ব্যয়ে উৎকৃষ্ট মার্ব্বল প্রস্তর দ্বারা বাধাইয়া দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত শাক্ত মন্দিরের নিকট পুষ্করিণীর সিঁড়ি বাধাইয়া দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় ও অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বৃহৎ মন্দিরের উপযোগী চূড়াও বৃহৎ ছিল, কিন্তু ভূমিকম্পে পড়িয়া গিয়াছে। ২।৩ বার গাঁথিবার চেষ্টা হয়, কিছুদূর গাঁথার পর প্রতিবারই ভাঙ্গিয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট পুনরায় চূড়া তুলিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। শুনিলাম আদেশ হইয়াছে যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশীয় কোন ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে চূড়া উঠাইলে আর ভাঙ্গিবে না। সত্য মিথ্যা ভগবান জল্পেশ্বরই জানেন।

স্থানীয় সংবাদ ।

—:0:—

প্রেরিত

মিষ্টার পেটেলের বিবাহ-বিষয়ক আইনের খসড়ার বিবেচনা করিবার জন্য বালুরঘাটের নেতৃবর্গের আহ্বান মতে বিগত ৭ই মার্চ্চ তারিখে এখানে জনসাধারণের একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল । ঐ দিন বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত আলোচনার পর ১৪ই মার্চ্চ তারিখে পুনরায় অধিবেশন হইবে স্থিরীকৃত হয় । গত ১৪ই মার্চ্চ তারিখে অবশেষে অনেক অধিক সংখ্যক সভ্যের ভোটের দ্বারা এই মন্তব্য গৃহীত হয় যে মিঃ পেটেলের বিল আইনে পরিণত হওয়া উচিত ।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত অধিকারী বি, এল উকিল ও ভাইস্ চেয়ারম্যান লোকাল বোর্ড, শ্রীযুক্ত রামযাদব চক্রবর্ত্তী উকিল, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ কাব্যতীর্থ ও মোক্তার শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ কাব্যতীর্থ মহোদয়গণ বিলের বিপক্ষে এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় বি, এল, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মৈত্র এম, এল, বি, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ঘোষ উকিল, শ্রীযুক্ত সুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি এল ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বাগচী উকিল ও শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার বিলের সপক্ষে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন ।

ডাকাতি –

গত ১৫ই কার্ত্তিক বলভৈড় নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাসের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছিল । কোতোয়ালী থানার সবইনেস্পেক্টার শ্রীযুক্ত সুখশশি সিদ্ধান্তের চেষ্টায় আসামীগণ ধৃত হইয়াছিল । মালও বাহির হইয়াছিল । সেসন আদালতের বিচারে একজন আসামীর ৫বৎসরের জেল হইয়াছে । অন্যান্য আসামীগণ এক্ষণে হাজতে আছে ।

অগ্নিকাণ্ড—

গত ২৯ শে ফাল্গুন সন্ধ্যার সময় বাহ্রাপুরের দক্ষিণে কতকগুলি পশ্চিম দেশীয় মুচীর যে বাড়ী আছে তাহার এক বাড়ীতে আগুন লাগিয়া একখানা ঘর পুড়িয়া গিয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—

সহরে ও মফঃস্বলে এবার ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোণিয়ার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী দেখা যাইতেছে। সংক্রামক রূপে এই ব্যাধি সহরে ও মফঃস্বলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মৃত্যু সংখ্যাও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। গত সন বসন্তের প্রকোপে লোকে যেমন সর্ব্বদা সশঙ্ক ছিল, এবার ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোণিয়ার জন্যও তদ্রূপ সন্ত্রস্ত আছে। মার্চ্চ মাসের প্রথম হইতে স্থানীয় মিউনিসিপালিটী জনৈক সবআসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করিয়াছেন এবং মিউনিসিপাল আফিসে ছোট খাটো একটি ডিস্পেন্সরী খুলিয়াছেন। তথা হইতে বিনামূল্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার ঔষধ বিলি হইতেছে এবং ডাক্তার বাবুও বিনা দর্শনীতে ইনফ্লুয়েঞ্জার রোগী দেখিতেছেন।

শ্মশান ঘাট—

জল সরিয়া যাওয়ায় শ্মশান ঘাটে শবদাহ করা ভয়ানক কষ্ট দায়ক হইয়াছে। প্রত্যহ যে সকল চিতা হইতেছে তাহা পরিষ্কার হইতেছে না. জায়গাও পাওয়া যাইতেছে না। দুই প্রহর সময়ে শবদাহকারীদের অতিশয় ক্লেশ হয়। এ পারে চর পড়াতে অনেক শব নদীর অপরপারে দাহ করা হইতেছে। শবদাহকারীদের বিশ্রাম করিবার জায়গা নাই। মিউনিসিপালিটী হইতে চাকার উপরে একখানা ঘর তৈয়ার করিয়া জলের ধারে দিবার কথা হইয়াছে। জল বাড়তি কমতির সময় ঐ ঘর টানিয়া উপরে উঠান বা নীচে নামান হইবে—ইহাই অভিপ্রায়।

অনুমরণ—

ভূম্যধিকারী ৺বরদাপ্রসাদ সেন মহাশয় বড়বন্দর মহল্লায় বাস করিতেন। দুঃখের বিষয় নিউমোণিয়া রোগে তিনি ৩০ শে ফাল্গুন সন্ধ্যার পর পরলোক গমন করেন। তাঁহার সাধ্বীভার্য্যাও একই সময়ে পীড়িত হইয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যু সময়ে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। ঐ সংবাদ অজ্ঞাত থাকিয়াই ন্যূনাধিক ৪৮ ঘণ্টার পরে তিনি স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন।

দরিদ্র ভাণ্ডার—

সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্লুমফিল্ড বাহাদুর একটী দরিদ্র ভাণ্ডার স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার সাধু ইচ্ছা কার্য্যে

পরিণত করিয়া যাইতে পারেন, ইহাই আমাদের কামনা। এ স্থানে এরূপ অনুষ্ঠানের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। লাট মহোদয়ের আগমনের কিছুদিন পূর্ব্বে ধর্ম্মশালার সামনে রাস্তায় একটী লোক মরিয়া পড়িয়াছিল। এবং তাঁহার আগমনের পূর্ব্বদিন ডাক বাঙ্গালার নিকটে একটী মৃতদেহ পাওয়া যায়। দরিদ্রতা ও অনাহার জন্য যে ঐ দুই মৃত্যু তাহার সন্দেহ নাই। সহরের স্থানে ২ কত নিরাশ্রয় লোক বৃক্ষতলে অর্দ্ধাশনে বা অনশনে রাত্রি যাপন করে। কার্য্যক্ষমদিগকে কার্য্য দিয়া তাহাদের এবং কার্য্যে অক্ষম-দিগের আহার ও আশ্রয় দিবার একটা বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

বদলী—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি পটুয়াখালিতে বদলী হইলেন। সত্যেন্দ্র বাবুর ন্যায় সজ্জন ও সুবিচারক এখানে খুব কমই আসিয়াছেন। সত্যেন্দ্র বাবু সাহিত্যসভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। অনেক অধিবেশনে তিনি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। স্থানীয় মোক্তার লাইব্রেরীতে সত্যেন্দ্র বাবুর বদলীতে একটী বিদায় সমিতি হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রুমফিল্ড বাহাদুর ঐ সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন।

খেলাফত উপলক্ষে হরতাল—

১৯ শে মার্চ্চ মোতাবেক ৬ই চৈত্র ভারতব্যাপী হরতাল হইয়াছিল। দিনাজপুরেও তাহা প্রতিপালিত হইয়াছিল। বাজার দোকানপাট অধিকাংশ বন্ধ ছিল এবং বৈকালে জেলখানার হাতায় বড় মসজিদে বক্তৃতাদি হইয়াছিল। হরতালের দিনে কি করা হইবে তাহা নির্দ্ধারণ জন্য নাট্য-সমিতির গৃহে পূর্ব্বেই হিন্দু-মুসলমানের একটী সভা হইয়াছিল। তাহার সভাপতি ছিলেন উকিল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়।

বিরাট সভা—

গুড ফ্রাইডের বন্ধে দিনাজপুর সহরে মোশলেম লীগ, মুসলমান শিক্ষা সমিতি, দিনাজপুর সভা এবং স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের স্মৃতি স্থাপনোদ্দেশ্যে সভার অধিবেশন হইবে; তাহার বিরাট আয়োজন চলিতেছে।

বালুরঘাট—

মহামান্য হাইকোর্ট আদেশ করিয়াছেন যে দিনাজপুর জেলার মুন্সেফী সকলের দেওয়ানী এলাকা যেরূপ আছে আপাততঃ তাহাই থাকিবে। সুতরাং বালুরঘাটে অতিরিক্ত মুন্সেফী আদালত প্রভৃতির নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ থাকিবে না

—:0:—

দিনাজপুর পত্রিকা।

(মাসিক)

সপ্তবিংশতি ভাগ } বৈশাখ, ১৩২৭। } ৮ম সংখ্যা

নববর্ষ।

---:():---

অনন্ত কাল সমুদ্রের একটি তরঙ্গ আজ মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, একটি তরঙ্গ আসিয়া আমাদের সম্মুখীন হইল। অনন্ত কাল হইতে এই তরঙ্গ এই সমুদ্রে নাচিয়া বেড়াইতেছে, আর অনন্ত কাল পর্য্যন্ত এইরূপ নাচিয়া বেড়াইবে। আমরা আজ এই সমুদ্রে ভাসিতেছি আবার এই সমুদ্রেই মিশিয়া যাইব, কিন্তু এ তরঙ্গ চিরদিন এইরূপই চলিবে। এই তরঙ্গে স্নান করিয়া কাহারও দেহ মন স্নিগ্ধ হইতেছে, নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হইতেছে, কেহ বা কোন ধন রত্ন লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে; আবার কেহ বা লবণাক্ত জলে নাকানি চোবানি খাইয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে পরিহিত বস্ত্র খানিও হারাইয়া ফেলিতেছে। যে তরঙ্গটি চলিয়া গেল সেই ১৩২৬ সনে আমরা রোগ শোক দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে কত

কষ্টই না পাইয়াছি। দেশের কত রত্নই না অকালে কালের ক্রোড়ে চির নিদ্রিত হইয়াছে। সে সব অতীত কথার আলোচনা করিয়া আর লাভ নাই। কর্ম্মফল বাদী আমরা, অদৃষ্ট বিশ্বাসী আমরা অন্যকে দোষ দিতে যাইব কেন? নববর্ষ সম্বন্ধেও আমাদের ঐ কথা। তিনি আমাদের শুভ দায়ক হইবেক কি অশুভ দায়ক হইবেক জানি না, শুভাশুভ ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিব। এস নববর্ষ, তোমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করি তুমি কি লইয়া আসিতেছ জানি না, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তোমার আগমন যেন শুভজনক হয়, তোমার পুণ্যপাদ স্পর্শে যেন দেশের রোগ শোক দূরীভূত হয়। দুর্ভিক্ষ পিশাচের তাণ্ডব নৃত্যে যেন দেশ আর প্রপীড়িত না হয়। দস্যু তস্করের পৈশাচিক লীলা দেশ হইতে যেন অন্তর্হিত হয়। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হইয়া দেশ যেন আবার শান্তির সুধাময় ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে পারে।

—:0:—

বাসন্তী পূজা।

—:0:—

প্রত্নতত্ব এবং পুরাবৃত্ত তত্বান্বেষিগণ যে কালের কল্পনা করিতে অসমর্থ সেই কল্পনাতীত কালে, ভারতমাতার পূত কোলে কোন নিভৃত কাননে, সৌরবর্ণের অতীত ফল ও ফুলে ভরা বৃক্ষকুলের ছায়ায় একটী সুমধুর

সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। সেই মহা ভাবময় অতি সুললিত গীতি একদিন প্রায় সর্ব্বত্রই ধ্বনিত হইয়াছিল। যিনি সে গীতি প্রথমে তুলিয়াছিলেন ও যাঁহারা শুনিয়াছিলেন তাঁহারাও আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া গিয়াছিলেনই, এবং তার পরও যাঁহারা সেই গীতির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন অথবা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারাও সে সঙ্গীত সুধায় মাতোয়ারা হইয়াছেন।

সেই অতি সুদূর স্মরণাতীত সারোচিষ মন্বন্তরে, রাজ্যলোলুপ শত্রুগণের উৎপীড়নে উৎপীড়িত রাজা সুরথ এবং অর্থলুব্ধ পুত্র কলত্রাদি কর্ত্তৃক নিরাকৃত ও নির্য্যাতিত বৈশ্য সমাধি যখন দারুণ মনোবেদনায় ক্ষুব্ধ হইয়া, দ্বন্দ্ব-হিংসা-দ্বেষ-শূন্য পরম রমণীয় অবিচ্ছিন্ন মহাশান্তির চির আধার অগণ্য ভারতীয় তপোবন সমূহের একতম মেধস মুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

"ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্বতৎ।
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা। ৩৬।

মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি।
জানতোপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম॥ ৩৭।

অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈ স্তথোজ্ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি॥ ৩৮।

এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্ট দোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্ট মানসৌ॥ ৩৯।

তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষাং বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা॥" ৪০।

রাজা সুরথ যেদিন এই প্রশ্নটী মেধসমুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া চিত্তবিক্ষোভ নাশক মহোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, সেই দিনটীর স্মরণে মানব মাত্রেরই বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণের মনঃপ্রাণ দেহ পরম আনন্দে নাচিয়া উঠে। রাজা সুরথ যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কেবল তাঁহার অথবা সমাধির ব্যক্তি বিশেষের প্রশ্ন নয়, ইহা যে বিশ্বের যাবতীয় ভুক্তগণের মর্ম্মবাণী। রাজা সুরথ এই প্রশ্নের উত্তরে ত্রিকালজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী মেধসমুনির শ্রীমুখ হইতে যে মহোপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাকে আমরা চণ্ডী বলিয়া থাকি। মেধসমুনি সুরথের নিকট মায়াবন্ধন নিকৃন্তনী, সংসার সাগর তারিনী জগন্মাতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সুরথ ও সমাধি সেই কাহিনী শ্রবণে পরম হৃষ্ট হইয়া কঠোর সংযমের সহিত জগন্মাতার আর্চ্চনা করিয়া দেবীর কৃপায় স্বায় স্বীয় বাঞ্ছিত ইষ্টলাভ করেন। তাহারই অনুকরণে আজও ভারতীয় আর্য্যসন্তান আমরা সেই ভাবে সেই তিথিতে জগন্মাতার অর্চ্চনা করিয়া থাকি। আজ সেই তিথি, সেই অর্চ্চনার দিন। আজ বাসন্তী পূজা, জগন্মাতার বসন্তকালীন অর্চ্চনা।

ভারতবাসী বৎসরে দুইবার জগন্মাতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আপাততঃ কষ্টদায়ক গ্রীষ্ম এবং বর্ষা শেষ হইয়া পৃথিবী যখন শরতের সুখস্পর্শে হাসিয়া উঠে, আকাশ মেঘ নির্ম্মুক্ত, শেফালিকা গন্ধে সমীরণ সুবাসিত, জলে স্থলে যখন কৌমুদী জগদ্বিমোহন হাসি হাসিয়া ফুটিয়া উঠে, ধরিত্রী যখন তাঁহার সন্তানকুলের আগামী বৎসরের আহার্য্যরাশি স্বীয় অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন, এবং এইরূপে একদিকে কঠোর সংযম এবং ক্লেশ স্বীকারের পর প্রকৃতিদেবী

যখন নানাবিধ মনোহর ভূষায় ভূষিতা, এবং অপরদিকে গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ঋতুতে মানব, মাতা বসুন্ধরার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে স্বীয় জীবিকা সংগ্রহের জন্য দারুণ শ্রমে নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া শরতে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে অবসর পায় এবং দারুণ শ্রমের ফল স্বরূপ স্বর্ণবর্ণ শস্যশীর্ষগুলি যখন ইতস্ততঃ নির্ম্মল সূর্য্য এবং চন্দ্র কিরণে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া মানবপ্রাণ পুলকিত করিয়া তোলে, তখন সেই সুমধুর শরতে, সংযম এবং ক্লেশের অবসানে, পুনরায় শস্য সংগ্রহরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে ভারতবাসীগণ একবার জগন্মাতার অর্চ্চনা করিয়া, মহাশক্তির পূজা করিয়া মায়ের আশীর্ব্বাদ যাচিয়া লয়। আর একবার দারুণ শীতের অবসানে বসন্ত সমাগমে প্রকৃতি দেবী হাসিয়া উঠিলে, গাছে গাছে নানাবিধ সুরসাল ফলের গুটিকা দেখা দিলে, শস্য সংগ্রহ, বৎসরের দেনা পাওনার হিসাব শেষ হইলে, ভারতবাসী নিরুদ্বেগ চিত্তে আবার জগন্মাতার অর্চ্চনা করিয়া মায়ের কৃপালাভ করে। বৎসরে শস্য রোপনের দুইটী প্রধান সময় গ্রীষ্ম এবং বর্ষা; আগামী বৎসরের জীবিকার নিমিত্ত হেমন্ত ও শীত ঋতু সেই শস্য সংগ্রহের সময়। মানবের প্রধানতম সমস্যাগুলির মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ সমস্যাই প্রধান বলিয়া মনে হয়। গ্রীষ্ম এবং বর্ষা, হেমন্ত এবং শীত সেই খাদ্য সংগ্রহের দুইটী প্রধান সময়। এক সময় সেই খাদ্যের বীজ বপন, এবং অন্য সময় শস্য সংগ্রহের সময়। শরৎ ও বসন্ত এই দুই সময়েরই সন্ধিস্থল। গ্রীষ্ম বর্ষায়—ভূমি কর্ষিত হইল, শস্যের বীজবপন করা হইল, তারপর দারুণ উৎকণ্ঠা, কি হয় কি হয়, বীজে অঙ্কুর হয় কি না হয়। বর্ষা গেল, শরৎ আসিল, বীজ অঙ্কুরিত হইল, দেখিতে দেখিতে মাঠ ঘাট

স্বর্ণবর্ণ শস্যশীর্ষগুলিতে ভরিয়া উঠিল, শ্রম সফল হইল, তখন আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিল, ভারতবাসী মায়ের পূজা করিল, মায়ের আশীষ ভিক্ষা করিয়া লইল। আবার হেমন্ত ও শীতে শস্য সংগ্রহের ধুম পড়িয়া গেল। শস্য সংগ্রহ হইল, রাজার কর, উত্তমর্ণের ঋণ, পাওনাদারে হিসাব শোধ হইল, আগামী বৎসরের খাদ্য গোলায় উঠিল, চিত্ত নিরুদ্বেগ ও শান্ত হইল, তখন আবার আনন্দ স্রোত বহিল, ভারতবাসী মহানন্দে আনন্দময়ী মায়ের পূজা করিয়া আনন্দ এবং আশীষ মাগিয়া লইল। এই দুই সন্ধিতে মায়ের দুই অর্চ্চনা, বাসন্তী এবং শারদীয়া। দুই মহাপুরুষ বিপদে পড়িয়া জীবন মরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া, এই দুই পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শারদীয়া পূজা শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক প্রবর্ত্তিত। বাসন্তী পূজা সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের দ্বারা প্রবর্ত্তিত।

আজ সেই বাসন্তী পূজা।

রাজা সুরথ শত্রুহস্তে পরাজিত এবং হৃতরাজ্য এবং সমাধি বৈশ্য স্ত্রী পুত্র কলত্রাদি কর্ত্তৃক উপেক্ষিত এবং বিতাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে মেধস মুনির আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। সে আশ্রমে হিংসা ছিল না, দ্বন্দ ছিল না, চিরশান্তি সেখানে বিরাজিত ছিল, মোক্ষের আকাঙ্খা ও তজ্জনীত সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে সেখানকার বাতাস পরিপূর্ণ ছিল, প্রেম তথায় মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছিল, সেখানকার প্রত্যেক শব্দে ভগবৎ গাথা ধ্বনিত হইত। দারুণ ক্ষোভে, ক্লিষ্ট চিত্তে, সুরথ এবং সমাধি শান্তি পাইলেন, পরস্পর পরস্পরের পরিচয় লইলেন, এবং তারপরে মেধসমুনির নিকট গিয়া সেই মহাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহা যাবতীয় বিশ্ব আবহমান

কাল জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে। গীতায় যাহা একটু রূপান্তরভাবে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—

"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্ন পিবার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥"

সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেঃ—"হে মুনে, একটী বিষয় বুঝিতে না পারায় আমার চিত্ত আমার আয়ত্তাতীত হইয়া বড়ই বিক্ষেপিত হইতেছে, সেই বিষয়টী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। অজ্ঞের ন্যায় আমার রাজ্যের প্রতি এত মমতা হইতেছে কেন? কেবল আমি নহি, এই দেখুন, এই বৈশ্যও আপন পুত্র কর্ত্তৃক নিরাকৃত, ভার্য্যা ও ভৃত্য দ্বারা পরিত্যক্ত এবং আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও সেই পুত্র কলত্রাদির প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতেছে। আমি এবং বৈশ্য উভয়েই উক্ত প্রকার দোষানুভব করিয়াও মমতাকৃষ্ট চিত্ততা বশতঃ অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতেছি। হে মহাভাগ অবিবেকিরাই মোহান্ধ হইয়া থাকে, এই বৈশ্য এবং আমি উভয়ে জ্ঞানী হইয়াও কি জন্য বিবেকান্ধের ন্যায় মোহপ্রাপ্ত হইয়াছি?" এই প্রশ্নটীর সঙ্গে স্বীয় অবস্থা মিলাইয়া দেখিলে মনুষ্যমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে ইহা তাঁহারই হৃদয়ের প্রশ্ন। পৃথিবীতে অহর্নিশি আমরা কেবল চারিদিকে যাবতীয় পদার্থের অসারতারই প্রমাণ পাইতেছি, তবু অসারকেই সার ভাবিয়া এমনই ভাবে জড়াইয়া ধরি যে তাহা যে অসার এ জ্ঞানের লেশও আর থাকে না। কোন কর্ম্ম পাপ, কোন কর্ম্ম পুণ্য তাহা বিচারে আমরা বেশ বুঝি, কিন্তু তবু যেন কাহারও দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া সেই পাপকেই জড়াইয়া ধরিয়া থাকি। ইহার কারণ কি? নিরন্তরই এই প্রশ্ন মানব মাত্রেরই প্রাণে ধ্বনিত

হইতেছে। তাই বলিতে হয় সুরথ যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার একার কথা নয়, তাহা যাবতীয় বিশ্ববাসীর মর্ম্মকথা। সুরথ বলিলেন "আমি এবং বৈশ্য জ্ঞানী হইয়াও কেন মোহগ্রস্ত হইলাম।" সুরথের জ্ঞানের অভিমান ছিল, এবং মানব মাত্রেরই তাহা আছে। সকলেই মনে করে সবই ত বুঝি, তবে কেন পারি না।

সুরথের প্রশ্নের উত্তরে মেধসমুনি বলিলেন :—

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক পৃথক ॥ ৪২
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪৩
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥ ৪৪
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ ॥ ৪৫
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥ ৪৬
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥ ৪৭
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ ৪৮

তন্নাত্র বিস্ময়া কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।

মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥ ৪৯ ॥

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।

বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৫০ ॥

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ৫১ ॥

অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীরই বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, সেই বিষয়ও আবার পৃথক পৃথক। কোন কোন প্রাণী দিবান্ধ, কতকগুলি রাত্রি কালে অন্ধ এবং কোন কোন প্রাণী কি দিনে কি রাত্রিতে সমানরূপে দেখিতে পাইয়া থাকে। মনুষ্য সকল জ্ঞানী সত্য, কিন্তু কেবল মনুষ্য কেন, উক্তরূপ জ্ঞান পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদিরও রহিয়াছে। আহার বিষয় অপত্য স্নেহাদি বিষয়ে যেমন মনুষ্যাদির জ্ঞান আছে, মৃগ পক্ষী প্রভৃতিরও তেমনি জ্ঞান আছে। অতএব মনুষ্য এবং পশু উভয়েরই এ জ্ঞান সমান। তাই দেখা যায়, ঐ জ্ঞান থাকাতেই পক্ষিগণ নিজে ক্ষুধার্ত হইয়াও শাবকদিগের চঞ্চুতে তণ্ডুল কণাদি আহারীয় প্রদানে কতই যত্নবান। হে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, তুমিও কি দেখিতে পাইতেছ না যে, মনুষ্যগণ লোভের বশীভূত হইয়া, ভবিষ্যৎ প্রত্যুপকার প্রত্যাশাতেই পুত্রাদির প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকে। সংসার স্থিতিকারিণী মহামায়া প্রভাবেই প্রাণীগণ মমতা আবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে মোহগর্ত্তে নিপতিত হইতেছে। অতএব জগৎ যে মহামায়া কর্ত্তৃক মোহিত হইতেছে, এ বিষয়ে বিস্ময়ীভূত হইবার কারণ নাই; কেন না জগৎকর্ত্তা হরিও মহামায়া প্রভাবে যোগনিদ্রামগ্ন। সেই দেবী ভগবতী

যায়া প্রভাবেই জ্ঞানিগণেরও চিত্ত বলপূর্ব্বক মুগ্ধ করিয়া থাকেন। ইনিই এই সমস্ত বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, আর ইনি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিলেই মনুষ্যগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।"

ক্ষেত্রতত্ব বা জ্যামিতি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহার আর কোন প্রমাণ আবশ্যক হয় না, তাহারা স্বতঃসিদ্ধ, আর কতকগুলি আছে যাহা কোন যুক্তি তর্ক বিনাই স্বীকার করা যায়, তাহারা স্বীকার্য্য। মুনিবর মেধসের এই উক্তিগুলি একাধারে স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বীকার্য্য উভয়ই। সুরথ বলিলেন "আমরা জ্ঞানী তবুও মোহপ্রাপ্ত হই কেন।" মেধস প্রথমেই সেই জ্ঞানের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিলেন। মানব যে জ্ঞানের গর্ব্ব করে, সে জ্ঞানটী কি? আহারাদি বিষয়, দিবা রাত্রি শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখাদির ভেদ, অপত্য কলত্র স্নেহাদিই কি সেই জ্ঞান? তাহা নয়। সে জ্ঞানত পশু পক্ষীরও আছে। তবে মানবের শ্রেষ্ঠতা কোথায়? তত্বজ্ঞানে, এই যে জগদ্ যন্ত্র ঘূর্ণিত হইতেছে ইহার মূল কি এবং কোথায়, সেই তত্বজ্ঞানেই মানবের শ্রেষ্ঠতা। সেই জ্ঞান লাভের অধিকার থাকাতেই মানব সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ। সে জ্ঞান যাঁহার আছে তিনিত বিষয় বিনাশে ক্ষুব্ধ অথবা লাভে হৃষ্ট হইবেন না। এই কথা বলিয়া মুনিবর সুরথের জ্ঞান গর্ব্ব চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে সংসার মোহগর্ত্তে পতিত মানবকুলের জ্ঞান গর্ব্ব চিরদিনের মতন ভাঙ্গিয়া দিলেন। আর প্রকৃত জ্ঞান, সকল মোহ ক্লেশ দুঃখাদির অবসান স্থল বলিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ, সকলের মূলতত্ব ভগবতী মহামায়াকে জ্ঞাতব্য বিষয়ের সার বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তারপর অধ্যায়ের পর অধ্যায় দেবী মাহাত্ম্য

কীর্তন করিতে লাগিলেন। তিনি ভক্ত রক্ষার জন্য কি ভাবে শত্রুসংহার করিয়াছেন এবং ভক্তগণকে কি আশ্বাস দিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিতে লাগিলেন। অমৃত বর্ষণ হইতে লাগিল। তাপিতহৃদয় সুরথ ও সমাধি শান্তির পথ দেখিতে পাইতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা সেই পথ অনুসরণ করিলেন। কঠোর সংযম এবং গভীর শ্রদ্ধার সহিত তিন বৎসর দেবীর অর্চনা করিলেন। জগন্মাতা প্রসন্ন হইলেন। সাধককে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। তদবধি সংসারের নানাবিধ তাপে ক্লিষ্ট মানবকুল সেই প্রথায় জগন্মাতার পূজা করিতে লাগিল।

এই যে পূজার প্রথা এবং পদ্ধতি, কত গভীর এবং আত্মসুন্দর ভাব ইহাতে অন্তর্নিহিত আছে তাহা বর্ণনার অতীত। তবু ভাষায় যতদূর সাধ্য বর্ণনা করিয়া সেই ভাবসুধার কিঞ্চিৎ আস্বাদ মাত্র গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইব। এই যে আমরা পূজা করি, সুরথ যে পূজা করিয়াছিলেন, সেই পূজাটীর নামকরণ কিরূপে হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবিবার বিষয়। অমুক দেব বা দেবীর পূজা, এই ভাবে এ পূজার নামকরণ হয় নাই। অমুক (ঋতু) কালীন পূজা এই ভাবে ইহার নামকরণ হইয়াছে। মেধস যে পূজার বিধি দিলেন, তাহা কোন দেবতার কোন বিশেষ মূর্তির পূজা নয়, তাহা জগতের স্থিতি কারণ জগৎপ্রসবিনী যাবতীয় শক্তির কেন্দ্র স্থল মহাশক্তি মহামায়ার পূজা, জগন্মাতার পূজা। আমরা ইহাকে দুর্গোৎ-সবই বলি আর ভগবতী পূজাই বলি, অথবা যে কোন নামেই ইহাকে অভিহিত করি না কেন, ইহা যে জগন্মাতার বিশ্বরূপের পূজা তাহা পূজা পদ্ধতি, দেবীর মূর্তি প্রভৃতিতেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। এ মূর্তি ও

কোন নরাকৃতি দেব বা দেবীর মূর্ত্তি নয়। এ যে বিশ্বরূপের আদর্শ। মায়ের কৃতী সন্তান বঙ্কিম চন্দ্রের ভাষায় মায়ের রূপ বর্ণনার সূচনা করিতেছি। এ মূর্ত্তি "সুবর্ণ মণ্ডিতা এই সপ্তমীর প্রতিমা, এই আমার জননী জন্মভূমি এই মৃণ্ময়ী মৃত্তিকারূপিনী অনন্তরত্ন ভূষিতা এখন কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশদিক্ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না কাল দেখিব না- কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না, কিন্তু একদিন দেখিব-দিগ্ভুজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্য সিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী দেবী প্রতিমা।" এই যে প্রতিমা এত মৃণ্ময়ী প্রতিমা নয়, কাঠ খড় মাটি দ্বারা নির্ম্মিত জড় প্রতিমার ত পূজা হইতেছে না, এ যে চিণ্ময়ী মাতৃপ্রতিমা কবির ভাষায় বলিতে হয়:—

"আমার মা নহে কল্পনা, ঐ দেখ! চিণ্ময়ী
কাম্য বাসনা, প্রেম চক্ষে স্নেহ বক্ষে অমিয় ঝরে।
শ্রীমুখে মধুর হাসি, ওগো নাশে পাপ দুঃখ
রাশি, অবিশ্বাস নাস্তিকতা খণ্ডন করে।
রূপে করে জগত আলো, মায়ের কোলে
শোভে ভক্তদল, গদগদ প্রেমলাভ আনন্দ ভরে।

আদ্যাশক্তি ভগবতী, রূপে লক্ষ্মী জ্ঞানে সরস্বতী,

একাধারে কত কোটী কোটি রূপ ধরে।"

মায়ের এই যে প্রকৃত রূপ। এই যে আজ জগন্মাতার প্রতিমার অর্চনা হইতেছে. ইহাত কল্পনা নয়, ইহা যে মায়ের বাস্তব মূর্ত্তি। মা আমার হরিদ্বর্ণা, আজ বসন্তে পৃথিবী যখন নব পত্র পুষ্প ভূষণে ভূষিতা হইতেছেন তখন তিনিত হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়াছেন। এই কারণেই জগন্মাতা, জগতের সত্তাস্বরূপিনী ভগবতী আজ হরিদ্বর্ণা। মায়ের শ্রীঅঙ্গে কত অলঙ্কার শোভা পাইতেছে, আজ বসুন্ধরা কত অলঙ্কারে ভূষিতা। মায়ের এ মূর্ত্তি মায়ের বিশ্বরূপের আদর্শ, তাই বিশ্বের বর্ণে মায়ের বর্ণ, বিশ্বের অলঙ্কারে মায়ের অলঙ্কার। আবার এ বিশ্ব যে মায়ের বিরাট দেহ তাই মায়ের রং আজ বিশ্বের রং, মায়ের অলঙ্কার বিশ্বের অলঙ্কার। মায়ের মুখে কি সুমধুর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই প্রতিবিম্ব লইয়া বিশ্ব চরাচর আজ হাসিয়া উঠিয়াছে। এ পূজার আয়োজন, এ প্রতিমার শোভা দেখিয়া নিজকে বিস্মৃত হইতে হয়। সনাতন আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্র এবং পূজা ও সাধন পদ্ধতি গুলি অপৌরুষেয় বলিয়া ভারতবাসী আর্য্যমাত্রেই বিশ্বাস করেন। বাস্তবই যে এগুলি অপৌরুষেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধক যখন নিতান্তই ব্যাকুলতার সহিত ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে থাকে, যখন সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও দেবতার যথাবিধি পূজা করিতে পারিল না, তখন সে কেবলই কাঁদিতে থাকে এবং বলে :—

"কি দিয়ে পূজিব তোমায় কি আছে আমার" দেবতা তখন সাধককে নিজেই নিজের ধ্যান পূজা শিখাইয়া দেন। ইচ্ছাপূর্ব্বকই স্বীয় সত্তা সাধকের

হৃদয়ে ফুটাইয়া তোলেন, তখন আর সাধককে বৃথা কল্পনা জল্পনা অনুকল্প বিকল্প করিতে হয় না। এই ভাবেই আমাদের পূজাপদ্ধতিগুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা মানবের অস্থির মস্তিষ্কের অযথা কল্পনা নয়। মায়ের যে অপরূপ মূর্ত্তি মানুষের কি সাধ্য তাহা কল্পনা করে। এ মূর্ত্তি, এ ধ্যান যে দেবতা নিজেই শিখাইয়া দিয়াছেন। এ যে পূজা, এত কোন বিশেষ দেবতার কোন বিশেষ মূর্ত্তির পূজা নয়, এ যে বিশ্বের সমগ্র শক্তির কেন্দ্রভূতা ও জনয়িত্রী সেই আদ্যাশক্তি পূজা। তাই বিশ্বের বর্ণে, মায়ের বর্ণ, আবার মায়ের বর্ণে বিশ্বের বর্ণ। মা ত সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজিত, তাঁর কাছে ত ছোট বড় সবই সমান, সবাইত তাঁকে আপনার জানে ও তদ্রূপে পাইতে চায়। মা তাই দশহস্ত, দশদিকে প্রসারণ করিয়া যুগপৎ তিনি যাবতীয় বিশ্বকে পালন ও রক্ষা করিতেছেন। পালন ও রক্ষার প্রতিকৃতি স্বরূপ মায়ের দশহস্তে আবার দশবিধ অস্ত্র। মা যে বৈচিত্র্যময়ী। বিশ্বও তাই বিচিত্রতাপূর্ণ। মা ত সকলকে একই ভাবে একইরূপ করেন নাই, তাই তাহাদের পালন ও রক্ষার জন্য তিনি এক উপায় বিধান করেন নাই। দিকে দিকে তিনি বিভিন্ন ভাবের সৃজন বিকাশ করাইয়াছেন, এবং বিভিন্ন উপায়ে তাহাদের রক্ষার বিধান করিয়াছেন, তাই মায়ের দশ হাতে দশবিধ অস্ত্র। পরমহংসদেবের মধুময়ী বাণী এখানেমনে পড়ে :— "যে ছেলে যেমন মা তার জন্য তেমনই বিধান করিয়াছেন, যার যা পেটে সয় ,তাকে তাই দিয়াছেন।"

ধন জ্ঞান, শক্তি ও সিদ্ধি নিয়াই সংসার চলিতেছে। ইহারা যে বিশ্বেরই অঙ্গ। তাই মায়ের অঙ্গেই ইহাদের স্থান। মায়ের সঙ্গে, মায়ের অঙ্গেই তাই

ধন, জ্ঞান, শক্তি ও সিদ্ধি শোভা পাইতেছে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ তাই মায়ের সহচর। আর এ সকলের সমষ্টি স্বরূপ যে অতুল শোভা এবং জ্যোতি, তাই মায়ের দেহ। পদতলে মা অসুর মর্দ্দন করিতেছেন। তমঃ নাশ করিতেছেন, এবং কেশরীকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, রজ গুণের উপর কর্ম্ম ভার অর্পণ করিতেছেন। তমঃ নাশ হইল, রজঃ তাহার কর্ম্ম শেষ করিল, জ্ঞান শক্তি ধন ও সিদ্ধি লাভ হইল, তাহার অতুল সৌন্দর্য্যে বিশ্ব হাসিয়া উঠিল, দশদিকে শান্তি বিরাজ করিল, তখন সত্ত্ব দেখা দিল, উত্তেজনা চলিয়া গেল, কর্ম্মের তখন বিরাম হইল, আর সত্ত্ব অধিষ্ঠিত হইল। সকলের অবসানে, পরে সত্ত্ব, কর্ম্মের পারে সত্ত্ব, সেখানে সব অবসান, কোন দ্বন্দ্ব নাই, সেখানে কেবলই পূর্ণতা, সেখানে সুগভীর উদাসীনতা, তাই মহাঔদাস্তের চরম আদর্শ, সত্ত্বের আধার এবং স্বরূপ শিব মায়ের প্রতিমার শীর্ষ দেশে বিদ্যমান, সত্ত্ব যখন সম্যক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সকল দ্বন্দ্বের যখন অবসান হয়, তখন মহামঙ্গল জাগিয়া উঠে, শিব তখন সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হন, বিশ্ব তখন শিবকে বরণ করিয়া লয়, তাই শিব বিশ্বস্বামী, এবং তাই শিব মাতৃ প্রতিমার স্বামী রূপে পূজিত। গীতার অবশেষে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

"রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥

সেই বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে হয়

"মানব সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম।
সুরথমেধসযোঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ॥

ধন্য সেই মেধসাশ্রম, যেখানে এ মূর্ত্তি প্রথমে নির্ম্মিত ও পূজিত হইয়াছিল।

বিশ্ব তমঃ রূপ অসুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। রজঃ তাহাকে নিবারণ করিতে উদ্যত হইল। মহাবলবান তমঃকে নিরাকরণ করিবার জন্য রজঃ ধন, জ্ঞান, শক্তি, সিদ্ধি সৌন্দর্য্যাদি বিশ্বের যাবতীয় শক্তির সাহায্য গ্রহন করিল। মহাযুদ্ধ হইল। তমঃ নিরাকৃত হইল, ধ্বংস হইয়া রজঃতেই স্বীয় সত্ত্বা লীন করিয়া দিল। তখন রজঃ মহা উৎসাহে ধন, জ্ঞান, শক্তি সিদ্ধি, সৌন্দর্য্যাদির অর্চ্চনা আরম্ভ করিল। মহা অর্চ্চনায় সকলেই প্রসন্ন হইলেন। বিশ্ব হাসিয়া উঠিল, তখন সত্ব দেখা দিলেন। মহাশান্তি, পূর্ণজ্ঞান, অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রবল শক্তি, সর্ব্বসিদ্ধি এবং অফুরন্ত সৌন্দর্য্য নিয়া সত্ব আবির্ভূত হইলেন। রজঃ তখন পূর্ণকাম হইল, সত্বে সে আত্ম সমর্পণ করিল। তখন শুধু সত্ব, সত্বের বিমল আভায় দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত, সর্ব্বত্র নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। দ্বন্দশূন্য, সংযত ও শুদ্ধ চিত্তে এই দেবী প্রতিমার দিকে নিরীক্ষণ করুণ, দেখিবেন এই কাহিনীটীতেই প্রতিমা নির্ম্মিত, মূর্ত্তি এই কাহিনীরই চিত্র বা আলেখ্য। ধ্বংস বিশ্বের নীতি। বিশ্বের পদার্থ নিচয়ের প্রতি নিয়তই ধ্বংস হইতেছে সত্য, কিন্তু এই ধ্বংসের একটী বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। জাগতিক যাবতীয় পদার্থ নিচয়ই বিশ্বমাতার সন্তান। পৃথিবীতে তাহারা বিশ্বমাতা হইতে উৎপত্তি লাভ করে এবং স্বকর্ম্ম সাধন করিতে থাকে। কর্ম্ম করিতে করিতে যখন ক্লান্তি এবং অক্ষমতা উপস্থিত হয় এবং নির্দ্দিষ্ট কার্য্য শেষ হইয়া যায় তখন তাহাদের বিশ্রাম কাল উপস্থিত হয়। এবং তাহারা যে বিশ্বমাতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই মায়ের কোলে শুইয়া বিশ্রামলাভ করে। ইহাই ধ্বংস নামে অভিহিত। ধ্বংসে কোন পদার্থেরই নাশ হয় না, তাহারা কিয়ৎকালের জন্য মায়ের কোলে

করেন। ২১ শে তারিখে সকাল বেলা কতিপয় বালিকা কর্ত্তৃক "আমার জন্মভূমি" সঙ্গীতটী গীত হইবার পর সভার কার্য্যারম্ভ হয়। সভায় অনেকগুলি মন্তব্য পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রথম মন্তব্য ৺ মহারাজা বাহাদুর এবং সভার সভ্য ৺ললিতচন্দ্র সেন, ৺অহিরুদ্দীন আহাম্মদ ও ৺রাধাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়দিগের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ মন্তব্য পরিগ্রহণ করেন। খেলাফৎ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। বাস্তবিক বলিতে কি, এই খেলাফৎ ব্যাপার আমরা এখনও ভাল বুঝিতে পারি নাই। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের মতে শাসনাধিকার পরিচালনে যে সকল সাম্রাজ্য অক্ষমতা দেখাইয়াছে তাহাদের প্রতি আত্ম-নির্দ্দেশের (Self-determination.) নীতি প্রয়োগ করা হইবে। স্থূল কথায় বলিতে, তুর্ক সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষের প্রজাবৃন্দ যদি সুলতানের শাসনের পরিবর্ত্তে অন্যরূপ শাসন চাহে তবে তদ্রূপ শাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করা হইবে। য়ুরোপীয় মহাসমরের প্রসঙ্গে এই যে আত্ম নির্দ্দেশ নীতি প্রকটিত হইয়াছে, ঠিক এই নীতি যদি সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা হয়, তবে ইহার বিরুদ্ধে বক্তব্য থাকিতে পারে না। কিন্তু মার্চ্চ মাসের ইংরাজী কাগজে বিলাতের ওয়ার্ল্ড (The World,) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণে উদ্ধৃত "The British Government favoured the entire expulsion of the Turk form Europe, the internationalisation of Constantinople and the Dardanelles and the relegation of the Sultan to the new capital of Broussa in Asia Minor; The "French, on the other hand, who have large commercial

interests in Turkey have always wished to maintain the integrity of the Ottman Empire. As the result of last weeks' deliborations in Downing street it was agreed to defer so far to the French view as to permit the Sultan to remain in Constantinople, but to disarm the city entirely and to throw open the Dardanelles under the administration of a joint commission of the Allied Powers". এই অংশ পাঠে মনে হইতে পারে যে তুর্ক সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট হয়তো ভিন্ন ব্যবস্থার অভিলাষী। কিন্তু উদ্ধৃত অংশ যথার্থ ঘটনা প্রকাশক হইলেও, বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অসাধু উদ্দেশ্য আরোপ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের উক্ত অভিমত প্রকাশ আরও কোন ২ গবর্ণমেণ্টের মতের প্রতি অপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে হইতে পারে। যাহাই হউক খিলাফৎ প্রসঙ্গে অনেক সভাতে এরূপ বলা হইতেছে যে গভর্ণমেণ্টে যে অনুনয় বিনয় করা হইতেছে, যদি তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত না করেন তবে রাজভক্তি রক্ষা করা প্রজাপক্ষে কঠিন হইবে। আমরা এরূপ ভাষা ব্যবহারে দুঃখিত তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সমবেত শক্তিপুঞ্জ যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেন সে সময় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন প্রতিশ্রুতিবিশেষ সম্পূর্ণ প্রতিপালিত করা এক্ষণে সম্ভবপর নাও হইতে পারে। তুরস্ক সাম্রাজ্যের সহিত মীমাংসা একা বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের হাতে নহে। উক্ত গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে খেলাফতের অনুকূলতায় যে যথোচিত করা হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট যে অসবক্ত.

"পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। যে কাল পর্য্যন্ত তিনি সভ্য ছিলেন, দেশের কল্যাণের জন্য খাটিয়াছিলেন। উক্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষা বাবদ মহারাজা ৩০০্ টাকা দান করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট গিরিজানাথকে মহারাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময়ে গবর্ণমেন্ট মহারাজা বাহাদুরকে ১০০ একশত সশস্ত্র সৈন্য রাখিবার অধিকার প্রদান করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি রক্ষা কল্পে ১০,০০০্ টাকা দিয়াছেন। দিল্লীর সুবৃহৎ বিরাট দরবার উৎসবে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক মহারাজা বাহাদুর নিমন্ত্রিত হন। বর্ত্তমান সম্রাট মহোদয় যখন প্রিন্স অব ওয়েলস ছিলেন তখন তাঁহার অভ্যর্থনায় মহারাজাকে বিশেষ সম্মানের কার্য্য ও স্থান দেওয়া হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ও মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ব্যতীত অন্য কোন রাজা মহারাজাকে তত্তুল্য সম্মান দেওয়া হয় নাই। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাট ভবনে মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় ও সম্রাজ্ঞী মহোদয়ার এক রাজ সভা হইয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর দিনাজপুরাধিপতি গিরিজানাথকে সম্রাটের নিকট বিশিষ্টরূপে পরিচিত করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে মহারাজা গিরিজানাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রযত্নে ও বিশেষ আনুকূল্যে উক্ত খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে হিন্দু-হোষ্টেল সংস্থাপিত হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এলাহাবাদ সহরে সমগ্র কায়স্থ সমিতির অধিবেশনে দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ সভাপতি পদ অলঙ্কৃত

করিয়াছিলেন। উক্ত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে মহারাজা গিরিজানাথ কে, সি, আই, ই, উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। দিনাজপুরবাসীর দুর্ভাগ্য ক্রমে গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২১ শে ডিসেম্বর রবিবার রাত্রি ৪—৪৫ মিনিটের সময় প্রায় ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দিনাজপুর সাহিত্য সভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার অভাবে উক্ত সভার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু আশা করা যায় যে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ রায় দ্বারা সে ক্ষতি বিশেষ ভাবে পরিপূরণ হইবে।

মহারাজা বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যানুরাগী, বিনয়ী, নিরহঙ্কারী, পরহিতৈষী, দানশীল এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি অত্র জেলাধীন রায়গঞ্জ হাই স্কুলের জন্য প্রায় দশ বিঘা ও দিনাজপুর নূতন হাইস্কুলের জন্য অন্যূন ছাব্বিশ বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন। অত্র জেলাধীন বীরগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য প্রায় আড়াই বিঘা জমি দান করিয়াছেন। রায়গঞ্জের দাতব্য চিকিৎসালয় মহারাজের সম্পূর্ণ ব্যয়ে চালিত হইয়া আসিতেছে এবং বীরগঞ্জের দাতব্য চিকিৎসালয়েও তাঁহার মাসিক সাহায্য আছে। দিনাজপুর গোশালার জন্য মহারাজা ন্যূনাধিক একশত বিঘা জমি দান করিয়াছেন। তিনি দিনাজপুর ধর্ম্মশালা যে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে ঐ স্থান ও তদুপরি ভগ্নইমারতের যে সমস্ত উপাদান ছিল তাহা সমস্তই উক্ত ধর্ম্মশালার জন্য দান করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত দিনাজপুর নূতন হাইস্কুল গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে মহারাজা প্রায় ২০,০০০৲ টাকা দিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তিনি গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যের পরিসমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। উক্ত মহাত্মা কলিকাতা দিনাজপুর ও নানাস্থানে সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন এবং সর্ব্বদা সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্রতী

থাকিতেন। তিনি শিল্প সমিতি, ক্রীড়া সমিতি, বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতিতে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি নীরবে যে কত দান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনি পরদুঃখে কাতর হইয়া তাহা মোচন জন্য দান করিতেন, লোক জানাইয়া নামের জন্য দান করিতেন না। ইহাই তাঁহার দানের বিশেষত্ব। তিনি শিল্প বিজ্ঞানের অনুরাগী ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। জন সাধারণের মধ্যে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি নানা প্রকারে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার গুণের একত্র সমাবেশ ছিল। কেবল দিনাজপুর জেলাই যে একটি রত্ন হারা হইয়াছে তাহা নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র বঙ্গদেশ একটি উজ্জ্বলতম রত্ন হারাইয়াছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সকলেই শোক সন্তপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহার ন্যায় মহাত্মাকে এতশীঘ্র হারাইয়া সকলেই ব্যথিত হইয়াছে। মহারাজা চির অশান্তির রাজ্য হইতে চির-শান্তিধামে গিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার আত্মাকে চিরশান্তিতে রাখুন এবং তাঁহার পরিবার বর্গের উপর আশীষ বর্ষণ করুন।

ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মহারাজের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার সন্তানাদি না হওয়ায় শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন। সরকার বাহাদুর রাজপুত্র জগদীশ নাথকে মহারাজ কুমার উপাধি প্রদান করেন। ইনি তাঁহার স্বর্গগত পিতার সমস্ত গুণই পাইয়াছেন এবং অল্প বয়স হইতেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার অমায়িক ভাব, নিরহঙ্কারিতা ও সকলের সহিত সৌহার্দ্য প্রভৃতি গুণ দর্শন করিয়া মনে হয় তিনি সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার স্বর্গগত পিতার আদর্শ অনুসরণ করিতে এবং দিনাজপুর রাজ বংশের গৌরব অক্ষুন্ন

রাখিতে পারিবেন । সে সাধনায় ইনি সিদ্ধিলাভ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা ।

স্বর্গীয় মহারাজার প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে এবং তাঁহাকে অনন্ত কাল অক্ষয় অমর করিয়া রাখিবে । দিনাজপুরের ইতিহাসে তাঁহার মহিমা জ্বলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া আছে এবং চিরকাল থাকিবে । তথাপি সকলের কর্ত্তব্য পালন ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন জন্য সাধারণের হিতকল্পে তাঁহার উপযুক্ত একটি চিরস্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য এবং তদুদ্দেশ্যে বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের ২রা তারিখ শুক্রবার অপরাহ্ন ৫ঘটিকার সময় দিনাজপুর জেলাবাসী জনসাধারণের একটী সভায় দিনাজপুর সহরে একটি টাউন হল নির্ম্মিত হওয়া স্থিরীকৃত হইয়া উক্ত সভাতেই ১০,০০০৲ টাকার উপর সংগ্রহ হইয়াছে ।

——:0:——

স্থানীয় সংবাদ ।

——:0:——

দিনাজপুর সভা—

সুখের বিষয় দিনাজপুর সভার জাগরণ হইয়াছে । ৮বৎসর পূর্ব্বে সমুদয় জেলাকে আহ্বান করিয়া যে অধিবেশন হইয়াছিল, তৎপর এই ১৩২৬ সালের ২০ শে চৈত্র তদ্রূপ অধিবেশন হইয়াছে । এবারে সভাপতি ছিলেন রাইগঞ্জের উকিল ও বহু সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ঘোষ । ২০ । ২১ শে চৈত্র দুইদিন সকাল বেলা নাট্য সমিতির গৃহে সভার অধিবেশন হইয়াছিল । প্রথম দিন অভিভাষণাদি পাঠেই যায় । সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে উকীল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক গম্ভীরস্বরে জাতীয় সঙ্গীত " বন্দেমাতরম " গীত হয় । সমবেত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন

করেন। ২১ শে তারিখে সকাল বেলা কতিপয় বালিকা কর্তৃক " আমার জন্মভূমি " সঙ্গীতটী গীত হইবার পর সভার কার্য্যারম্ভ হয়। সভায় অনেকগুলি মন্তব্য পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রথম মন্তব্য ৺ মহারাজা বাহাদুর এবং সভার সভ্য ৺ললিতচন্দ্র সেন, ৺জহিরুদ্দীন আহাম্মদ ও ৺রাধাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়দিগের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ মন্তব্য পরিগ্রহণ করেন। খেলাফৎ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। বাস্তবিক বলিতে কি, এই খেলাফৎ ব্যাপার আমরা এখনও ভাল বুঝিতে পারি নাই। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের মতে শাসনাধিকার পরিচালনে যে সকল সাম্রাজ্য অক্ষমতা দেখাইয়াছে তাঁহাদের প্রতি আত্ম-নির্দ্দেশের (Self-determination.) নীতি প্রয়োগ করা হইবে। স্থূল কথায় বলিতে, তুর্ক সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষের প্রজাবৃন্দ যদি সুলতানের শাসনের পরিবর্ত্তে অন্যরূপ শাসন চাহে তবে তদ্রূপ শাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইউরোপীয় মহাসমরের প্রসঙ্গে এই যে আত্ম নির্দ্দেশ নীতি প্রকটিত হইয়াছে, ঠিক এই নীতি যদি সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা হয়, তবে ইহার বিরুদ্ধে বক্তব্য থাকিতে পারে না। কিন্তু মার্চ্চ মাসের ইংরাজী কাগজে বিলাতের ওয়ার্ল্ড (The World,) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণে উদ্ধৃত " The British Government favoured the entire expulsion of the Turk form Europe, the internationalisation of Constantinople and the Dardanelles and the relegation of the Sultan to the new capital of Broussa in Asia Minor. The French, on the other hand, who have large commercial

interests in Turkey have always wished to maintain the integrity of the Ottman Empire. As the result of last weeks' deliberations in Downing street it was agreed to defer so far to the French view as to permit the Sultan to remain in Constantinople, but to disarm the city entirely and to throw open the Dardanelles under the administration of a joint commission of the Allied Powers". এই অংশ পাঠে মনে হইতে পারে যে তুর্ক সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট হয়তো ভিন্ন ব্যবস্থার অভিলাষী। কিন্তু উদ্ধৃত অংশ যথার্থ ঘটনা প্রকাশক হইলেও, বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অসাধু উদ্দেশ্য আরোপ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের উক্ত অভিমত প্রকাশ আরও কোন ২ গবর্ণমেণ্টের মতের প্রতি অপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে হইতে পারে। যাহাই হউক খিলাফৎ প্রসঙ্গে অনেক সভাতে এরূপ বলা হইতেছে যে গভর্ণমেণ্টে যে অনুনয় বিনয় করা হইতেছে, যদি তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত না করেন তবে রাজভক্তি রক্ষা করা প্রজাপক্ষে কঠিন হইবে। আমরা এরূপ ভাষা ব্যবহারে দুঃখিত তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সমবেত শক্তিপুঞ্জ যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেন সে সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন প্রতিশ্রুতিবিশেষ সম্পূর্ণ প্রতিপালিত করা এক্ষণে সম্ভবপর নাও হইতে পারে। তুরস্ক সাম্রাজ্যের সহিত মীমাংসা একা বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের হাতে নহে। উক্ত গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে খেলাফতের অনুকূলতায় যে যথোচিত করা হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট যে অনবরত

নহেন ইহা আমরা বিশ্বাস করি। এক্ষেত্রে উত্তেজক ভাষা ব্যবহারে হানি ভিন্ন লাভ নাই ইহাই আমাদের ধারণা। বিহিত আন্দোলন হইতে থাকুক, কিন্তু যাহাতে বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত না হয় ইহা দেখা উচিত। মহাত্মা গান্ধি কর্তৃক খেলাফৎ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলেও এই আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে।

স্ত্রীজাতির ভোট দানাধিকার সম্বন্ধে একটি মন্তব্য রাইগঞ্জের ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরকালী সেন আবেগ পূর্ণ ভাষায় উপস্থিত করেন। এ প্রস্তাবের অনুমোদন ও সমর্থন হইলে উকীল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র নিয়োগী এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলিবার জন্য উঠেন। কিন্তু তখন বিরুদ্ধ মন্তব্য উপস্থিত করা যাইতে পারে না বলিয়া সভাপতি তাঁহাকে বাধা দেন। যাহা হউক অবশেষে এই সম্বন্ধে হাত উঠাইয়া ভোট গ্রহন করিলে দেখা যায় যে জন ২৫ প্রস্তাবের বিরোধী, তদপেক্ষা কয়েকজন মাত্র বেশী (সম্ভবতঃ ৫।৭ জন কি কিছু বেশীও হইতে পারে) প্রস্তাবের সাপক্ষে এবং ন্যূনাধিক ৫।৬০০ সভাপূর্ণ সভার অবশিষ্ট সভ্যগণ নিরপেক্ষ বটেন। এই ভাবে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। যাঁহারা সাপক্ষে হস্তোত্তলন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিলাতী ও আমেরিকার সমাজ নীতি এবং তত্তৎদেশের স্ত্রীজাতি পুরুষের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার লাভ চেষ্টায় সমাজের লাভালাভ কি হইয়াছে তাহা ধীর চিত্তে পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি।

ভারত শাসন সম্বন্ধীয় নববিধি প্রবর্ত্তন প্রসঙ্গের আলোচনায় জনৈক বক্তা বলিয়াছিলেন যে জমিদারের ও প্রজার স্বার্থ বিরুদ্ধ। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোত হস্তান্তরযোগ্য করণ প্রস্তাব উপস্থিত কালে শ্রীযুক্ত টঙ্কনাথ চৌধুরী ঐ উক্তির দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী

হইয়া শেষোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করাতে শেঞ্জা সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন ।

এখানে একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব এবং তৎসাপক্ষে এ জেলার পীড়া ও মৃত্যুর হার কমাইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে প্রস্তাব ডাক্তার শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত ঘোষ উপস্থিত করেন, সমর্থন করেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত রায় । সমবেত চেষ্টাতে অসাধ্য সাধনও হইতে পারে, তাহা স্বীকার্য্য । তথাপি এখানে একটা মেডিকেল স্কুল স্থাপন যে অদূর ভবিষ্যতের মধ্যে সম্ভবপর তদ্বিষয়ে বক্তাগণের বিশেষ উৎসাহ বুঝা গেল না । বিনা পয়সায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিবার কথা হইয়াছিল । কিন্তু মেডিকেল স্কুলের আশায় থাকা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় এ সহরে খুলিলে তদ্বারায় জেলাবাসীর অধিকতর উপকার হইবার সম্ভাবনা কিনা এ বিষয়ে আদৌ আলোচনা হয় নাই । অল্প পয়সায় সুস্থ ও নীরোগ থাকিবার ইচ্ছা করিলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ছাড়া অন্য উপায় নাই । হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ হইলেও ঐ চিকিৎসা করিতে মাথা অনেক ঘামাইতে হয় । শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে অধিক সংখ্যক মেডিকেল কলেজ স্থাপনের বিরোধী কলেজের পাশ করা ডাক্তারগণ স্বয়ং । তাঁহারা এই বলেন যে এত পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকারে শিক্ষালাভ করিয়া যদি উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাওয়া গেল, তবে কিরূপে তাঁহাদের পোষাইবে ? দেশ দরিদ্র, কলেজের পাশকরা ডাক্তারদের মফঃস্বলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রাপ্তির প্রত্যাশা নাই । সুতরাং তাঁহারা মেডিকেল কলেজের পরিবর্ত্তে বরং মেডিকেল স্কুলের সংখ্যাধিক্য দেখিতে ইচ্ছুক । সারদা বাবু বলিয়াছেন যে মফঃস্বলের ডাক্তার ও পরিদর্শকগণের যাহাতে কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মে

এবং তাঁহাদের দ্বারা স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারিত হয় ইহা করিতে হইবে। কিন্তু এ যাবৎ যাহা আমরা দেখিয়া আসিতেছি তাহাতে কর্ত্তব্য জ্ঞান সহজে উদ্বুদ্ধ হইবে না। নির্দ্দিষ্ট কার্য্য (routine work) করাই অধিকাংশ ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়াছে, তাহাতে ভাব ও চিন্তার সমাবেশ আদৌ নাই, ইহা আমরা অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি। একমাত্র উপায় উপর ওয়ালারা যদি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের মধ্যে ভাব ও চিন্তার সমাবেশ দেখিয়া লয়েন এবং যদি তাহার উপর কর্ম্মচারীর উন্নতি অবনতি নির্ভর করান। কিন্তু জেলার সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী দিগের মধ্যে ইহার অভাব বহুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আমরা দুঃখিত। বারান্তরে ভূম্যধিকারী, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর উদাসীনতা বিষয়ে আমাদের বলিবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত রায়, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত ঘোষ এই তিন ডাক্তার বাবুদের লইয়া একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারিবেন। দেখা যাউক কি হয়।

সভাপতি কুলদা বাবু অভিভাষণে ও ডাঃ যামিনী বাবু বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে ডাঃ বুকানন হামিল্টনের সময়ে দিনাজপুর জেলায় লোক সংখ্যা ৩০ লক্ষ ছিল, এক্ষণে ১৭ লক্ষেরও কম লোক। লোক সংখ্যা কমিতেছে ইহাই বক্তাদ্বয়ের দেখাইবার উদ্দেশ্য। কিন্তু ডাঃ বুকানন হামিল্টনের প্রদত্ত সংখ্যা আনুমানিক মাত্র, তখন সেন্সস হয় নাই। মহাদেবপুর একটী গোটা থানা এ জেলা হইতে বাহির হইয়া রাজসাহীর সামিল হইয়াছে। এই দুই ঘটনা মনে রাখিয়া লোক সংখ্যার তুলনা করিলে কিরূপ দাঁড়াইত তাহা দেখিলে হইত। আগামী সংখ্যায় কুলদাবাবুর অভিভাষণ প্রকাশিত হইবে; পাঠকগণ তাহা পাঠে আনন্দ লাভ করিবেন।

মহারাজ স্মৃতি রক্ষা—

২০শে চৈত্র সন্ধ্যায় মুসলমান শিক্ষাসমিতি প্রভৃতির জন্য নির্মিত বিস্তীর্ণ মণ্ডপে স্বর্গগত মহারাজা বাহাদুরের স্মৃতিরক্ষা করে একটী মহতী সভা হইয়াছিল। মালদুয়ারের শ্রীযুক্ত টঙ্কনাথ চৌধুরী ঐ সভায় সভাপতি হন। ৺মহারাজা বাহাদুরের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সকলেই একমত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্মৃতি চিহ্ন কিরূপ হইবে তাহা লইয়া বেশ তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিল, ঐ তর্ক বিতর্ক কখনও ভদ্রতার সীমাও অতিক্রম করিয়াছিল। অবশেষে মেডিকেল স্কুল করার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়া টাউন হল নির্ম্মাণের প্রস্তাবই পরিগৃহীত হইয়াছে। ন্যূনাধিক দশহাজার টাকা চাঁদা, সভাক্ষেত্রে উঠিয়াছে বা তাহার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

দিনাজপুর পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে সভাস্থলে স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের কিঞ্চিয়ূন ৬০০ খানা প্রতিকৃতি বিতরণ করা হইয়াছিল।

মুসলমান শিক্ষাসমিতি, মোসলেম লীগ ও আহলে হাদিস—

প্রাদেশিক মোসলেম লীগের অধিবেশন এবার যশোহরে হইতেছিল। তথাতে অর্দ্ধ অধিবেশনান্তে দিনাজপুরের মুসলমান অধিবাসীগণের আগ্রহাতিশয্যে এবারকার অধিবেশনের অবশিষ্ট কার্য্য দিনাজপুরে সম্পন্ন করা স্থির হয়। স্থানীয় অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের জায়গায় নাট্য-সমিতির গৃহের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দর্শক ও প্রতিনিধি প্রভৃতির জলযোগের জন্য দোকান পাটও বসিয়াছিল। ২০।২১শে চৈত্র দুইপ্রহরের পর শিক্ষাসমিতির অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত মৌলবী আব্দুল

করিম বি, এ, পেন্সন প্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর। মুসলমান শিক্ষাসমিতির প্রাণ শ্রীযুক্ত মৌলবী ওয়াহেদ হুসেন বি, এল ও মুসলমান সমাজের বহুঅগ্রণী ঐ অধিবেশন উপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন। মৌলবী আব্দুল করিমের অভিভাষণ অতি উপাদেয় ও শিক্ষনীয় হইয়াছিল। মোসলেম লীগের অধিবেশন ২২ শে চৈত্র সকাল বৈকাল দুই বেলাতেই হয়। তাহার সভাপতি ছিলেন উক্ত মৌলবী সাহেব। কিন্তু ২২ শে তারিখে অপরাহ্ন ৪—৫০ মিনিটের গাড়ীতে তিনি চলিয়া যাওয়ায় অবশিষ্ট সময় টুকুর জন্য মৌলবী ওয়াহেদ হুসেন সভাপতির কার্য্য করেন।

আহলে হাদিসের অধিবেশন ২৩।২৪ শে চৈত্র সকাল বেলা একই মণ্ডপে হইয়া গিয়াছে।

পর্ব্ব উপলক্ষে গো-হত্যা অবশ্যকরণীয় বলিয়া মুসলমান শাস্ত্রে নির্দ্দেশ নাই লীগের এক অধিবেশনে তদ্বিষয়ে জনৈক বক্তা উর্দ্দু ভাষায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষাসমিতি, লীগ ও আহলে হাদিস সকল সভা-সমিতিতেই হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর মিলিয়া মিশিয়া দেশের কার্য্য করার চেষ্টা দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যাহাতে হিন্দুর মনে কোনরূপ আঘাত না লাগে সে বিষয়ে মুসলমান বক্তা ও উৎযোক্তাগণ বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। এই ভাবে মিলিয়া মিশিয়া উভয় জাতি দেশের কল্যাণ এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে থাকুক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

কৃষি বিষয়ক ও দেশের অবস্থা বিষয় বক্তৃতা সভা—

সভা ও বক্তৃতাদির এখানে চূড়ান্ত হইয়াছে। অনেক সময় সভাসমিতির কার্য্য খানাপিনাতেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু মুসলমান শিক্ষাসমিতি বস্তুতঃ দেশের প্রকৃত কল্যাণ করিতেছেন। এবং দিনাজপুরের অধিবেশনে অধি-

বাসীদের মধ্যে জাগরণ ভাব আনয়ন করিয়াছে । উক্ত সমিতির সম্পাদক মৌলবী ওয়াহেদ হোসেনের উৎযোগে মুসলমান শিক্ষাসমিতির মণ্ডপে ২৯ শে চৈত্র সন্ধ্যায় কৃষি বিষয়ক একটী সভার অধিবেশন হয় । স্থানীয় অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন ঐ সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন । দিনাজপুর সভা (জন সভা)র জন্য কেদার বাবু যেরূপ শ্রম করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জমিদার হইলেও উপযুক্ত ব্যক্তিকেই ঐ সভার সভাপতি পদে মনোনীত করা হইয়াছিল । কেদার বাবু একটী সুলিখিত ক্ষুদ্র অভিভাষণ পাঠ করেন । মৌলবী ওয়াহেদ হোসেনের বক্তৃতা সুন্দর হইয়াছিল । তিনি জমিদার ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব রাখিয়া প্রজার অধিকার লাভ করিবার দাবি করিয়াছিলেন । কিন্তু পরবর্ত্তী কোন কোন বক্তা অতিশয় উত্তেজিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন । তাঁহাদের মতে প্রজার যেন লড়াইয়ের কাজেই থাকা উচিত । উত্তেজনার বশে কোন কোন বক্তা আইনের, বিধানের কদর্থ করিয়াছেন । এথাতে কোন মোকদ্দমায় জমার টাকায় ।৶০ কি তদতিরিক্ত বৃদ্ধি ডিক্রী হয় নাই । ন্যূনাধিক চারি আনার বৃদ্ধির ডিক্রী হইয়াছে বটে কিন্তু ১৩২৪ সালে চাউলের বাজার সস্তা যাওয়ায় ঐ পরিমাণ বৃদ্ধিও এক্ষণে পাওয়া [illegible] নহে । দশ বৎসরে গড় করিয়া পরবর্ত্তী ১০ বৎসরের গড়ে যে বৃদ্ধি মূল্য পাওয়া যায় তাহার ½ অংশ বাদ দিতে হয় ½ অংশ নহে । কৃষক যদি নিজে জমির উন্নতি করে তজ্জন্য খাজানা বৃদ্ধির কারণ হয় না । কিন্তু উত্তেজনায় ভাষায় এবং বহুসংখ্যক কৃষিজীবিকে অন্যরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।

শ্রীযুক্ত মৌলবী মজিবুর রহমান "মুসলমান" পত্রের সম্পাদক । এই কৃষি বিষয়ক সভার একজন প্রধান অনুষ্ঠাতা । অতঃপর তাঁহার ও মৌলবী

ওয়াহেদ হোসেনের চেষ্টাতেই অন্য জেলাতেও অনুরূপ সভা হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। যাহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব বজায় থাকিয়া উভয় শ্রেণীর উন্নতি হয় ও সেই নীতি যাহাতে "মুসলমান" পত্রের অবলম্বন হয় ইহাই আমাদের অনুরোধ।

২৩ শে চৈত্র উক্ত মণ্ডপে দেশের অবস্থা বিষয়ে শ্রীযুক্ত মৌলবী আক্রম হুসেন জ্বলন্ত ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। মৌলবী সাহেব "মোহম্মদী" পত্রের সম্পাদক।

রেজিষ্টরী অফিসে মৃত্যু—

একটী পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক তাহার উপপতিকে সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া ১৪ই চৈত্র সদর রেজিষ্টরী আফিসে ঐ উইল রেজিষ্টরী করিতে গিয়াছিল। ঐ উইল সম্পাদন স্বীকারের পরক্ষণেই তাহার রক্ত বমন হইয়া অল্পকাল মধ্যেই আফিস গৃহে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

শোক সংবাদ—

৺ বজলল রহমান খাঁ সাহেব অত্রত্য জেলাস্কুলের শিক্ষকতা করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ৪বৎসর বাত ব্যাধিতে শয্যাগত ছিলেন। ৩রা বৈশাখ মধ্যরাত্রিতে তিনি অমর ধামে গমন করিয়াছেন। যদিও তাঁহার অকাল মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু স্থানীয় মুসলমান সমাজের তাঁহার ন্যায় একজন নেতার বিয়োগে আমরা দুঃখিত। ৺ খাঁ সাহেব অনেক দিন মিউনিসিপাল কমিশনার, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

মিউনিসিপালিটী—

কমিশনার ৺ হেসার মহম্মদের স্থলে বাই ইলেকসনে ঘুঘুডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত মহীউদ্দিন চৌধুরী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

প্রেরিত—

সদনুষ্ঠান—থানা চিরিরবন্দর অধীন বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কাজি মহাম্মদ সাহা তাঁহার বাটীর প্রাঙ্গণে ভূষি ও সুন্দরপুর সড়ক রাস্তার দক্ষিণ ধারে,

প্রায় ১০০০্ এক হাজার টাকা ব্যয়ে একটী সুদীর্ঘ দিঘী প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। কার্য্য খুব তাড়াতাড়ি চলিতেছে। আশা করি এখানে সুদূরাগত পথিক ও পল্লিবাসীবৃন্দের পানীয় জলের অভাব মোচন হইবে। এই অভাব ও মন্বার্ন্তের দিনে উক্ত মহাশয় যে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া এই ধর্ম্ম কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন; তাহাতে আমরা বড়ই সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছি। এবং তাঁহার এই সদনুষ্ঠানের জন্য আমরা জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল সর্ব্বদাই প্রার্থনা করি[illegible]

[illegible] ইদানীং এখানকার লোকের স্বাস্থ্য একরূপ ভাল। বিগত ফাল্গুন মাসের প্রথম হইতে এখানে ম্যালেরিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সেই সময়ে ইহার আশপাশ গ্রাম সমূহে প্রায় ১০।১২ জন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মারা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রামের [illegible] পশুর স্বাস্থ্য তত ভাল নহে। গো-বসন্ত রোগের জের এখনও সম্পূর্ণ মিটে নাই। পাড়াগাঁয়ে কোন কোন গৃহস্থদের বাড়ীতে এখনও গো বসন্ত রোগ হইতে দেখা যাইতেছে। একেই চৈত্র মাস, গৃহস্থদের প্রধান শস্য পাট; ও ধান বপন ও রোপণের একমাত্র সময়, তাহাতে এই নিরাশ্রয় কৃষকদিগের হালের গরুর কি ভীষণ দুর্দ্দশা। সুতরাং এস্থলে অনেক কৃষক মাথায় হাত দিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে। এদিকে খাদ্য দ্রব্যেরও মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে চাউল ৮০ বাইটের ওজনে ৪॥ টাকা মণ চলিতেছে। পাটের দর আদৌ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরিষার কাটাই মাড়া পর্য্যন্ত শেষ হইল, তথাপি তেলের দর একটুকু পড়িল না। এখনও বাইটের ওজনে টাকায় ✓১ সের তৈল বিক্রয় হইতেছে। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে তৈল, একটী নিত্য ব্যবহার্য্য ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিস, সুতরাং তৈলের দায়, গৃহস্থদের এক প্রকার যন্ত্রণাদায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই নবযুগের প্রারম্ভে কি দ্রব্যাদিরও দুর্দ্দরের সৃষ্টি হইল, জানি না, মহামায়ার কি ইচ্ছা।

—:0:—

দিনাজপুর পত্রিকা।

(মাসিক)

সপ্তবিংশতি ভাগ } জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭। { ১ম সংখ্যা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাসন্তী পূজা।

—:*:—

দুঃখের পর সুখ, ক্লেশের পর আনন্দ, সংযম বন্ধনের পর মুক্তি, জগতে দুঃখসুখাদির দ্বন্দ্ব এই রূপেই চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে। মানব জীবনে যেরূপ এই নিয়মানুসারে কার্য্য হইতেছে, সমস্ত বিশ্বেও তাহাই হইতেছে গ্রীষ্মের পর বর্ষ, বর্ষার পর শরৎ ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে বিপরীত ভাবাপন্ন ঋতুগণ এক এক করিয়া বিশ্বের বিরাট দেহে বীরখেলা খেলিয়া যায়। ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই যে বৎসর বৎসর ষড় ঋতু আসে যায়, ইহার মধ্যে

প্রকৃতি হইবার মাত্র হাসিয়া উঠিবার অবসর পান। বিশ্বমাতার অক্ষয় ভাণ্ডার। অনন্ত ধনরত্নাদি সে ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছে। জননী যেমন কঠোর তপের জ্বালা সহ্য করিয়া দশমাস ধরিয়া একটু একটু করিয়া স্বীয় গর্ভে সন্তানদেহ গঠন করিয়া অবশেষে তাহাকে বিশ্ব সমক্ষে উপস্থিত করেন বিশ্বমাতাও তদ্রূপ কর্ষণ ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে একটু একটু করিয়া বিশ্ববাসীর আহার্য্য দ্রব্য জাত বাহির করিয়া দেন। এই ব্যাপারের জন্য গ্রীষ্ম এবং বর্ষায় তাঁহার সূর্য্যোত্তাপ এবং বৃষ্টিধারায় পুড়িয়া ও ভিজিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। হেমন্ত এবং শীতে আবার পর বৎসর বর্ষণের জন্য অপূর্ব্ব কৌশলে জলরাশি সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়। এই দুই মহাকর্ম্মের মধ্যে ধরিত্রী দেবী দুইবার মাত্র বিশ্রামের অবসর পান। শরতে গ্রীষ্ম বর্ষা ও হেমন্ত শীতের সন্ধিস্থলে আর বসন্তে, শীত গ্রীষ্ম দুই বিপরীত তাপাপন্ন ঋতুর সন্ধি স্থলে। এই দুই বিশ্রামের সময়ে বিশ্ব জননী তাঁহার অনন্ত ধন, জ্ঞান, শক্তি, সিদ্ধি সৌন্দর্য্য ইত্যাদি লইয়া সন্তানগণের সম্মুখে উপস্থিত। জননী যেমন গৃহ-কর্ম্মের অবসরে এক একবার সন্তানগণের তত্ত্ব লেন, তেমনই বিশ্ব জননীও এই দুই অবসরে সন্তানগণের তত্ত্ব নিতে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতে ঘরে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হন। মায়ের আগমনে তখন দিগ্বিদিক হাসিয়া উঠে। মায়ের পূজা আরম্ভ হয়। ইহাই মায়ের শারদীয়া ও বাসন্তী পূজা। এ পূজা করিতে মায়ের প্রত্যেক সন্তান বাধ্য। কারণ মা যদি গৃহদ্বারে আশীষ দিতে আসিয়া অনভ্যর্থিত হইয়া ফিরিয়া যান, তবে যে সন্তানকে অমঙ্গল স্পর্শ করিবে। মায়ের আশীষ না পাইলে সন্তান

যে চলিতেই পারিবে না। মেঘের জল যাহার মত মায়ের করুণা যে সর্ব্বত্রই সমভাবে বর্ষিত হইতেছে। সে করুণাধারা ধারণ করিবার উপযোগিতা থাকা চাই। তবেই সে করুণা সলিলে সিক্ত হইয়া বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে পারা যাইবে। আর সে করুণাধারা ধারণ করিতে না পারিলে, সে ধারা সঞ্চিত অসময়ের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিতে না পারিলে হৃদয়ের সব সরসতা যে শুকাইয়া যাইবে, হৃদয় দগ্ধ মরুভূমি হইয়া যাইবে। সেই জন্য মা যখন আশীর্ব্বাদিনী রূপে আমাদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ান, তখন তাঁহাকে যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিতেই হইবে। তাই আজ ছোট বড় ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই এ পূজায় যোগ দিতেই হইবে, এ পূজা করিতেই হইবে। এ পূজা শুধু মূর্ত্তিপূজা নয়, এ যে বিশ্বজননীর বিরাট মূর্ত্তির পূজা। ইহা ত ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক সম্পন্ন হইবার পূজা নয়। এ পূজায় যে ছোট বড় সকলকেই মিলিতে হইবে। মার কাছে ত ছোট বড় ভেদ নাই। আজ যে তিনি আশীষ বিতরণ করিতে, শক্তিদান করিতে আসিয়াছেন। যাহারা মাকে ভুলিয়াছিল, একান্ত মনে সংসারে লিপ্ত হইয়া যাহারা মাকে ভাবে নাই, কর্ত্তৃত্বাভিমানের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যাহারা বিশ্বের সর্ব্বত্র নিজের কৃতকার্য্যতা অকৃতকার্য্যতা, কর্ত্তৃত্ব'কর্ত্তৃত্ব দেখিয়াই মুগ্ধ ও বিমূঢ় হইয়াছে, কিন্তু নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্র মায়ের অপূর্ব্ব করসঞ্চালন দেখিতে পায় নাই, মায়ের প্রেরণায় চালিত হইয়া কার্য্য করিয়াও যাহারা কেবল "আমিই করিয়াছি" ভাবেই মত্ত রহিয়াছে, বিষয় বিনাশে মায়ের গচ্ছিত ধন মাই গ্রহণ করিলেন ইহা না ভাবিয়া 'আমার জিনিস গেল' ভাবিয়া যাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া মাকে পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার দোষে অভিযুক্ত

করিয়াছে, আবার সেই বিষয় লাভে "মা গচ্ছিত রাখিলেন" অথবা কর্ত্তব্য সাধনের পুরস্কার স্বরূপ ব্যবহার করিতে দিলেন" ইহার পরিবর্ত্তে "আমি লাভ করিলাম" "সহস্র চেষ্টায় অর্জ্জন করিলাম" এই অভিমানের ঘোরে পড়িয়া যাহারা মাকে ভুলিয়া গিয়াছে, মৃত্যুতে "মায়ের কোলে স্থান পাইল" এই জ্ঞানের পরিবর্ত্তে, "আমাদের একজন নষ্ট হইল" এই শোকে যাহারা অভিভূত হইয়াছে, জন্মে "মায়ের সেবক, মায়ের দাস স্বীয় কর্ত্তব্য মাতৃকার্য্য বিশ্ববিধান সম্পন্ন করিবার জন্য আসিয়া আমাদিগকে সঙ্গী করিয়া এবং আমাদের সঙ্গী হইয়া আমাদের বলবৃদ্ধি করিয়াছে" ইহা বিস্মৃত হইয়া "আমাদের সন্তান জন্মিল" এই মনে করিয়া যাহারা উৎফুল্ল হইয়া, মায়ের দানকে নিজেদের পৌরুষের ফল বিবেচনা করিয়া মত্ত রহিয়াছে. সংসারের খেলা ধূলায় একান্তই মত্ত হইয়া মাকে আর যাহারা মনেই করে না, সংসারের ধূলিতে কাদায় যাহারা নিতান্তই মলিন হইয়াছে, সংসারের কণ্টক পথে স্বেচ্ছাগত বিচরণ করিতে যাহাদের পায়ে অনেক সুতীক্ষ্ণ কাঁটা ফুটিয়া যাহারা নিতান্তই বিকল হইয়া পড়িয়াছে, মোহবশে বৃথা সুখের আশায় ছুটিতে ছুটিতে যাহারা সংসারে আছাড় পড়িয়া খঞ্জ হইয়াছে, বিপথে ছুটিয়া পথহারা হইয়া যাহারা মায়ের মঙ্গল মন্দির হইতে বহুদূরে যাইয়া পড়িয়াছে এবং শত চেষ্টা করিয়াও আর মায়ের শান্তি-সৌধ-মঙ্গল-কেতু দেখিতে এবং মায়ের মন্দির পানে যাইতে পারিতেছে না, মা যে আজ আপনিই তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। যাহারা মাকে ভুলিয়াছে তাহাদিগকে 'আমি আছি' এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে, যাহারা শোকাপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের শোক অপনোদন করিতে, যাহারা মলিন হইয়াছে তাহাদের ধুলা ঝাড়িয়া দিতে, যাহারা বিকল ও পঙ্গু হইয়াছে তাহাদের বিকলতা ঘুচাইতে,

যাহারা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত, তাহাদের ক্ষত আরাম করিয়া দিতে, পথহারা-দিগকে পথ দেখাইয়া দিতে, অন্ধকে চক্ষু দিতে, অন্ধকারে আলো দিতে, ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে অন্ধ যাত্রীর সম্মুখে তাঁহার দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরিতে, সকল বন্ধন মোচন করিতে, সকল দুঃখ ঘুচাইতে, সকল বেদনার শান্তি দিতে, সকল নিরানন্দের অবসান করিতে, আজ মা আপনি আসিয়াছেন, শান্তিময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী, জ্ঞানময়ী, ঐশ্বর্য্যময়ী, শক্তিময়ী, সিদ্ধিময়ী, সত্বময়ী আনন্দময়ী মা আজ অযাচিত করুণা বিতরণ করিতে আপনিই আসিয়াছেন। আজ ত আর কোন দুঃখ নাই, অভাব নাই, ভাবনা নাই, এবং থাকিবার কথা নয়। আজ যে সকল অভাবের অবসানরূপী মা দুয়ারে; তাকে অভ্যর্থনা করিয়া অমন অযাচিত স্নেহ, করুণা, আশীষ বিতরিণী মাকে, তাঁহারই সন্তানের মত উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া, উপযুক্ত অর্চ্চনা পূজা করিয়া, বরণ করিয়া লইতে হইবে। তারপর মায়ের স্নেহ দৃষ্টির নিতান্তই উপলব্ধির মধ্যে মায়ের চরণ প্রান্তে বসিয়া আজ মায়ের আশীষ মাগিয়া লইতে হইবে। সে আশীষে সকল দুঃখ, বেদনা, মোহ, অভাব অবসান হইবে। তাই এ শুভ মুহূর্ত্তে মায়ের মহাপূজা করিতে হইবেই। ষোড়শোপচারে, মহাহোম, যাগযজ্ঞ বলি ইত্যাদির ঘটা করিয়া মায়ের পূজা করিতে হইবে। মায়ের পূজায় আজ মহাঘটা করিতে হইবে, সুমহৎ আয়োজন করিতে হইবে, অথচ দীন কাঙ্গাল যে জন তারও মায়ের পূজা করিতে হইবে। দীন যে জন কাঙ্গাল সে এত ঘটা করিবে কোথা হইতে? আর সংসারে কেই বা কাঙ্গাল নয়, জন্মে যে উলঙ্গ, নিরতিশয় অক্ষম, মৃত্যুতে যে ভস্মপরিণামী, সর্ব্বাপেক্ষা

নিজস্ব যে শরীর, তাহাও যার পঞ্চভূতের নিকট হইতে ধার করা, প্রকৃতি মাতার মুক্তহস্ততায় যাহার জীবন, সে কাঙ্গাল ব্যতীত আবার কি হইতে পারে, কাঙ্গাল হইতেও সে মহাকাঙ্গাল, সেই মানব দীনাধম জীবনে মরণে, চৌদ্দ পোয়া মাত্র মৃত্তিকার অধিকারী, বিশ্বের লঘুতম পদার্থ বায়ু যার জীবন, শক্তি যার মুহূর্তে নিভিয়া যায়, সে যদি কাঙ্গাল না হয়, তবে কে আর কাঙ্গাল আছে ? কাঙ্গালের কি ঘটা সম্ভবে ? কিন্তু তবু ঘটা করিতে হইবে। মায়ের অতুল সম্পদ ঐ কাঙ্গালের কাছে গচ্ছিত আছে, তাই দিয়াই ঘটা করিতে হইবে। মহাপূজা করিতে হইবে। কাঙ্গাল মানব কি দিয়া মায়ের পূজা করিবে, কি দিয়া ঘটা করিবে, এই সমস্যায় পড়িয়াই কাঙ্গালের সেরা কাঙ্গাল, কাঙ্গাল হরিনাথ গাহিয়াছিলেন :—

"শক্তিপূজা কথার কথা না।

যদি কথার কথা হ'ত, চিরদিন ভারত, শক্তি পূজে শক্তিহীন হত না ;

কেবল ঢাকের গমনায় ঢাকের বাজনায় শক্তি পূজা হয় না ; এক মনোবিল্বদল, ভক্তি গঙ্গাজল, (হৃদয়) শতদল দিলে হয় সাধনা ॥

দিতে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন, মা যে তাতে ভোলেন না ; কেবল জ্ঞান দীপ জ্বেলে একান্ত ধূপ দিলে, ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা ॥

বনের মহিষ অজা, মায়ের বাঞ্ছা, মা সে বলি লন না ; যদি বলি দিতে আশ স্বার্থ কর নাশ, বলিদান দাও বিষয় বাসনা ॥

কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাত বিচারে, শক্তি পূজা হয় না, সকল বর্ণ এক হয়ে ডাক মা বলিয়ে, নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না "

মায়ের পূজা করিতে গিয়া, মায়ের অপরূপ বিরাট রূপ দর্শন ধ্যান

করিয়া পূজকের প্রাণ কাঁদিয়া বলিতে থাকে :—

"কি দিয়ে পুজিব ব্রহ্মময়ী।

ব্রহ্ম হতে পরমাণু, সকলই তোমার অণু, তোমা ছাড়া অন্য বস্তু এ জগতে আছে কই ?"

মায়ের পূজা করিতে যাইয়া ভক্তবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন :—

"মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি,
জেনেও কি তা জান না ?

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস্, তাঁয়, দিয়ে ছারে ডাকের গহনা।

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা, ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস্, তাঁয় আলো চাল আর বুট ভিজানা।

জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাই কি জান না, ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগলছানা।"

মায়ের আজ মহাপুজা, মা আজ বহুরূপে, একাধারে অনন্তরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে। মাকে আজ শ্রেষ্ঠতম জিনিষ দিতে হইবে। আমাদের কি আছে, কি দিব, শ্রেষ্ঠতম উপহার এবং বলি কি, তাহা মায়ের সার্থক পূজক রামপ্রসাদ বলিয়া দিয়া গিয়াছেন :—

"মন তোর এত ভাবনা কেনে।

একবার মা মা বলে বস্‌রে ধ্যানে।

জাঁক জমকে করলে পূজা

অহঙ্কার হয় মনে মনে,

তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা

জান্‌বে নারে জগজ্জনে॥

ধাতু পাষাণ মায়ের মূর্ত্তি,

কাজ কিরে তোর সে গঠনে,

তুমি মনোময় প্রতিমা করি,

বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥

আলো চাল আর পাকা কলা

কাজ কিরে তোর আয়োজনে;

তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে,

তৃপ্ত কর আপন মনে॥

ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো,

কাজ কিরে তোর সে রোসনায়ে।

তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে

দেওনা জ্বলুক নিশিদিনে॥

মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে

তোর বলিদানে, তুমি জয় কালী জয় কালী

বলে বলি দাও ষড় রিপুগণে॥

প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল
কাজ কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি,
মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥

ভক্ত প্রবর মায়ের বিরাট প্রতিমার বিরাট পূজারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। গভীরতম ভক্তি, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সম্পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে মায়ের পূজা করিতে হইবে। মায়ের প্রতিমা যেমন বিরাট বিশ্বেরই অনুকল্প তেমনই উপযুক্ত পূজোপকরণগুলি দিতে হইবে। মায়ের পায়ে যে পুষ্প দিতে হইবে তাহা কেবল পুষ্প বলিয়া দিলেই হইবে না। হৃদয় উদ্যানের ভক্তি কুসুমের অনুকল্প স্বরূপে সে পুষ্প দিতে হইবে। মায়ের পায়ে যে চন্দন দিতে হইবে তাহা প্রেমচন্দনের অনুকল্প বলিয়া দিতে হইবে। ঐ পুষ্পচন্দনের সঙ্গে সঙ্গে যেন গাঢ়ভক্তি, অবিচলিত প্রেম মায়ের চরণে অর্পিত হয়।

এই হইল মায়ের অত্যুত্তম মানস পূজা। কিন্তু যাঁহারা যে মানস-পূজার অধিকারী নন, মায়ের প্রতিমা গড়িয়া নৈবেদ্য দিয়া, আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া বলি দিয়া, তাঁহারাও মায়ের পূজা করিবেন। মা সে পূজাও গ্রহণ করিবেন। প্রমাণ

বাসুদেবের উক্তি!—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
পত্রম্ পুষ্পম্ ফলম্ তোয়ম্ যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি
তদহম্ ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।

তাই উত্তম মধ্যম অধম অধিকারী ভেদে সকলকেই মায়ের পূজা করিতে হইবে। কিন্তু সকলেই স্ব স্ব উপযুক্ততা অনুসারে পূজোপকরণের বিধান করিবেন।

মায়ের পূজার পর বিজয়া মহোৎসব। পূজক মায়ের পূজা করিয়া অভীষ্ট বরলাভে যখন কৃতার্থ হইল মায়ের শুভাগমন আশীষ বিতরণের ফলে বিশ্বে যখন আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল—ছোট বড় সকলেই যখন সে স্রোতে ভাসিয়া চলিত তখন মহামিলন রূপ বিজয়োৎসব। তখন আর ভেদ বিচার নাই, তখন সকল জাতি এবং বর্ণ এক হইয়া শুধু প্রীতির কোলাকুলি এবং মা, মা বলিয়া ডাকা। এই বিজয়ার দিনে, নববলে বলীয়ান্ হইয়া ভারতীয় আর্য্যগণ নূতন উদ্যমে তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। আজ সেইদিনে সকল নিরুদ্যম নিরুৎসাহ হানি পরাজয় ভেদ বিষাদাদির কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া প্রীতির, আনন্দের উৎসাহ এবং জয়ের দীপক রাগিণী গাহিতে গাহিতে আমরা যেন আমাদের অসমাপ্ত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিতে চেষ্টিত হইতে পারি,—মঙ্গলময়ী মা আমাদের এই আশীর্ব্বাদ করুন।

* * *

জাতীয় সঙ্গীত।

(মহামান্য শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে—)

১

রাজ্য যাঁহার অর্দ্ধ মেদিনী, সাগর চুমে যাঁহার পায়,
গঙ্গা-জর্ডন-সিন্ধু-কাবেরী, নাইল- টেমস যাঁর গুণ গায়,
সেই বৃটিশের নৃপমণি গাওরে পঞ্চম জর্জ্জের জয়,
বিধাতা করুন তাঁরে দীর্ঘ আয়ু নিরাময়।

২

ইটালি মার্কিণ ফ্রান্স জাপান বন্ধু যাঁহার প্রাণের সমান,
প্রতাপে সেই তপন তুল্য ধরায় যাঁহার অতুল মান,
সেই বৃটিশের নৃপমণি গাওরে পঞ্চম জর্জ্জের জয়,
বিধাতা করুন তাঁরে দীর্ঘ আয়ু নিরাময়।

৩

সসাগরা ধরা হ'লে জর্ম্মাণ দর্পে কম্পমান,
কে করিল প্রাণপণ রাখতে জগৎবাসীর প্রাণ,
সেই বৃটিশের নৃপমণি গাওরে পঞ্চম জর্জ্জের জয়,
বিধাতা করুন তাঁরে দীর্ঘ আয়ু নিরাময়।

৪

জগদ্ব্যাপী সমর অনল যে করিল সুনির্ব্বাণ,
জর্ম্মাণ-দানব দলন করি ধরায় কর্‌লে শান্তিদান
সেই বৃটিশের নৃপমণি গাওরে পঞ্চম জর্জ্জের জয়
বিধাতা করুন তাঁরে, দীর্ঘ আয়ু নিরাময়

স্বর্গীয় মহারাজা সার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে, সি, আই, ই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেবী সিংহ—তৎকালীন দেয় করের উপর দুই লক্ষ টাকা চড়াইয়া দিয়া দিনাজপুর রাজ ষ্টেটের ইজারা লন। প্রজার প্রতি তাঁহার অত্যাচারের

রোমহর্ষণ কাহিনী মহামতি বার্ক সাহেব জ্বলন্ত ভাষায় পৃথিবীকে শুনাইয়া গিয়াছেন। অত্যাচার পীড়িত প্রজাগণ অনন্যোপায় হইয়া তাহাদের শিশু মহারাজার দোহাই দিয়া দলে দলে রাজধানী আসিতে লাগিল। চিরকাল পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত প্রজাগণ পক্ষে ইহা ত স্বাভাবিক। প্রজার আর্ত্তনাদ ইতিপূর্ব্বেই রাণী সরস্বতীর কর্ণে ধ্বনিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদিগকে অত্যাচার ক্লিষ্ট অবস্থায় সপরিবারে শরণাগত দেখিয়া প্রজাবৎসলা রাণীর কোমল হৃদয়ে মাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল। ব্রিটিশরাজানুগৃহীত ইজারদার দেবীসিংহের অত্যাচারের অন্য কোনরূপ প্রতীকার না দেখিয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণ কল্পে রাণী মুক্তহস্ত হইলেন এবং অর্থ, খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কবি গাহিয়াছেন "কেঁদো বাঘ পাড়াবত কলে, পাপ চাপিলে আপনি ফলে।" ইজারার মেয়াদ দুই বৎসর যাইতে না যাইতে আমলাগণ সহ দেবীসিংহ বন্দী হইলেন এবং প্রায় নয় বৎসর কারাবাসের পর ব্রিটিশরাজের ন্যায় বিচারে নানারূপে দণ্ডিত হইয়া দিনাজপুর জেলা হইতে চির নির্ব্বাসিত হইলেন। আমরা দেখিয়াছি যে অতঃপর রাজমাতুল জানকীরাম সিংহ রাজ্য পরিচালন করেন। দেবীসিংহের অমানুষিক অত্যাচারে দেশ জ্বলিয়া গিয়াছিল। বহু প্রজা সর্ব্বস্বান্ত, বহুলোক ধন মান রক্ষা জন্য হয় মৃত না হয় বিদেশগত হইয়াছিল। এইরূপে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য অবনতির চরমসীমায় উপনীত হওয়ায় জন্য জানকীরাম বাধ্য হইয়া বাদ

বহু মহল কম খেরাজে বন্দোবস্ত করিলেন। এই প্রকারে রাজ্যের আয় হ্রাস হইলেও ভূতপূর্ব্ব মহারাজগণের কীর্ত্তিকলাপ ও স্বানধর্ম্ম বজায় রাখিতে জানকীরাম সম্পূর্ণ সচেষ্ট ছিলেন। কাজেই হঠাৎ ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া উঠিতে না পারায় এবং দেবীসিংহের অত্যাচার পীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জের সাহায্যে পূর্ব্বসঞ্চিত ধন প্রায় নিঃশেষিত হওয়ায় তিনি সকলদিক রক্ষা করিতে গিয়া নিজে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন।

১৭৮৬ খৃঃঅব্দে মিঃ জি হ্যাচ্ দিনাজপুর রাজ্যের রাজস্বসচিব রূপে রাজস্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজকর চালাইতে লাগিলেন বটে; কিন্তু সদাব্রতে দান, আশ্রিত প্রতিপালন কুটুম্বস্বজনের ভরণ-পোষণ প্রভৃতি রাজ্যোচিত সমুদয় ব্যয় বন্ধ করিয়া দিলেন। ধর্ম্মাচরণ নিরতা স্নেহময়ী রাজমাতা নিজ হইতে এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া রাজধর্ম্ম কুলধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

রাজ্যের যখন এইরূপ অবস্থা তখন মহারাজ রাধানাথের উপর রাজ্য-ভার ন্যস্ত হইল (১৭৯২ খৃঃ অঃ)। রাজকার্য্যে অদীক্ষিত ষোড়শ বর্ষীয় মহারাজ রাজ্যের অবস্থা বুঝিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এই সময় রাজমাতুল জানকীরামের অন্তরঙ্গ ও পোষ্যবর্গ তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। রাজঅমাত্য রূপে রাজ্যের কল্যাণ চিন্তা করা দূরে থাকুক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহারা ক্ষতিকর কার্য্যই করিতে লাগিলেন। বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে গবর্ণর জেনেরলের আদেশ অনুসারে রামকান্ত রায় পুনরায় ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। যাহা হউক ১৭৯৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই রাধানাথ পুনরায় রাজ্যভার পাইলেন। কিন্তু এই সময় ৬৯, ৬৭৭, টাকা রাজকর বাকী পড়ায় বোর্ডের হুকুমে তাঁহার রাজ্যের

কিয়দংশ বিক্রীত হইল। যথা নিয়মে হয় নাই বলিয়া এই বিক্রয় সিদ্ধ হইল না। সিদ্ধ না হইলে কি হইবে? মারে রাম তো. রাখে কে? ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইল; প্রজার নিকট কর আদায় হইল না, রাজকর বাকী পড়িল ও মহারাজের ভূসম্পত্তি বিক্রয়দ্বারা তাহা আদায় হইল। ক্রমে এইরূপে লাটের পর লাট নিলাম হইয়া গেল। মহারাজা বহু চেষ্টা করিয়াও রাজ্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। তবে মহারাজা রাজমাতা সরস্বতী ও রাজরাণী ত্রিপুরাসুন্দরী নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাজ্যের কিয়দংশ ক্রয় করিলেন। ১৮০০ খৃঃ শেষ হইতে না হইতেই দিনাজপুর রাজ্য প্রায় ধ্বংস হইয়া আসিল। এদিকে রাধানাথ ঋণ দায়ে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় ১৮০১ খৃঃ ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমে কাল তাঁহাকে গ্রাস করিয়া তাঁহার সকল জ্বালা নিবারণ করিয়া দিল।

রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় সম্ভবতঃ মহারাজা রাধানাথের সময়ে রাজকর ১২৫০০০০৲ পর্যন্ত উঠে। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে ২৬৫০০০০৲ হয়। ইংরাজগণ কমাইয়া আঠার লক্ষ টাকা ধার্য্য করেন। ১৭৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত এই হারেই রাজস্ব আদায় হয়। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে ১৪৬০৪৪৪৲ ধার্য্য হয়। দেবীসিংহ ১৬৬০৪৪৪৲ টাকায় ইজারা লইয়াছিলেন। দশসালা বন্দোবস্তে প্রথম দুই বৎসর ১৪৪৪১০৭৲ ও তৎপর ১৪৮৪১০৭৲ ধার্য্য হয়। সমস্ত দিনাজপুর জেলায় রাজস্ব আঠার লক্ষের কম হইবে। এতদ্বারা দিনাজপুর রাজ্যের বিস্তৃতি অনুমেয়। বুকানন হ্যামিল্টন ও মার্টিন সাহেবের পুস্তক পাঠে এই রাজ্যের বিস্তৃতি তিন হাজার বর্গ মাইলেরও অধিক ছিল বলিয়া

জানা যায় ।

বিধির বিপাকে সুবিস্তীর্ণ দিনাজপুর রাজ্য এইরূপে বিধ্বস্ত হইল। উত্তর বঙ্গের মুকুটমণি অতিশয় আবর্ত্তন খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় এই উজ্জ্বল রত্নের এক এক খণ্ড লাভ করিয়া অনেকে জমিদার হইয়া গেলেন।

প্রতিকূল দৈবের সহিত যুদ্ধ করিয়া অল্পবয়সে অপুত্রক অবস্থায় মহারাজ রাধানাথের মৃত্যু হইলে তৎপত্নী মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী মহারাজ গোবিন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ করিলেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে গোবিন্দনাথ রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্ব পুরুষদিগের পুণ্যবলে ও দেবদ্বিজের আশীর্ব্বাদে বিক্রীত রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিতে ও রাজ্যমধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সমর্থ হন। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে গোবিন্দনাথ স্বর্গারোহণ করেন।

গোবিন্দনাথের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথ পিতা জীবিত থাকিতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় কনিষ্ঠ তারকনাথ রাজা হইলেন। ২৪ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে মহারাজা তারকনাথ ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী মহারাণী শ্যামমোহিনী ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে আমাদের সর্ব্বজন প্রিয়, প্রজাবৎসল, ধর্ম্মপ্রাণ, ঋষিপ্রতিম মহারাজ গিরিজানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন।

১৮৬২ খৃঃ অব্দের ২৮শে জুলাই তারিখে (১৭৮৪ শকাব্দা ১২ই শ্রাবণ) রবিবার চিরিরবন্দরের সন্নিকট দামুরগ্রামে এই মহাত্মা ভূমিষ্ঠ হন।

চারিবৎসর দশমাস বয়সে জন্মকালীন গ্রহনক্ষত্রাদির সংস্থানসূচিত রাজযোগফলে রাজসিংহাসনের অধিকারী হইয়া রাজমাতার লালন পালনে

বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। রাজমাতা অসামান্ত প্রতিভাশালিনী মহিলা ছিলেন। মহারাজ তারকনাথের দেহত্যাগের পর রাজ্য কোর্ট অব ওয়াডসের তত্ত্বাবধানে যাইতে না দিয়া স্বয়ং রাজ্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন এবং মহারাজা গিরিজানাথের রাজগদিতে আসীন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজজামাতা রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহের সহকারিতায় অতি সুশৃঙ্খলে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। প্রজার সুখসচ্ছন্দতার প্রতি ইহাঁর দৃষ্টি সর্ব্বদা আকৃষ্ট ছিল। দিনাজপুর সহরের ও তৎসন্নিহিত কয়েকটি গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ছয় মাইল দীর্ঘ কাচাই খাল ইনি বহু অর্থব্যয়ে খনন করান। গরীব দুঃখীর চিকিৎসা জন্য রাজধানীতে ও রায়গঞ্জে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। গুঁড়িপাড়া পুলের নিকট হইতে বাহির হইয়া বালুবাড়ী দিয়া যে প্রশস্ত রাস্তা রেল লাইন অভিমুখে গিয়াছে ইহার কিয়দংশ ইহাঁরই কীর্ত্তি। এই রাস্তা মহারাণী শ্যামমোহিনী রোড্ নামে পরিচিত। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের ভয়ানক দুর্ভিক্ষে ক্ষুধিতকে অন্নদান জন্য ইনি রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্র অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন; তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহারাণী উপাধি ও ৫০ জন সশস্ত্র অনুচর (Retainer) রাখিবার অনুমতি দিয়া সম্মানিত করেন। কেবল নিজ শাসন কালে প্রজার সুখশান্তির প্রতি দৃষ্টিতেই মহারাণীর কর্ত্তব্য পর্য্যবসিত হয় নাই। ভবিষ্যতে প্রজাগণ সুপালিত হইয়া যাহাতে উন্নতিলাভ করিতে পারে তজ্জন্য মহারাজ গিরিজানাথকে সুশিক্ষিত করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

—:*:—

ক্রমশঃ

স্থানীয় সংবাদ।

—:*:—

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ—

শ্রীযুক্ত রায় নিখিলনাথ রায় বাহাদুর দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি না আইসা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত বনমালী বাগছী মহাশয় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জি, বি, মখফোর্ড বাহাদুর পাকা জজ হইয়া আসিয়াছেন।

প্রথম মুন্সেফ—

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদরঞ্জন ধর আলিপুর বদলি হইয়াছেন। এক মাসের উর্দ্ধকাল প্রথম মুন্সেফী আদালতের হাকিম ছিলেন না। এক্ষণে শ্রীযুক্ত হংশ চন্দ্র সেন একটিং মুন্সেফ হইয়া আসিয়াছেন।

রেলওয়ের নামে মোকদ্দমা—

অত্রত্য উকীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহ ৬০০০৲ টাকা খেসারতের দাবীতে বর্ত্তমান সবজজ আদালতে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নালিশ দাখিল করিয়াছেন। হিলি ষ্টেশনের নিকটস্থ ফটকের গেটম্যানের ক্রটিতে ফটক খোলা থাকায় দার্জ্জিলিং মেলের সামনে তাঁহার গরুর গাড়ী পড়িয়া গিয়াছিল, গাড়োয়ান পার্ব্বতীপুর হাসপাতালে মারা গিয়াছিল, আশুবাবু গুরুতর আহত হইয়া অনেক দিন শয্যাশায়ী ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গ রেলকর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার সহিত মীমাংসা করিলেন না, সুতরাং এই নালিশ।

টাউন হল—

স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ টাউনহলের জন্য ইনষ্টিটিউটের দক্ষিণদিকস্থ (জেলখানার ফটকের প্রায় সামনের) জমি ২১০০৲ টাকা মূল্যে লওয়া স্থির হইয়াছে।

ভীষণ হত্যা—

বালুরঘাটের এলাকায় দুইটী ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। রাঙ্গামাটী হইতে বালুরঘাটের রাস্তায় ডাক রানারকে মাথায় গুরুতর আঘাতে মারিয়া ফেলিয়া দস্যুগণ ডাকের ব্যাগ লুট করিয়া লইয়াছে। প্রথমে শুনা গিয়াছিল যে ব্যাগে ৯০০০৲ টাকার ইনসিওর চিঠী ইত্যাদি ছিল। পরে ঐ পরিমাণের অনেক কম শুনা গিয়াছে। জনৈক মোহন্ত ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। তিনিও রাস্তাতে হত হইয়াছেন। ঘোড়ায় চড়া অবস্থাতেই সম্ভবতঃ প্রাণত্যাগ হইয়াছিল, কারণ জিনের উপরে মলনিঃসরণের চিহ্ন ছিল। দুর্ব্বৃত্তেরা পথিপার্শ্বের জঙ্গলে লাশ লইয়া ক্ষুর দিয়া কাটার মত পরিষ্কার ভাবে মাথাটী কাটিয়া লইয়াছে। মাথা পাওয়া যায় নাই।

ঠাকুরগাঁয়ের এলাকায় হরিপুরের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ৺ছোগমল পেড়িওয়ালা ঠাকুরগাঁ যাইতেছিলেন। রাস্তাতে গাড়ীর মধ্য হইতে টানিয়া লইয়া তাঁহাকে দুর্বৃত্তেরা এরূপ গুরুতর জখম করিয়াছিল, হাঁসপাতালে প্রেরণের পর উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ৺ছোগমলের হাতে সোণার অনন্ত ও কোমরে ১৫০৲ টাকা ছিল, তাহা অপহৃত হয় নাই।

ডাক-বিভাগ—

শ্রীযুক্ত পোষ্টমাষ্টার জেনারেল সাহেব জানাইয়াছেন যে ডাকে পত্র

পুলিন্দা যাহাই দেওয়া হউক, বামপার্শ্বে কোণের দিকে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা থাকিলে, দৈবাৎ যদি পত্র ও পুলিন্দা বিলি না হইতে না পারে তবে তাহা না খুলিয়া প্রেরকের নিকট ফেরত আসিতে পারে। প্রেরকের নাম ঠিকানা নাই, অথচ অস্পষ্ট শিরোনামের জন্য বিলি হইতে পারিতেছে না এরূপ বহুসংখ্যক পত্র ও পুলিন্দা প্রতিবৎসর ডেড লেটার আফিসে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(প্রেরিত)

জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু লিখিয়াছেন—

এদেশে এখন যে সকল পেসোয়ারি মুসলমান ফেরিওয়ালা ধারে কাপড় বিক্রয় করে, সাধারণ লোকে তাহাদিগকে কাবুলী বলে, কারণ ইহাদিগকে দেখিতে কাবুলীদের ন্যায় এবং কাবুলীরা পূর্ব্বে ঐরূপ নিয়মে পসমী কাপড় বিক্রয় করিত। কিন্তু ঐ পেসোয়ারীগণ এই জেলার কালীয়াগঞ্জ থানার স্থানে স্থানে যে নাবালক ও নাবালিকা খরিদ করিয়া দেশে লইয়া যায় তাহার খবর অনেকেই তত রাখেন না। যাহারা ঐরূপ নাবালক ও নাবালিকা বিক্রয় করে তাহারা পশুতুল্য, সুতরাং পশুশাবক খরিদ বিক্রয় দেখিয়া অনেক লোকেরই বিরক্তি জন্মে কিন্তু "ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ান নির্ব্বোধের কর্ম্ম" এই প্রাচীন সাধুবাক্যের দোহাই দিয়া অনেকেই নীরব থাকেন। বোধ হয় এই সাংসারিক "জ্ঞান প্রাস" চ্যবনপ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের বহু দিন হইতে ভদ্রতা ও শান্তিপ্রিয়তার লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যাহা হউক, "জমিদার সভা" ও নূতন "জেলা সমিতি" এই বিষয়ে মনোযোগী হইলে শাসন কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন

এরূপ আশা করা যায়। ইহা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে পৃথিবী ব্যাপী দাসত্ব প্রথা রহিতকরণ জনিত পুণ্যাংশের দৃঢ় ভিত্তির উপরই ইংলণ্ড ও যুক্তরাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী অটলভাবে স্থাপিত আছেন।

(প্রেরিত)

৺বাণলিঙ্গদেবের স্থাপন।

দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত মার্ণাই নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে উদার চেতা শ্রীযুক্ত শশিমোহন পাল চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের শিবপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দয়া দাক্ষিণ্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

আজ কেন, তিনি বহুদিন হইতে কিরূপ ভাবে দরিদ্রের ক্রন্দনে বিচলিত হইয়াছেন, এবং যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখ বিমোচন করিয়া ধন্য হইয়া আসিতেছেন তাহা কথায় প্রকাশ করিবার জিনিস নহে। তাঁহাকে এক কথায় দরিদ্রের মাতাপিতা, অসহায়ের সহায়, বিপন্নের বন্ধু, নিরন্নের অন্নদাতা ইত্যাদি বহু বিশেষণে অলঙ্কৃত করিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা বহুদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি তিনি অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছেন। যতক্ষণ অতিথির যথোচিত সৎকার না করিয়াছেন, ততক্ষণ জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। তাঁহার লোকজনের অভাব নাই, তিনি ইচ্ছা করিলেই কর্ম্মচারীগণের দ্বারাই অতিথির সেবা করাইতে পারেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন না। পাছে অতিথি বিমুখ হন, এই ভয়েই তিনি এই গুরুতর কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া প্রীতি অনুভব করেন। ইহা কি তাঁহার মহদন্তঃকরণের পরিচয় নহে?

অতিথি ও দুঃখের কথা, গরুর প্রতিও তাঁহার অশেষ ভক্তি দেখিয়া বিস্ময় বিমোহিত হইতে হয় । তিনি স্বহস্তে গরুকে খাওয়ান, কত সেবা করেন কত পূজা করেন, তাহা আর কি বলিব । তাঁহার ভক্তি গো ও দেবদ্বিজে সমান অচলা ।

তাঁহার হৃদয় যে একখানি গভীর ভক্তি ও প্রেমের আগার তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় তিনি এই ব্যাপারে একটী একটী করিয়া লোকনয়নে উপস্থিত করিয়াছেন । দেবভক্তি ও গুরুভক্তি বিশ্বপ্রেম, হৃদয়ের অন্তস্থলে লুক্কায়িত রাখিয়াই বুঝি তিনি শিব প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন ।

মন্দিরটীর সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হয় । আমি নানাস্থানে অনেক দেবমন্দির দেখিয়াছি কিন্তু এমন সুন্দর নয়নাভিরাম মন্দির বড় বেশী দেখি নাই । দিনাজপুর জেলার মধ্যে ইহা কান্তজী মহীপালদীঘি ইত্যাদি ঐতিহাসিক বস্তুর মত একটী দেখিবার জিনিষ হইল বটে । বহু অর্থব্যয়ে ও বহু যত্নে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে ।

গত ১৩২৬ সালের ৩১ চৈত্র তারিখে সেই মনোরম মন্দির মধ্যে ৺বাণলিঙ্গ দেব স্থাপিত হইয়াছেন । মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বহুদেশ হইতে বহুলোকের ও বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণের সমাগম হইয়াছিল । নিমন্ত্রিত সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সেই বিরাট ব্যাপারে মহোৎসাহে ব্রতী হইয়াছিলেন । রংপুর জিলার অন্তর্গত মানাই গ্রামের অন্তর্গত [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়রত্ন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকেশব [illegible] তীর্থ ও শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ বিদ্যানন্দ মহাশয়গণের, নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত ম[illegible] কুমার স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ৺কাশীধাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি কাব্যতীর্থ, ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়গণের, ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত সজ্জন কান্দ গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের, পাবনা জিলার অন্তর্গত ভারেঙ্গা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত [illegible] চরণ [illegible] মহাশয়দ্বয়ের বাকলা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] কুলতিলক মহাশয়ের রঘুনাথপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের ও বাণীগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নাম সম্যক উল্লেখযোগ্য ইহা ছাড়া বাকসাহী রংপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান সমূহের ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহোদয়গণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনা চক্রে তাঁহারা উপস্থিত হইতে না পারিলেও তাঁহাদিগের যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা

করা হইয়াছে ।

এই বিরাট ব্যাপারে অন্যূন ৪০০শত ব্রাহ্মণ, স্বজাতীয় ১০০০ হাজার বৈষ্ণব ২০০ শত ও কাঙ্গালী ৫০০০ হাজা'র উপস্থিত হইয়া আহার করিয়াছেন এবং যথোচিত বিদায় গ্রহণ করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছেন । এই মহোৎসব চারি দিন স্থায়ী ছিল ।

কাঙ্গালী ভোজন একটী দেখিবার জিনিষ হইয়াছিল । হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে কাঙ্গালিগণ প্রবেশ করিতে লাগিল । যাহাতে কেহ অসন্তুষ্ট ও বিমুখ না হয়, এজন্য 'দয়ার সাগর' শশীবাবু স্বহস্তে তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন । সকলেই বিদায় কালীন যে ঈশ্বরের নিকট শশীবাবুর মঙ্গল কামনা করিয়াছিল তাহা তাহাদের ভাবেই স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে, বহু জমিদার নিমন্ত্রিত হইয়া এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন ।

এই মহা সমারোহে গ্রামবাসী সকলেই প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন । কার্য্যের সুবন্দোবস্তের জন্য ছাত্র মণ্ডলীর মধ্য হইতে উপযুক্ত অনেক Voluntoers নিযুক্ত হইয়াছিলেন । তাঁহারা প্রাণপণে স্ব স্ব কার্য্যভার সুসম্পন্ন করিয়া সকলেরই প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন ।

নৃত্যগীতাদিরও সুবন্দোবস্ত ছিল । কলিকাতার সংকীর্ত্তন ও "গণেশ" অপেরা পার্টি উপর্য্যুপরি চারিরাত্রি বিশেষ দক্ষতার সহিত নৃত্যগীতাদির দ্বারা সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছেন ।

ক্ষুদ্র পল্লীর পক্ষে শশীবাবুর মত একজন উদারচেতা ব্যক্তি অতীব গৌরবের বিষয় । তাঁহার হৃদয়ে একাধারে সমস্ত সৎগুণের সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে । ভগবানের নিকট আমাদের নিয়ত আন্তরিক প্রার্থনা তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে গোপনে ও যত্নে লুক্কায়িত সৎগুণ রাশির যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে থাকুন ।

এই সংখ্যা পত্রিকার সঙ্গে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত যতুনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয়ের ঔষধের বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল । ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের প্রধান ছাত্র এবং এখানকার ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় আনন্দনাথ সেন মহাশয়ের পুত্র । ইনি সর্ব্বপ্রথম দিনাজপুর ভূম্যধিকারী শ্রেণীর মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন । প্রত্যেক দিনাজপুরবাসীর সহানুভূতি দেখান কর্ত্তব্য । ইহাঁর ঔষধ খুব খাঁটি. আমরা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি ।

ঠিকানা ১৪৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা ।

দিনাজপুর জেলা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আজ আপনারা যে অভাবনীয় রূপে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন ও আমার মাথায় যে গৌরবের মুকুট স্থাপন করিলেন তাহার জন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি. এ কথা বলিলে মনের অবস্থা ও ভাব ঠিকভাবে ব্যক্ত করা হয় না। আমি আপনাদের এই সম্মানের জন্য কোন দিন প্রস্তুত ছিলাম না এবং আমি যে কখনও এই গৌরবজনক আসনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইব তাহা কথন স্বপ্নেও ভাবি নাই। সুতরাং এ অপ্রত্যাশিত সম্মান আসিয়া উপস্থিত হইল যখন যে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বন্ধুগণের স্নেহের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন বলিয়া মনে হইল এবং আরও ভাবিলাম যে মাতৃভূমির সেবার জন্য যে কাজের জন্যই আহ্বান হউক না কেন তাহা অযোগ্যতার দোহাই দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া আরামের আসনে সুখ সুপ্ত থাকা কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র। তাই নিজ শক্তি ও যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার অনুরূপ ধারণা থাকা স্বত্ত্বেও এই দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া আজ এই উৎসব স্থলে উপস্থিত হইয়াছি। মনে যথেষ্ট দ্বিধা ও সঙ্কোচের মাঝে এই বিশ্বাসটী আমি

হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিয়াছি যে, উৎসবের সফলতার তাবৎ গুরুভার আপনারা সভাপতির উপর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। আপনাদের উৎসাহ পূর্ণ মুখ দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে এই অযোগ্য ব্যক্তিটীকে আপনারা কর্ণধারের গৌরবময় আসনে বসাইয়া উৎসব তরণীর দাঁড় ও পাল পরিচালনা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাই হৃদয় হইতে দ্বিধা ও সঙ্কোচের অবসান হইয়াছে—আপনাদের উৎসাহ ও ভাবের তরঙ্গে আমারও হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছে; আশা হইয়াছে আপনাদের সাহায্য লাভ করিয়া আপনাদের প্রসারিত বলিষ্ঠ বাহুর শক্তি লাভ করিয়া তরণী অনুকূল পবনভরে যথানির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে পারিবে। এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং আমাদের চিরলাঞ্ছিতা ও মলিনবদনা মাতৃভূমির মুখখানি চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করিয়া আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এই কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিলাম।

বন্ধুগণ,

বহুদিন অতীত হইল যখন দেশের মাথার উপর প্রবল অশনি নিনাদ হইতেছিল, সমস্ত দেশ এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব দারুণ ঝঞ্ঝায় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল দেশময় প্রবল আতঙ্ক প্রবল আকারে আপনার অধিকার স্থাপন করিতেছিল—সেই দুর্দ্দিনে এই দিনাজপুর সভার জন্মলাভ। যে সকল নির্ভীক যোদ্ধা ইহার কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন আজ সভামণ্ডপে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। কোথায় আজ সেই বহ্নির মত তেজে ও উজ্জ্বলতায় গরীয়ান রাখালদাস—যিনি কিয়ৎকালের জন্য এই সভার অস্তিত্ব দীপ্তিময় করিয়া জীবনের মধ্যপথে সহসা একদিন আমাদিগকে বলহীন করিয়া অস্তমিত হইলেন! কোথায় আজ সেই মাধবচন্দ্র? কোথায়

সেই পরম তাপস নির্ভীক মধুসূদন ? কোথায় আজ সেই পরমেশ্বর—যিনি জীবনের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া পুনরায় যুবকের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ?

আর যিনি আজ এই সভায় উপস্থিত থাকিলে সমস্ত মণ্ডপ তাঁহার গৌরবে পরিপূর্ণতা লাভ করিত, যাঁহার উৎসাহ ও উত্তেজনা তড়িৎপ্রবাহের মত আমাদের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ লাভ করিয়া আমাদের শিরা ও উপশিরা উজ্জীবিত করিয়া তুলিত, যাঁহার দৃঢ়তা ও তেজস্বিতাকে কোনও প্রকারের সঙ্কট কিংবা আশঙ্কা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই—কিংবা কোন সম্মান আশা যাঁহার মর্য্যাদা জ্ঞানকে রেখামাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই—আজ আমাদের সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন লোকনাথ নলিনচন্দ্রের অভাবে যেন সব আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছে। যে দুর্দ্দিনে এই দিনাজপুর সভা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন সেই দুর্দ্দিনে এই সভায় উপস্থিত আমার অনেক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সহিত তাঁহার পার্শ্বচররূপে কার্য্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। বঙ্গদেশের সেই ঘোর অন্ধকারময় দুঃসময়ে তাঁহার অদ্ভুত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, মাতৃপূজার জন্য অনন্য-সাধারণ একাগ্রতা ও বিস্ময়কর শ্রমশীলতা ও তেজস্বিতা দেখিয়া মনের মন্দিরে তাঁহাকে যে উচ্চ আসনে স্থাপন করিয়াছিলাম—বহুদিন পরে উত্তেজনার অবসানেও দেখি তিনি অটলভাবে সেই আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি কোনও রাজসম্মান লাভ করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই এবং তাঁহার এই সম্মান লাভের অযোগ্যতাই জনসাধারণের অন্তস্তলে তাঁহার জন্য যে অমর শ্রদ্ধা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা চিরদিন অক্ষয় ও সুন্দর হইয়া বিরাজমান থাকিবে। দিনাজপুর সভার যে ক্ষতি হইল তাহার আর পূরণ

হইবে কিনা জানি না—কিন্তু যে যুগ সন্ধিস্থলে তাঁহার উপদেশ, তাঁহার উৎসাহ ও তাঁহার পরিণত অভিমত সভার কার্য্যনির্দ্দেশ ও পরিচালনা সম্বন্ধে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, সেই অসময়ে তাঁহার অন্তর্দ্ধান আমাদিগকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছে। কিন্তু তিনি যে আমাদের মায়াপাশ একবারে ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে মাতৃসেবা তাঁহার জীবনের শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল আজ তিনি স্বর্গস্থ হইয়াও সেই মাতৃপূজা মণ্ডপ হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই মণ্ডপের প্রত্যেক বায়ুকণার মধ্যে তাঁহার সঞ্জীবনী শক্তি মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে—তাঁহার মাতৃভক্তির অপূর্ব্ব পারিজাতসৌরভ স্বর্গের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আজ এই পূজা মন্দির আমোদিত করিতেছে। তাঁহার আশীর্ব্বাদ এই সভার মস্তকে বর্ষিত হউক—তাঁহার ভাব-প্রেরণা শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করুক আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আজ এই প্রার্থনা করিতেছি।

বন্ধুগণ,

গত ইংরাজী বৎসর মধ্যে সভার এই নিদারুণ ক্ষতিমাত্র করিয়া কাল নিরস্ত হয় নাই। আমাদের উৎসাহী বন্ধু মুন্সী জেহেরুদ্দীন আহাম্মদ সাহেবের মৃত্যুও এই সভার পক্ষে অত্যন্ত শোকের বিষয় হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান কেমন করিয়া বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে সদাপ্রফুল্ল মুন্সী সাহেব তাহার আদর্শস্থল ছিলেন। তাঁহারও সাহায্য এ সময়ে আমাদের পক্ষে কাম্য ছিল; তাঁহাকে হারাইয়া সভা একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারাইলেন। যদি এই স্থানেও আমাদের শোকের ইতিহাস শেষ করিতে পারিতাম তাহা হইলেও আমাদের যথঞ্চিৎ শান্তির কারণ হইত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সহসা বঙ্গদেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া সর্ব্বজনপ্রিয়, প্রজারঞ্জক আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে সি আই, ই, জীবনের

সায়ংকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই নিজ অভিষ্ট ইষ্টলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। আজীবন পরম নিষ্ঠার সহিত আত্মজীবন গঠিত করিয়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবী তীরে তিনি সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। সতত প্রসন্ন দৃষ্টি, সকল সৎকার্য্যে অগ্রগামী এবং সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি মহারাজা বাহাদুর যে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বস্তুতঃ অভিজাত্যের সহিত বৈষ্ণবোচিত দীনতা, ঐশ্বর্য্যের সহিত বিনয়ের মণিকাঞ্চন যোগ, নিজ বৈষয়িক কার্য্যের সহিত সর্ব্ববিধ হিতজনক কার্য্যের জন্য উৎসাহের সংযোগে মহারাজা বাহাদুরের জীবন নানাবর্ণের পুষ্পখচিত একটী সুন্দর কুসুম স্তবকের ন্যায় মনোজ্ঞ ও মুগ্ধকর ছিল। কেবল দিনাজপুর নহে সমগ্র বঙ্গদেশ এই মহাত্মার তিরোধানে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নশ্বর দেহের শ্মশান-যাত্রা সময়ে সমুদয় লোক যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিয়াছে তাহাতেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও লোকপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন আমরা একমনে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি। আমরা শোকাশ্রু মুছিয়া নবীন মহারাজ বাহাদুরকে অভিনন্দন করিতেছি। দিনাজপুর তাঁহার নিকট অনেক আশা করে; আশা করি, তিনি পিতৃমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের শূন্যস্থান পূর্ণ করিবেন।

বন্ধুগণ,

আমাদের দারুণ শোকের পরিচ্ছেদ শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটী বয়সে নবীন অথচ জ্ঞানে প্রৌঢ় বন্ধুর অভাবকাহিনী উল্লেখ করিতে হইতেছে। দিনাজপুরে নবীন ভূস্বামী মধ্যে বাবু রাধাগোবিন্দ চৌধুরীর মত অল্পদিনে কে এমন শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? তাঁহার কোন ইউনিভার্সিটীতে

বিদ্যালাভ হয় নাই, কিন্তু তাঁহাকে যাঁহারা ঘনিষ্ট ভাবে জানিতেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে তিনি স্বীয় যত্নে ও চেষ্টায় যে জ্ঞান ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শুদ্ধ ও নির্ম্মল চরিত্রগুণে, সকল প্রকার সৎকার্য্যে উৎসাহ সঞ্চারে তিনি দিনাজপুরের ভাগ্যগগনে একটী নূতন জ্যোতিষ্কের মত উদিত হইতেছিলেন—সহসা সে জ্যোতিঃ নিবিয়া গিয়াছে। কিন্তু দিনাজপুরবাসী সে স্মৃতি ভুলিতে পারিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত দিনাজপুর ইন্‌ষ্টিটিউট্ ও এই নাট্যগৃহ বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতি লোকের হৃদয়ে স্থানলাভ করিবে।

বন্ধুগণ,

আজ আমরা ভারতের এক মহাযুগ সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া একবার অতীত ও একবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। মহাকালের যে ভীষণ চিতানল সুদূর প্রতীচ্যে প্রজ্জলিত হইয়া তাহার কবলে প্রাচ্যকেও আকর্ষণ করিয়া দারুণ দিকদাহের সৃষ্টি করিয়াছিল আজও তাহা ধিকিয়া রহিয়া জ্বলিতেছে। শান্তি স্থাপিত হইয়াছে এই কথা ঘোষণার জন্য উৎসব আয়োজনের ত্রুটী হয় নাই; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কাম্য বস্তুটীর দর্শনলাভ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সত্য বটে কামান গর্জ্জন কতক অংশে নিবৃত্ত হইয়াছে, সত্য বটে প্রতিদিনের সংবাদ পত্রে অসংখ্য লোকক্ষয় ও অর্ণব পোতধ্বংসের বিবরণ নয়নপথের পথিক হয় না, সত্য বটে অমানুষিক অত্যাচার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দারুণকাহিনী মানবমনকে আলোড়িত করেনা কিন্তু এই শান্তি স্থাপনের ফলে দৈবদুর্ব্বিপাকে আমরা অধম ভারতবাসী যে দুঃখ ও ক্লেশের অংশভাগী হইয়াছি তাহাতে শান্তির লক্ষণ নির্ব্বাচন করা কঠিন হইয়া

পড়িয়াছে। দুর্জ্জয় রণভেরীর ভীষণ আহ্বানে ভারতবাসী রক্ত দিয়া অর্থ দিয়া প্রাণ দিয়া সেই আহ্বানের উত্তর দিয়াছিল। মনস্‌এর যুদ্ধে ফ্রান্স ও বেলজিয়মের রণক্ষেত্রে ভারতীয় যে শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা উপেক্ষণীয় নহে। জর্ম্মাণীর প্রথম আক্রমণের স্রোত রোধ করিবার জন্য ভারতীয় সৈন্যই ব্রিটীশ সৈন্যের দুর্ভেদ্য প্রাকার সৃষ্টি করিয়াছিল—ভীষণ আহবে সেই ভারতীয় সৈন্য কোথায় নির্ব্বাণ লাভ করিল। কিন্তু রাখিয়া গেল দুর্লভ অমরত্ব—অসীম বীরত্ব—সমুদয় পৃথিবী তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। তাহার পর সেই কাল সমরের ভীষণতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—জয়লক্ষ্মী সম্মিলিত মিত্রশক্তির প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টিপাত করিতে কৃপণতা করিতে লাগিলেন—মিত্রশক্তির ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাগ্যবিধাতা ব্রিটীশ সিংহের মুখেও যখন পরাজয় ও অবশ্যম্ভাবী অনর্থের আশঙ্কার কালিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল—সেই ঘোর দুঃসময়েও ভারতবাসী ব্রিটীশ সিংহকে সাহায্য করিতে তিলমাত্র বিচলিত হয় নাই। যে অধম বাঙ্গালী চিরদিনই এংলো ইণ্ডিয়ানদের বিদ্রূপ ও ঘৃণার পাত্র ছিলেন—যাহারা চিরদিনই তাহাদের নিকট চির অসন্তুষ্ট কাপুরুষ জাতি বলিয়া অভিহিত হইতেন—জানিনা দৈবের কি নিষ্ঠুর পরিহাসে তাহারাও স্মৃতিপথে উদিত হইলেন এবং শতাব্দীর যুদ্ধবিদ্যা পরিহারের ফল উপেক্ষা করিয়া তাহারাও শোণিত তর্পণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বঙ্গদেশ পূর্ব্ব বিদ্রূপ, পূর্ব্ব উপেক্ষা ভুলিয়া মৃত্যুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। আর আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ এই যুদ্ধে যে ত্যাগ ও রাজভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা অন্য কোনও দেশে প্রদর্শিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

আজ এই দারুণ যুদ্ধের অবসানে ভাবিতেছি এই আত্মদান, এই স্বেচ্ছায়

মৃত্যুবরণ ইহার বিনিময়ে ভারত কি লাভ করিল ? যতদিন সমরের উত্তেজনা ছিল ততদিন ভারতবাসীর এই আত্মদানের কাহিনী নানারূপ উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণিত হইল। কিন্তু এই যুদ্ধ ফলে ভারতীয় প্রচ্ছন্ন আশা ও আকাঙ্খা যখন নূতন রূপ ধারণ করিয়া স্বাধিকার দাবি করিল তখন আমাদের সেই পুরাতন বাক্য ও পুরাতন শক্তি হীনতার ইতিহাস শুনিতে হইল। শুধু তাহাই নহে যে বর্ব্বরোচিত নৃশংসতার জন্য সমরলিপ্ত জার্মাণগণ পুনঃ পুনঃ নিন্দিত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর নৃশংস অভিনয় ভারতের বক্ষেই অভিনীত হইল। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে যে জাতি দেশ উজাড় করিয়া রণক্ষেত্রে আপনার সন্তান সন্ততিকে মৃত্যু আলিঙ্গন করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন সেই জাতির প্রতি এই নৃশংসতা পরীক্ষিত হইল। বন্ধুগণ নৃশংসতার ইতিহাস মাত্রই অসহনীয় এবং তাহার প্রসঙ্গও হৃদয়ে দারুণ কষ্টের সৃষ্টি করে। পঞ্চনদের যে শোণিতপ্রবাহের নুতন করিয়া বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি না ; কিন্তু যতই ডায়ারের সেই নির্লজ্জ ও দাম্ভিকতাপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা স্মৃতি পথে উদয় হয় ততই আমাদের নিজ অসহায়তা স্মরণ করিয়া হৃদয় অবসাদে পূর্ণ হয়। এই বৃহৎ সভার মধ্যে বোধ হয় এমন কেহই নাই যিনি মনে মনে সেই সময় উচ্ছৃঙ্খল জনমণ্ডলী যে সমুদয় কার্য্য করিয়াছিল তাহার সমর্থন করেন। কিন্তু জালিয়ান্ বাগের সভায় সমবেত নিরস্ত্র ও শান্ত জনমণ্ডলীর প্রতি যে গুলি বর্ষিত হইল—এবং হত্যাকারী বীরপুঙ্গব যেরূপ ভাবে, আহত ও হত ব্যক্তিগণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া জয়ের গৌরব মাথায় লইয়া চলিয়া গেলেন তাহা স্মরণ করিলেও সমস্ত মন স্তম্ভিত হইয়া যায়। সত্যই কি জেনেরাল ডায়ারের মন্তব্য ও কাহিনী পাঠ করিয়া কেহ মনে করেন যে জেনেরাল সাহেব মানুষের উপর গুলি বর্ষণ করিতেছেন বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন।
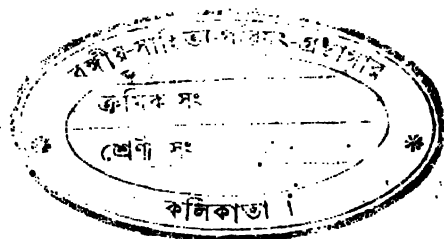
দিনাজপুর পত্রিকা।

(মাসিক)

সপ্তবিংশতি ভাগ | আষাঢ়, ১৩২৭। | ১০ম সংখ্যা

স্বর্গীয় মহারাজা গিরিজানাথ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—:*:—

শুভদিনে শুভক্ষণে বিদ্যারম্ভের পর, রাজধানীতে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট মহারাজ গিরিজানাথ বাঙ্গলা ও ইংরাজি ভাষায় শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। কেবল বাটীতে রাখিয়া শিক্ষা দিলে বিদ্যালাভে আগ্রহ প্রায় হয় না এবং শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, কিন্তু বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিলে প্রতিযোগিতা, সদ্দৃষ্টান্ত ও সুসংসর্গে ফলে নিষ্ক্রিয় শক্তি উদ্বোধিত, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত, জ্ঞানানুসন্ধিৎসা বলবতী ও চরিত্র গঠিত হয়। আবার অধুনা

প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করে ধর্ম্মশিক্ষার একান্ত আবশ্যক; তদভাবে মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান সংযমেরই অভাব হইয়া পড়ে। এই সকল চিন্তা করিয়া রাজমাতা হিন্দুর জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল ৺কাশীধামে মহারাজাকে লইয়া গেলেন। (১৭৭১ খৃঃ অঃ)। তথায় কুইন্স কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। স্বাস্থ্য ও দৈহিক উন্নতি সকল শিক্ষার ভিত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তজ্জন্য মহারাজের ব্যায়াম চর্চ্চার ব্যবস্থা করা হইল। প্রাতেঃ ও সায়ংকালে রাজমাতা মাপিয়া তাঁহাকে মুগদরাদির সাহায্যে ব্যায়াম করিতে ও পালোয়ানের নিকট কুস্তিশিক্ষা করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন মহারাজাকে অশ্বারোহণ ও অশ্বপরিচালনা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সুবিখ্যাত ঘোড়সওয়ার নিযুক্ত ছিল।

মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, শকুন্তলা নাটক, সুললিত গীতিকাব্য জয়দেব এবং পশুপক্ষীর কথোপকথন ছলে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পূর্ণ হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র সমগ্র জগতের সাহিত্যে অতুলনীয় বলিয়া মহাত্মা এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব, তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অন্তঃপুরচারিণী মহারাণী শ্যামমোহিনী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মুখে পুরাণেতিহাস শ্রবণ ও ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন এবং অপত্যস্নেহ শ্রবণ হৃদয়ে পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় অতি সহজে অথচ হৃদয়গ্রাহীরূপে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রথমে লঘুচাণক্য তৎপর বৃহৎচাণক্য অনন্তর বিষ্ণুশর্ম্মাকৃত হিতোপদেশ ও সর্ব্বশেষে সমগ্র পঞ্চতন্ত্র তাঁহাকে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তৎকালে নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়পাঠ্য ইংরাজি ও সংস্কৃত পুস্তক সকলের দৈনিক

পাঠাভ্যাসের পর মহারাজাকে এই সকল পুস্তক পড়িতে হইত। এই সকল পুস্তক পড়িতে মহারাজ অধিকতর আনন্দোপভোগ করিতেন। এইরূপ শিক্ষায় তাঁহার জীবনে যে কি সুধাময় ফল ফলিয়াছিল তাহা আমরা যথাস্থানে দেখিবার চেষ্টা করিব।

১৮৭১ হইতে ১৮৭৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মহারাজা ৺কাশীধামে শিক্ষক অবস্থিতি করেন। এই সময়ে পশ্চিম দেশীয় বহু রাজপুত্র কুইন্স কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। সহপাঠী রাজকুমারদের অনেকের সহিত মহারাজার ঘনিষ্টতা ও কতিপয়ের সহিত বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের ও তাঁহাদের তত্বাবধায়ক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং আত্মীয়স্বজনের সংসর্গে আইসায় সমাজের উচ্চতর স্থিত ব্যক্তিগণের সহিত ব্যবহারের অভিজ্ঞতা মহারাজা সহজেই লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জেলা বর্দ্ধমানের কাটোয়া সব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত কুলাই গ্রাম নিবাসী ৺মতিলাল সিংহ মহাশয়ের অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার সহিত মহারাজের শুভ বিবাহ হয়। এই বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ হইতে বহু আত্মীয়স্বজন এবং বঙ্গের নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া দিনাজপুর আইসেন ও শুভকার্যে যোগদান করেন। রাজমাতা সকলের যথোচিত সম্মান করিতে ত্রুটী করেন নাই। এই বাল্যবিবাহের কথা শুনিয়া রাজমাতার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে বোধ হয় অনেকেই প্রস্তুত হইবেন না। কিন্তু রাজ রাজাবারা মধ্যে বাল্যবিবাহের বহু দৃষ্টান্ত আছে তন্মধ্যে কাকপক্ষধর শ্রীরামচন্দ্রের ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের বিবাহ সর্ব্বোপরি স্মরণযোগ্য। তৎপর স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের

জীবনে বাল্যবিবাহের কোন কুফল ফলিতে দেখা যায় নাই; সুতরাং যাঁহার দ্বারা এই শুভপরিণয়কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল তাঁহার বুদ্ধি কলেরই পরিচায়ক।

বিবাহের পর মহারাজা রাজধানীতেই অবস্থান করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। ইংরাজি ও বাঙ্গলা ভাষা এবং তৎসাহায্যে গণিত ইতিহাসাদি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ডাঃ যোগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও বাবু যশোদা নন্দন প্রামাণিক এম, এ, বি, এল মহোদয়গণের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা প্রদান করিতেন। ৺কাশীধামে অবস্থান কালে মহারাজার দৈহিক উন্নতি সাধনপক্ষে যেরূপ সুব্যবস্থা ছিল রাজধানীতে তদ্রূপই ব্যবস্থা হইল। এতদ্ব্যতীত তৎকালীন প্রথিতনামা শিকারী বদনচন্দ্র দারোগা ও মহেশ চন্দ্র সিংহের নিকট মহারাজা বন্দুক চালাইতে ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তু শীকার করিতে শিক্ষালাভ করেন।

উপযুক্ত শিক্ষকগণের নিকট পরিশ্রম ও একাগ্রতা সহকারে শিক্ষা করার সুফল ফলিয়াছিল। ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ ও চিঠি পত্রাদি লিখিতে, বলিতে কহিতে, পাশ্চাত্য আদব কায়দা দুরস্ত রাখিয়া ইংরাজ* রাজপুরুষদিগের সংস্রবে আসিতে, সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিয়া রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পৃথিবীর সাময়িক ঘটনাবলির সমাচার রাখিতে মহারাজের অসামান্য কৃতিত্ব ছিল। এরূপভাবে বর্ত্তমানের এবং পুস্তকপাঠে অতীতের সম্পর্কে আসিয়া তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তিবলে সকল বিষয়

সুদৃঢ় ধারণায় আনিতেন ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। এবং সেই সকল সিদ্ধান্ত সম্বল করিয়া সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরতা সহকারে ব্যবহারিক জগতে বিচরণ করিতেন। এই আত্মনির্ভরতা ও শিক্ষিত বিষয়ের বিশুদ্ধতায় অগাধ বিশ্বাস মহারাজের চরিত্রের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপাদান ছিল। প্রাকৃতিক ঘটনাবলি পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা দ্বারা বৈজ্ঞানিক যেরূপ সত্যে (theory তে) উপনীত হন, স্বর্গীয় মহারাজও তদ্রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। প্রাপ্ত সত্যে নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিক যেরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং তথায় তাঁহার সাফল্য তাঁহার সত্যের সত্যতা সপ্রমাণ করে, তদ্রূপ মহারাজের ব্যবহারের সফলতাও তাঁহার সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করিতেছে। বিশেষতঃ পণ্ডিতগণের সহিত সদালাপে মহারাজ নিজ সিদ্ধান্তগুলিকে খাঁটি করিয়া লইতেন, কাজেই ভ্রমভ্রান্তির অবকাশ অতি অল্পই থাকিত। সুতরাং তাঁহার আত্মনির্ভরতা অহংজ্ঞান প্রসূত আত্মম্ভরিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা। ইহার বলে অসন্দিগ্ধ চিত্তে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন ও সকল কার্য্য সুসম্পন্নতার সহিত সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন, এবং কদাচিৎ কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলে তৎসাধন জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার এই আত্মনির্ভরতার সহিত হটকারিতার যোগ একেবারে ছিল না। দেশ কাল পাত্র বিচার পূর্ব্বক বিশেষ বিবেচনা সহকারে তিনি সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন এবং ঐরূপ বিবেচনাধীন থাকিয়া প্রতিপদ অগ্রসর হইতেন। "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্" এই মহাবাক্যের মর্ম্ম তিনি সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মহারাজের শিষ্টাচারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি যেমন বিনয়ী তেমনই সদালাপী ছিলেন। বিনয়

ও মিষ্টভাষিতা তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ গুণ ছিল। ইহার সহিত সংশিক্ষার যোগ থাকায় এবং জ্ঞানপিপাসা ও স্মৃতিশক্তিগুণে আধুনিক সভ্যতার উপাদানগুলির তথ্য নিজস্ব করিয়া রাখায় তিনি প্রায় সকল বিষয়ে সকলের সহিত মধুরভাবে আলাপ করিতে পারিতেন। দান করিয়া মহারাজ পরম আনন্দ লাভ করিতেন। বাজারে নাম জাহির হইল বা হইবে বলিয়া আনন্দ নহে। তাঁহার দৃষ্টি সে দিকে আদৌ ছিলনা; তাঁহার গুপ্তদানই অধিক ছিল। সৎপাত্রে প্রদত্ত হইয়া অর্থের সদ্ব্যবহার হইল বলিয়া তাঁহার আনন্দ হইত। দানের সময় তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়নম্রতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। "আমার কি সাধ্য যে আপনার যথোচিত সম্মান করিতে পারি, যৎকিঞ্চিৎ যাহা জুটিয়া উঠিল অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত সলজ্জ অথচ সহাস্যবদনে মধুমাখা স্বরে উচ্চারিত এইরূপ বাক্যাবলি শ্রবণগোচর করিয়া প্রদত্ত এক এক মুদ্রাকে লক্ষ মুদ্রা জ্ঞানে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে অর্থিগণ বিদায় লইতেন। এই আশীর্ব্বাদ ফলে মহারাজ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইহার ফলেই দিনাজপুর রাজ ও রাজবংশ ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া চিরস্থায়ী হইবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বাহ্য জগতের সহিত নানারূপে সম্পৃক্ত চিত্তকে সংযত এবং বহির্দৃষ্টিকে অন্তর্মুখীন করিয়া মহারাজা ঘরের খবর লইতে পারিতেন। "ঘরের ছজন অন্তরে ছজন, তারাই তোমার কর্ম্মনাশা" এই জ্ঞানে রিপুগণকে স্ববশে আনিবার জন্য বাল্যকাল হইতেই তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিবার

লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছিন। অন্যায় অত্যাচার দেখিলে তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হইত। কোন সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিরই বা না হয়? হিরণ্যকশিপুর বধের পর শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি ভগবানকে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন "মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিক সর্প হত্যা।" কিন্তু পরন্তু মহারাজ "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণ" ইত্যাদি মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; কাজেই অপরের মত ক্রোধোদয়ও অমার্জ্জনীয় দোষমধ্যে গণ্য করিতেন এবং অসম্যতি অধম ব্যক্তিগণের নিকটও স্বীয় চরিত্রের এই দিকটুকু দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। "এইরূপ ভাবে আত্মগ্লানি আমাদের নিকট করা কি ভাল?" জিজ্ঞাসা করিলে এরূপ নিবারিত হইয়া মহারাজ একদিন সহাস্য বদনে উত্তর দিলেন, নিজ গুণকীর্ত্তনে যেরূপ মহাদোষ নিজদোষকীর্ত্তনে সেইরূপ মহাগুণ ইহাতে দোষের শান্তি হয়। তাঁহার মুখে প্রায় শুনিতে পাওয়া যাইতঃ—

আপদঃ কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।

তজ্জয়ো সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

এই মহাবাক্যকে দিগ্দর্শন করিয়া সংসার সমুদ্রে জীবনতরী পরিচালন পূর্ব্বক মহারাজ প্রকৃত পুরুষার্থ লাভ করিয়া গিয়াছেন।" হায়! হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য যে এরূপ সৎসঙ্গে বঞ্চিত হইয়াছি। নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা ফলে মহারাজ বলবান সুদৃঢ়কায় ও কর্ম্মঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার দৈহিক বলের কথা আজ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট আধিব্যাধিগ্রস্ত বঙ্গবাসীর নিকট গল্প বলিয়া বোধ হইবে। বলবীর্য্যের আধার মহাত্মাদের বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। তাঁহার নাম শুনিয়া জয়পুর, যোধপুর

কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি দূরদেশস্থ মল্লগণ দিনাজপুর উপস্থিত হইত এবং রাজধানীর রঙ্গস্থলে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার দৈহিকবল ও মল্লযুদ্ধের কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া ভূয়োভূয় প্রশংসা করিয়া যাইত। সাধারণ মল্লগণ মহারাজের সহিত "হাত মিলাইতে" সাহসী হইত না। সন ১৩১২ সালে রাজমাতার শ্রাদ্ধের সময় রাজধানীর একটী কক্ষে পানীয় জলপূর্ণ দশ বারটি বড় বড় পিত্তলের জলধারা রক্ষিত ছিল। হঠাৎ ঐ গুলি স্থানান্তরিত করিবার আবশ্যক হইল। পাঁচ ছয় জন বলবান ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিয়া একটাকেও স্থানান্তরিত করিতে পারিলনা, অথচ বরফ ও কেওরা যোগে সুশীতল ও সুবাসিত পানীয় জল অপচয় করা উচিত নয় বলিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এই সময় মহারাজ সেই স্থান দিয়া কার্য্যান্তরে গমনকালীন ব্যাপার অবগত হইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং দুই হাতে দুই দিকের কড়া দৃঢ়রূপে ধরিয়া জলাধার গুলিকে একে একে অবলীলাক্রমে কক্ষান্তরে রাখিয়া আসিলেন। জলসহ এক একটি জলাধার ও জলে চারিমণের কম ছিল না। এসময় মহারাজের বয়ঃক্রম ৪৩। ৪৪ বৎসর হইবে। On the wrong side of forty চল্লিশ পার হইলে রসায়ন ক্রিয়াদ্বারা দেহটাকে মেরামত করিয়া লইতে বৈদ্য শাস্ত্রে মাথায় দিব্বি দেওয়া আছে।

এতদঞ্চলে এই সময় ব্যাঘ্র ও বন্যশূকরের উৎপাত অত্যধিক ছিল। প্রায় সর্ব্বত্র গোলবাঘ দেখা যাইত; ডুমরা বাঘের কথাত বলিতেই নাই। নিরীহ গৃহস্থগণের প্রাণ ও গোধনাদি হত্যা এই সকল হিংস্র জন্তু বধ করিবার নিমিত্ত মহারাজ প্রায় শীকারে বহির্গত হইতেন। ২০। ২৫ টি

হস্তী এবং সংবাদ বহন জন্ত কয়েকটি জিন সওয়ারের ঘোটক তাঁহার সঙ্গে যাইত। গভীর জঙ্গলের সন্নিকটে মনোমত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তাম্বু গাড়া হইত এবং শীকারের সহকারী সঙ্গীগণের সহিত মহারাজ তথায় কিছুদিন ধরিয়া বাস করিতেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হস্তীপৃষ্ঠে অনাহারে কণ্টক ও আলকুশি লতাকীর্ণ গভীর জঙ্গল ভাঙ্গিয়া শীকার অন্বেষণ করিতে হইত এবং বড় বড় Maneator এর সাক্ষাৎ পাইলে অথবা একসঙ্গে দুই তিনটী শেলাবাঘ সম্মুখীন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া গুলি চালাইতে হইত। সুখের বিষয় মহারাজের অব্যর্থ সন্ধান ছিল। তাঁহার বন্দুকের লক্ষ্য মধ্যে কোন হিংস্র জন্তু আসিলে তাহার আর নিস্তার ছিল না। কিঞ্চিদধিক তিন শত শেলাবাঘ মহারাজ স্বহস্তে শীকার করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহু ভুমরাবাঘ ও বন্যশূকর তাঁহার গুলিতে নিহত হয়। রাজধানীতে অবস্থান কালে "খবর" পাইবা মাত্র তিনি সজ্জিত হইয়া হস্তীপৃষ্ঠে শীকারে বহির্গত হইতেন। এই সকল কারণে উদ্যমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, একাগ্রতা, কার্য্যতৎপরতা, নির্ভীকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণ মহারাজকে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

সৎশিক্ষা ফলে মহারাজ সদগুণান্বিত হইয়া উঠিলেন; এদিকে রাজ প্রাপ্তির কালও সমুপস্থিত হইল। রাজমাতা মহারাজের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া কিছু দিন তাঁহার রাজ্যপরিচালন প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে বুঝিয়া বিষয়চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক ভগবৎপদপ্রান্তে স্থানলাভ আশায় ৺কাশীধামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ জ্ঞানী, ভূয়োদর্শী, কল্যাণকামী ও

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির উপদেশ মত সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। হরনাথ চূড়ামণি, কমলাকান্ত রায়, মতিলাল সিংহ প্রভৃতি রাজকার্য্য পরিচালনে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। প্রাচীন রীতিনীতি ও কার্য্যপ্রণালী অক্ষুন্ন রাখিয়া প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন করা মহারাজ বাহাদুরের রাজনীতির মূল সূত্র ছিল। পরীক্ষিত ও চিরপরিচিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অপরীক্ষিত ও অপরিচিত পন্থা অবলম্বন করিতে তাঁহার উৎসাহ কম ছিল। তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় নূতন প্রথা যে প্রবর্ত্তন না করিতেন এমন নহে; কিন্তু নূতনের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া নূতন প্রাচীনের অনুগত হইয়া স্বীয় অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিত। এই কারণেই মহারাজ বাহাদুরের অধিষ্ঠিত মিসিল হইতে আরম্ভ করিয়া পাইক পদাতিকদিগের তলব তাগাদা পর্য্যন্ত প্রতিকার্য্যে এমন একটা বিশেষত্ব লক্ষিত হইত যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই অতীতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া এই সুপ্রাচীন রাজবংশের বিগত গৌরব মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন এবং বর্ত্তমান অতীতের আলোকে মণ্ডিত হইয়া তাঁহাদের নিকট অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিত।

প্রজাবর্গের সুখশান্তি বিধান করা মহারাজার প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাঁহার প্রজাগণ বলিত আমরা রাম-রাজত্বে বাস করিতেছি। ধর্ম্মনীতির সম্পর্কহীন নিছক রাজনীতি তাঁহার নিকট আদর পাইত না। বাকীদার প্রজার প্রতি মহারাজের কৃপাদৃষ্টি থাকায় 'নাত্তোয়ান প্রজার দুনা মালগুজারি' এই প্রবাদ বাক্য তাঁহার প্রজাদের নিকট নিরর্থক হইয়াছিল। কোন প্রজা বিপদে পড়িয়া শরণাগত হইলে তিনি তাহার বিপদ উদ্ধারের যথোচিত ব্যবস্থা করিতেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে

সময়ে সময়ে প্রজাদিগকে ঋণ দান করিয়া আনুকূল্য করিতেন। জনসাধারণ তাঁহার ক্ষমাগুণ দেখিয়া বিস্মিত হইত। অতিবড় দোষীও তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া কখন বিফল মনোরথ হয় নাই। কর্মচারীদিগের প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহারা পদে পদে মহারাজার ক্ষমাগুণের পরিচয় পাইয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতেন। কাহাকেও পদচ্যুত করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। সহস্র অপরাধ করিলেও দণ্ডান্তর বিধান দ্বারা অপরাধীর সংশোধনের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেন; সংকল্প যে কাহারও রুজি মারিবেন না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্বেও সংশোধনে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি যেদিন প্রথম কোন এক কর্মচারীকে পদচ্যুত করিবার আদেশ দেন, শুনা যায়, সজল নয়নে উক্ত আদেশ লিপিবদ্ধ করার পর হতভাগ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন 'তুমি আমার একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে'। নিজ রাজ্য ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তৎসম্পর্কে আগত স্থান সকল হইতে আবশ্যকীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য মহারাজের অতি সুব্যবস্থা ছিল, এবং তজ্জন্য রাজ্য সংক্রান্ত প্রায় সকল বিষয় তাঁহার নখদর্পণে থাকিত। বিবাদ স্থলে আইন আদালত অবলম্বনে প্রতিকার লাভের ব্যয় বাহুল্য দেখিয়া মহারাজ অধিকাংশ স্থলে আপোষ নিষ্পত্তির পক্ষপাতী ছিলেন এবং পক্ষগণ তাঁহার নিকট মীমাংসাপ্রার্থী হইলে, এরূপ সুমীমাংসা করিয়া দিতেন যে উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিত। যেমন দৈনিক পূজা পাঠের, ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপের, চিঠিপত্রাদি ব্যবহারের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেইরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহেরও নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল; অথচ অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য

তিনি সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। সুস্থ, বলিষ্ঠ অসাধারণ বীর্শক্তি সম্পন্ন মহারাজের কার্য্যে বিরক্তি ছিল না।

(ক্রমশঃ)

সুন্দর ।

যার চখে যাহা লাগে তাহাই সুন্দর
তথাপি সুন্দর এক আছে মনোহর।
পাহাড়ে, সাগরে, বনে সুন্দরের মেলা
ভাবুকের মহা প্রাণে নিত্য করে খেলা

রবি শশি তারাগণ সুন্দর কেমন
উঠে, পড়ে, নিবে যায় হাওয়ার মতন
কতদূরে কতদূরে কতদূরে হায়
আপন সৌন্দর্য্য নিয়ে আপনি পলায়

সুন্দরের প্রতিবিম্ব বড়ই সুন্দর
যতদূরে যাবে আর ততো মনোহর
সুন্দরের স্মৃতি খানি ধরিয়া অন্তরে
যুবক যুবতী কত সুখেতে সন্তরে।

মিলনের সুন্দরতা বিরহে নিবায়
(পুনঃ) সুন্দর করিয়া তোলে স্মৃতির হাওয়ায়
প্রকৃত সুন্দর সেই সুন্দরের সার
বিরহ ধ্বংশনে যার নাহি অধিকার।

তাই জানি আর্য্যগণ সুন্দর ভজিয়া
এখনও জীবিত যুগ যুগান্ত ভরিয়া।
জরা মৃত্যু ব্যাধি যারে সদা ভয় করে
সেইত সুন্দর শোভে আর্য্যের অন্তরে।

পুরুষ প্রকৃতি।

ধ্যানে স্তিমিত নয়নে বসিয়া কপিল
ভ্রূমধ্যে সংযত দৃষ্টি
ভাবিতে লাগিলা সৃষ্টি
কিরূপে হইল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অখিল?

কার কৃপা রবি শশী তারকা নিচয়
জল স্থল ব্যোম বায়ু
ক্ষিতি তেজ মন আয়ু
মানব দানব দেব জীব জন্তচয়?

কিরূপে হইল সৃষ্টি, স্রষ্টা কোন জন ?
কি কৌশলে অলক্ষিতে
মৃত্যু হেতু নিরীক্ষিতে
অমর বাসনা ভবে কোন প্রয়োজন ?

ভাবে কালে কি সম্বন্ধ ? জীবনে মরণে ?
সত্য হতে ধৈর্য্য সীমা
ষড়্‌রিপু দয়া ক্ষমা
বিষয়ের বিশেষণ কি থাকে নিধনে ?

আকাশ পাতাল জোড়া ভাবনার ছবি
ধ্যান রত মনে তার
হ'ল এক সংস্কার
সেরূপ কারণ ময় পুরুষ ভাবি !

নিরবধি আকর্ষণ প্রাণময় প্রেমে
একধারা ইচ্ছাময়
বহে ভাব বিশ্বময়
অভিহিত হ'ল তাই সচেতন নামে !

তার পর নিরাকার অন্ধকার সব
উদ্ভাবিত জ্ঞান চক্ষে
থাকি সদা মৃত্যু লক্ষ্যে
অচেতন সে প্রকৃতি জড়েতে উদ্ভব !

নর নারী যথারূপ যথোচিত জ্ঞান
জগৎ কারণ জন্ম
মরণাদি বত ধর্ম্ম
ত্রিগুণাতীত নাহয় প্রকৃতির দান !

সুখ নাই দুঃখ নাই না ভাল না মন্দ
অচল নিস্পন্দ সব
শিব রূপ সে ভৈরব
সচৈতন্য মহাশক্তি প্রকৃতি সম্বন্ধ !

অহঙ্কার পঞ্চতত্ত্ব নির্গুণ সে জ্ঞান
ইচ্ছা হ'তে অবিরত
সৃষ্টি রীতি এই মত
অদৃশ্য আকাশ যথা পরিদৃশ্যমান !

—:*:—

—:*:—
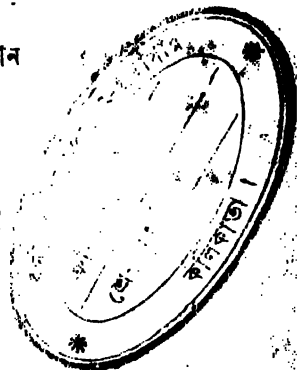
রাজধানী— রাজকীয় জন্মদিনে উপাধি বিতরণোপলক্ষে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশ নাথ রায় বাহাদুর "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে নূতন সম্মান নহে। তথাপি বর্ত্তমান রাজশক্তি, দিনাজপুর রাজবংশের মর্য্যাদা ও গৌরব অক্ষুন্ন রাখায় আমরা সুখী হইয়াছি।

শোকসংবাদ ঃ—দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব প্রথম মুন্সেফ ৺বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় 'বন্ধারত্ন মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। দুই বৎসরের কিছু পূর্ব্বে তিনি এখান হইতে কুমিল্লা বদলী হন এবং পরে তথা হইতে শ্রীরামপুর বদলী হন। স্বাস্থ্য ভাল নহে জন্য কলিকাতার বাটী হইতেই শ্রীরামপুর যাতায়াত করিতেন। কুমিল্লায় তাঁহার যে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তাহা আর ফিরিয়া পাইলেন না। দিনাজপুর পত্রিকার যখন পুনঃ প্রকাশ আরম্ভ হয়, তখন তদ্বিষয়ে তিনি একজন প্রধান উৎযোগী ছিলেন এবং সম্পাদকীয় বোর্ডেও তিনি ছিলেন। তাঁহার অনেক রচনা দিনাজপুর পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে কিরূপ ভাবপ্রবণ ও চিন্তাশীল লেখক ছিলেন তাহা তাঁহার প্রত্যেক রচনাতেই প্রকাশ আছে। "মহারাজা গিরিজানাথ" শীর্ষক কবিতা বিপ্র দীনদাস স্বাক্ষরযুক্ত যাহা গত চৈত্রমাসে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই দিনাজপুর পত্রিকাতে তাঁহার শেষ লেখা। কুমিল্লায় গিয়াই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়াতে "নবজীবনের পথে" শীর্ষক যে গল্প প্রবন্ধ পত্রিকাতে ধারাবাহিকে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা আর সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। এরূপ উদার নির্ম্মল হৃদয় অকৃত্রিম বন্ধু হারাইয়া আমরা শোকে ম্রিয়মাণ হইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বিদায় লইতে বাধ্য হয়েন। ঐ সময়ে উড়িষ্যা অঞ্চলে পরিবর্ত্তন জন্য যান। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভবিবাহের পূর্ব্বে কোন প্রকারে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আইসা হয়। কলিকাতাতেই ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার আত্মার কল্যাণ ও শোকসন্তপ্ত পরিজন ও আত্মীয়বন্ধু সকলের অন্তঃকরণে শান্তির জন্য ভগবানের চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

মহর্ষি ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন— গত ৫ই আষাঢ় শনিবার ৪-৫০ ট্রেণে মহর্ষি ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন চিকিৎসার জন্ত কলিকাতা গিয়াছেন। কিছুদিন হইল তিনি বড়ই অসুস্থ হইয়াছিলেন। তিনি শীঘ্র নিরাময় হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেশের সেবা করুন ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিষ্কৃতি ও চরিত্রহীন দুইখানি উপন্যাস শ্রীযুক্ত ভূপাল চন্দ্র সেন নাটকাকারে লিখেন। স্থানীয় নাট্যসমিতিতে তাহার অভিনয় হইয়াছিল। ঐ দুই নাটকের অভিনয় দেখাইবার জন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমন্ত্রণ করায় তিনি ১১ই আষাঢ় প্রত্যুষে দিনাজপুরে আগমন করেন। ১০ই আষাঢ় ডায়মণ্ডজুবিলী থিয়েটার গৃহে সাহিত্য সভার এক অধিবেশন হয়, তাহাতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

ভীষণ খুন। (প্রেরিত)

চোগমল পেরিওয়ালের হত্যা সম্বন্ধে সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রে হরিপুরের একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী গোগাড়ী করিয়া কার্য্যোপলক্ষে ঠাকুরগাঁও যাইতেছিল। গ্রাম হইতে ৩।৪ মাইল দূরে পথের ধারের জঙ্গল হইতে কয়েকজন আততায়ী আসিয়া গাড়ীখানি উল্টাইয়া দেয় এবং মাড়োয়ারীর মস্তকে এবং অন্যান্ত স্থানে ভীষণ আঘাত করে, ইহাতে শীঘ্রই সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। শকটচালক প্রাণভয়ে পালাইয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকজনগণের আশ্রয় লয়। একা পাইয়া আততায়ীগণ নিরাপদে তাহাদের কার্য্য সম্পন্ন করে। সঙ্গে যে টাকাকড়ি বা অলঙ্কার ছিল তাহা স্পর্শও করে নাই,

মাত্র আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়াই এই নৃশংস কার্য্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উক্ত ব্যবসায়ীর মস্তকের পশ্চাৎভাগের খুলী একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং দিনাজপুর সদর হাঁসপাতালে কয়েকদিন চিকিৎসার পর মারা গিয়াছে। এই ঘটনার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ লোকসাধারণের বড়ই আতঙ্ক হইয়াছে। কার্য্যোপলক্ষে মহকুমা ইত্যাদি স্থানে যাতায়াত গোশকটই এতদঞ্চলের একমাত্র সম্বল। তদপর রাস্তার ধারে জনপ্রাণীর সাক্ষাত বা লোকালয় বড়ই কম কেবল অনন্ত বনজঙ্গলের সমষ্টি। ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান খাতকের সহিত দেনা পাওনা লইয়া তুমুল বাকযুদ্ধ চলিতেছিল। ঘটনার দিবস উক্ত খাতকের নামে নালিশ দায়ের জন্যই যাইতেছিল এবং উক্ত দিবস নালিশদায়ের করা হইবে এই ভয় দেখাইয়া জানান হইয়াছিল। উহাতে খাতক ক্রুদ্ধ হইয়া মহাজনের শ্রাদ্ধ ভোজ খাইবে বলিয়া শাসন করে। তাহার পরেই রাত্রি ১২টার সময় এই লোমহর্ষণ ঘটনা। স্থানীয় পুলিশ এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া পরদিনই উক্ত খাতক এবং আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া মহকুমায় চালান দেয় পরে উক্ত সন্দেহ ক্রমে প্রকৃত বলিয়া প্রকাশ পায়, উহাদের মধ্যে দুইজন নাকি সরলভাবে তাবৎ বিষয় স্বীকার করিয়াছে এবং আঘাতজনিত রক্তের দাগ কাপড়ে পাওয়া গিয়াছে। জানিতে পারা গেল মহকুমায় উক্ত আসামীগণ জামিনে খালাস পাইয়াছে। জানু মহাম্মদ সরকারের উত্তেজনায় এবং তাহার ভয়েই অন্যান্য ব্যক্তি সম্মতি জ্ঞাপন করে বলিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই প্রকাশ করিয়াছে। স্থানীয় পুলিশের তড়িৎ অনুসন্ধানের ফলে পুলিশের যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা আশা করি সুবিচারে প্রকৃত অপরাধীগণের উপযুক্ত শাস্তি বিধান হইবে।

তায় পশুহত্যাও ইহা অপেক্ষা অধিকতর দয়ার সহিত পরিচালিত হয়। বিস্ময়ের বিষয় পাঞ্জাবের এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ওডায়ারের প্রশংসা বৃদ্ধি হইল; এবং আমাদের ভাগ্যবিধাতা নির্ব্বিকারচিত্তে তৎসম্বন্ধে উদাসীন হইয়া রহিলেন। আজ ডায়ারের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সমস্ত সভ্য সমাজ চমকিত হইয়া উঠিয়াছে। সামরিক আইনের এই দারুণ অপব্যবহারের জন্য কি আমাদের প্রতিকারপ্রার্থী হওয়ার সময় উপস্থিত হয় নাই? পঞ্চনদের পবিত্র ভূমি রঞ্জিত করিয়া আকাশ হইতে যে সমুদয় মৃত্যুগর্ভ গোলক নিরস্ত্র জনগণের উপর পতিত হইল আর কখন ভারতের হতভাগ্য অদৃষ্টে তাহাদের আবির্ভাব সম্ভব না হয় তজ্জন্য আমাদের বদ্ধপরিকর হইতেই হইবে; এবং যে পর্য্যন্ত এই পাশব মার্শেল ল'র ব্যবহার সম্বন্ধে আদেশ ও উপদেশ দিবার ক্ষমতা ভারতবাসী নিজ হস্তে লইতে সমর্থ না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ ক্ষমতা লাভের জন্য আমাদের চেষ্টা করা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের বিবেচিত হওয়া উচিত।

বন্ধুগণ,

এই দারুণ সংগ্রামে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহায়তা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত অসাধারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করিলে চলিবে না যে ধর্ম্মের জন্য আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের যে ঐকান্তিকতা আছে তাহা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণেরও আদর্শযোগ্য। যে কারণেই হউক যখন তুরস্ক সম্রাট এই সময়ে ব্রিটিশ ও অন্যান্য মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিলেন তখন ভারতীয় মুসলমানগণ কিরূপ ব্যবহার করিবেন তাহা সমস্ত পৃথিবীরই উৎকণ্ঠার বিষয় ছিল। এই ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হওয়ার পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে যে সমুদয় সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ভবিষ্যতে

যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও অন্যান্য শক্তি কি সুবিধা ও অসুবিধা লাভ করিতে পারে তাহার কল্পিত চিত্র ঐ সমুদয় পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছিল। বার্ণার্ডির Germany and the next war নামক যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ভারতবাসীগণকে গোপনে গোপনে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধ সময়ে কিরূপে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করা যাইতে পারে তাহার একটি পরিকল্পনা চিত্রিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ কৈশর যখন তুরস্ক সম্রাটকে এই যুদ্ধে আকর্ষণ করিলেন তখন এই ভারতে মুসলমানগণের মধ্যে যে একটা অশান্তির ভাব সৃষ্টি করিয়া তাহা দ্বারা ইংলণ্ডের বল ধ্বংস করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন না, তাহা বলা যায় না। কারণ আপনারা সকলেই জানেন যে তুরস্ক সম্রাটকে জগতের মুসলমানগণ খলিফা বলিয়া ধর্ম্মরাজ্যে অতি উচ্চ আসন দিয়া থাকেন, তাঁহাদের যে সমুদয় পবিত্র মন্দির ও পবিত্র স্থান আছে তাহার রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া এবং ঐ সকল স্থানে একমাত্র খলিফারই ন্যায্য অধিকার আছে বলিয়া মনে করেন। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ এই দারুণ উৎকণ্ঠার সময় কোন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার কোনও কাল্পনিক চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব না, কিন্তু যুদ্ধ অবসানের পূর্ব্বে রচিত আমাদের ভারতীয় Secretary of State মহামতি মণ্টেগু প্রণীত Report on Indian Constitutional Reform নামক পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। এই গ্রন্থের ষড়বিংশতি প্যারায় লিখিত হইয়াছে যে " A fresh difficulty presented itself when Turkey entered the war against us in November 1914: The Germans counted certainly on being able to stir up disaffection in India and lost no

labour in trying to persuade Indian Mahamedans that Turkey was engaged in a Jihad or holy war, and that it was their religious duty to take sides against England and her Allies. These enemy attempts wholly failed to affect the great mass of the Muslim Community. Keenly as they felt the painful position in which they were placed, they were admirably steadied by the great Muhammedan princes and nobles and preserved an attitude of firm loyalty which deserves our praise and sympathy." অর্থাৎ "যখন ১৯১৪ সালে তুরস্ক আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তখন নূতন বিঘ্নের উদ্ভব হইল। জার্ম্মাণগণ ভারতে অশান্তির সৃষ্টি করিতে সফলকাম হইবেন এই ধারণা করিয়াছিলেন এবং তাহারা নানারূপ উপায়ে ভারতীয় মুসলমানগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে তুরস্ক ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং ধর্ম্মের নির্দেশক্রমে মুসলমানগণ ইংলণ্ড ও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য। এই দুশ্চেষ্টা ভারতের অগণিত মুসলমানগণকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। যদিও তাহারা এই বিসদৃশ অবস্থায় একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন তথাপি মুসলমান রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের চেষ্টায় তাহারা স্থিরভাবে সুদৃঢ় রাজভক্তির আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহাদের এই আচরণ আমাদের প্রশংসা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে।"

বন্ধুগণ,

আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের এই রাজভক্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তৎকালে

সকলেরই প্রশংসার বিষয় ছিল এবং তাহাদের আত্মত্যাগে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া তাহাদের এই অবিচলিত রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে যদি ভবিষ্যতে খলিফার সম্বন্ধে সমস্যার সমাধান করা আবশ্যক হয় তবে তাহা ভারতীয় ও অন্যান্য স্থানের মুসলমানগণ কর্তৃক সাধিত হইবে. মুসলমানের কোনও শক্তি তৎবিষয়ে কোনও রূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমি যে প্যারা হইতে পূর্ব্বাংশ সকল উদ্ধৃত করিয়েছি ঐ প্যারাতেই আপনারা নিম্নোক্ত কথাগুলি দেখিতে পাইবেন, " In this attitude they were greatly helped by the public assurance given by His Majesty's Government to the effect that the question of Khalifate is one that must be decided by Muslims in India and elsewhere without interference from non-Muslim Power." পার্লিয়ামেণ্টের যে অধিবেশনে খালিফাৎ সম্বন্ধে প্রস্তাবের বাদানুবাদ হয় সেই সভাতেও Prime minister গভর্ণমেণ্টের এই অঙ্গীকারেই পুনরুক্তি করিয়াছেন।

কিন্তু হায়, আজ যখন তুরস্কের ভাগ্যমীমাংসার দিন সমাগত হইয়াছে তখন হঠাৎ ইংলণ্ডে একশ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা গভর্ণমেণ্টের এই প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের মর্য্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করেন না। তুরস্কের কুশাসনের দোহাই দিয়া খলিফার প্রধান তক্ত হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া সমুদয় তুরস্ক রাজ্য ক্ষতবিক্ষত করিয়া, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা ভাগ করিয়া খলিফ নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য ভেরী বাজাইয়াছেন; এবং স্বার্থপ্রিয় ও ক্ষমতাপ্রিয় জনসাধারণ তাহাদের

পতাকাতলে সম্মিলিত হইতেছেন। সমুদয় মুসলমান সমাজ ক্ষুব্ধ ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে—এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের আশঙ্কায় ও ভবিষ্যতে খালিফতের ভাগ্য বিপর্য্যয় সম্বন্ধে শোকাকুল হইয়া তাহারা নানারূপ উপায়ে তাহাদের গভীর ক্ষোভ ও মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা ভবিষ্যতে কি করিবেন তৎসম্বন্ধে যে সমুদয় উত্তেজনাময় উক্তি করিতেছেন তাহার সহিত আমাদের সহযোগিতা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন; এবং ঘোর উত্তেজনার কারণ হইলেও আমরা আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণকে ধীর ও স্থিরভাবে আপনাদের কার্য্য প্রণালী নির্দ্দেশ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু তাহাদের এই ঘোর আশঙ্কাময় সময়ে আমরা তাহাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যাহারা গৃহবিচ্ছেদে আনন্দ লাভ করেন তাহাদের মধ্যে অনেকে আজ মুসলমানেতর ব্যক্তিগণকে এই আন্দোলন হইতে দূরে থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন এবং প্রশ্নটী কেবল মাত্র মুসলমান সম্প্রদায়েরই বিচার্য্য বলিয়া অন্য সম্প্রদায়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সত্যই কি আজ এই প্রশ্নটা কেবলমাত্র মুসলমান ভ্রাতৃগণেরই নিজস্ব? আজ কি এই বিষয়টীর সমাধানের উপর ভারতের ভবিষ্যত আশা নির্ভর করিতেছে না? আজ কি আবার নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে যে সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মমত অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য যে অধিকার তাহা যে মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার সম্বন্ধে কোনও জাতিগত অথবা সম্প্রদায় গত বৈষম্য নাই? আজ কি আবার নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে যে খলিফাৎ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য গভর্ণমেন্ট যে পবিত্র অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছেন, কাহারও প্রভাবে সেই অঙ্গীকারের বিচ্যুতির প্রস্তাবও ভারতের পক্ষে আশঙ্কা জনক; কারণ আমরা যে অধিকারই লাভ করি না কেন, তাহা প্রায়ই

অতীত অঙ্গীকারের দাবীতে আমরা লাভ করিতেছি। আজ যদি কোনও সম্প্রদায় বিশেষের চেষ্টার ফলে কোনও একটী ত্রুটী অথবা অপরাধের ব্যপদেশে সেই অঙ্গীকার পরিহার করা সম্ভব হয় তবে ভারতের ভবিষ্যতের আশা ভরসা এমন একটি অনিশ্চিত ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে যে তাহার ভাগ্যাকাশে কখন কোন্ কালোমেঘের উদয় হইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। আরও একটী বিশেষ কারণে আমরা আজ মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহিত সমস্বরে এই খালিফতের বিরুদ্ধ অভিযান সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতেছি। আজ ভারত নূতন শক্তি নূতন বল লাভ করিবার আকাঙ্খায় এক নূতন ভাবে কার্য্যকরী শক্তিকে পরিচালিত করিতেছে। সেই শক্তি পঙ্গু ও দুর্ব্বল হইবেই হইবে যদি আমরা আমাদের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য না ভুলিয়া একমনে একপ্রাণে পরস্পরের সাহায্যে অগ্রসর না হই—পরস্পরের দুঃখের ও বিপদের দিনে তাহাদের পার্শে গিয়া দণ্ডায়মান না হই। গৃহ বিচ্ছেদের ভীষণ অনলে ভারত বহুদিন ধরিয়া পুড়িয়াছে; তাহার তীব্র হলাহলে তাহার সমুদয় শক্তি নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। যেখানে গৌরব সম্ভব ছিল সেখানে অবমাননা পাইয়াছি; যেখানে অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভব ছিল, সেখানে চির দারিদ্র্য আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি। এই ভ্রম যখন উভয় সম্প্রদায় আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি এবং তাহার ফলাফলে উভয় সম্প্রদায়ই অশান্তির দারুণ ঝঞ্ঝায় আলোড়িত হইয়াছেন তখন সুসময় থাকিতে আমাদের হাত ধরাধরি করিয়া এই বিচ্ছেদের দৈত্যকে দেশ হইতে বিতাড়িত না করিতে পারিলে এদেশের অদৃষ্টে বিধাতা পুরুষ কত দুর্ভাগ্য অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায় না। তাই আজ আমরা পরস্পরে পরস্পরের বিরুদ্ধবাদীগণের স্বার্থময় প্রতিবাদ উপেক্ষা

করিয়া গভর্ণমেণ্টকে মুসলমান সম্প্রদায়ের বাধা দূর করিয়া আপন পবিত্র অঙ্গীকারের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য এই অনুরোধ করিতেছি।

বন্ধুগণ,

গত ইংরাজী বৎসরের শেষ ভাগে আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন সম্রাটের যে ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ঘোষণা পত্রের ফল লাভের আশা এখন সুদূর ভবিষ্যতের হস্তে ন্যস্ত বটে কিন্তু ভারতবাসীগণের মন হইতে সন্দেহ ও সংশয় অনেকটা দূর হইয়াছে। এই ঘোষণা পত্র ভারতবাসীগণের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম অঙ্গীকার পত্র। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্বন্ধ কি তাহা অনিশ্চয়তার তিমিরে আবৃত ছিল। এই ঘোষণা পত্রে ভারতীয় শাসন কার্য্য বিষয়ক নূতন আইনে ভবিষ্যতে ভারতের পূর্ণ গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রণালীর পথ নির্দ্দেশ করিতেছে—("The act point the way to full Representative Government hereaftor, ") দ্বিতীয়তঃ নিজ আভ্যন্তরিক শাসন কার্য্যের ভার নিজের স্কন্ধে লইবার আকাঙ্খা যে ভারতের বিধি সঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত অধিকার তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। "The control of her domesti concerns is a burden India may legitimately aspire to taking upon her shoulders" তৃতীয়তঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পূর্ণতা লাভ যে তাহার কাম্য তাহাও আমাদের সম্রাট প্রকারান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন— "I pray to Almighty God that India may grow to the fulness of political freedom."

জানিনা কবে কোন ভবিষ্যতের মহামহিমান্বিত অঙ্কে আমাদের জনপ্রিয়

...টের এই সরল প্রার্থনা সফলতার ফলে পুষ্পে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু ...র এই গৌরবময় উক্তিতে আমাদের মৃতপ্রায় আশালতার জীবনীশক্তির ...র হইয়া উঠিয়াছে। সম্রাট ঘোষণা পত্রে রাজ কর্ম্মচারী ও জনসাধারণের ...পরের ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিয়া একত্রে এক মনে ভারতের জন্য ...রবময় ভিত্তি স্থাপনের যে আন্তরিক অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা ... উদার ও সদ্ভাব পূর্ণ।

এই ঘোষণা পত্রের মহৎ ভাব ও মহৎ প্রার্থনা কি প্রতিপালিত হইবে? ...সম্রাটের ঐকান্তিকতায় অনুপ্রাণিত হইয়া রাজপুরুষগণ Imperialism ...লিয়া, অন্তরের সহিত ভারতবাসিকে ভালবাসিয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন ...মনে হয় সত্য সত্যই যেন ভগবান সম্রাটের এই অকপট প্রার্থনায় কর্ণপাত ...রিবেন। "With all my people, I pray to Almighty God that by His wisdom and under His guidance India may be led to greater prosperity and contentment and may grow to the fulness of political freedom"

"আমি প্রজাবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া সমকণ্ঠে সর্ব্ব শক্তিমান ...গবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহার কৃপায় ও মহিমায় ভারতবর্ষ ...ন ভাবে পরিচালিত হউক, যাহার প্রভাবে উহার সমৃদ্ধি ও শান্তি তুষ্টি ও ...তির পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় এবং ভারতবাসী পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে ...র্য্যাপ্ত যোগ্যতা লাভ করে।"

বন্ধুগণ,

এই চিরস্মরণীয় ঘোষণা পত্রে সম্রাট রাজনৈতিক অপরাধীগণের প্রতি

দিনাজপুর পত্রিকা।

(মাসিক)

সপ্তবিংশতি ভাগ } শ্রাবণ, ১৩২১। } ১১শ সংখ্যা

রামসাগর।

(দিনাজপুর সহরের নিকটবর্ত্তী রামসাগর নামক
বনসজ্জিতা সুপ্রশস্তা দীর্ঘিকা দর্শনে লিখিত)

——:*:——

নির্মল মেঘের মাঝে স্থাপিত দর্পণ যথা,
মরকত মণিহারে অলঙ্কার যেন গাঁথা,
নীলবর্ণ চন্দ্রাতপে রৌপ্যধারা জল জলে
শ্যামল প্রান্তরে শোভে অতি মনোহর,
দিনাজপুরের কীর্তি রাম সরোবর।

বিশাল শ্যামল ক্ষেত্র দিগন্তে মিশায়ে যায়,
হেথা হোথা বৃক্ষ কোন উচ্চশিরে খাড়া রয়,
প্রশস্ত আসর মাঝে, শান্তির রক্ষণ কাযে,
শান্তির রক্ষক যথা থাকে দাঁড়াইয়া,
শাখারূপ হস্ত নাড়ি শান্তি ছড়াইয়া।

বিমল স্ফটিক সম নির্ম্মল শীতল জল,
আন্দোলিত সমীরণে করিতেছে ঝলমল,
তপন তাপিত দেহ, করে সদা অবগাহ
ধরিয়ে সহস্র মূর্ত্তি যাহার ভিতর,
দিনাজপুরের কীর্ত্তি সে রামসাগর।

সারাদিন সমীরণ খাটিয়া পৃথিবীময়,
ক্লান্তদেহে সায়াহ্নেতে যেথা সমাগত হয়,
পরশি যাহার জল, হয়ে নিজে সুশীতল,
জুড়ায় সুস্নিগ্ধ স্পর্শে শরীর অন্তর,
বঙ্গেতে অতুল কীর্ত্তি সে রামসাগর।

বসিলে যাহার তীরে হয় তাপ অপগত
যেন কি নবীনভাবে দেহ মন অভিভূত;
কত কথা স্মৃতে উঠে কল্পনার স্রোত ছুটে
ভুল হয় মায়া মোহ বিষয় সংসার,
এমন দুর্লভ স্থান নাহি বুঝি আর।

সরের উত্তর তটে আছে ভগ্ন দেবালয়,
সময়ে দেবতার্চ্চনা দৈনিক হত যথায়,
এবে তাহা ভগ্নস্তুপে অতীতের সাক্ষিরূপে
বর্ত্তমান, করে যেন তীব্র তিরস্কার,
কলস্বনে সবিষাদে রাম সরোবর

ধন্ত রাজা রামনাথ দিনাজপুরের পতি,
স্বরগ সোপান সম রাখিলে কীর্ত্তি মহতী,
শ্রান্ত ক্লান্ত পিপাসিত কতপ্রাণী তিঃপিত,
গাহিতেছে শতকণ্ঠে জয় জয় গান.
উর্দ্ধতর হইতেছে স্বর্গে অবস্থান।

কোথা সে সুদিন গত হৃদয় উচ্চ উদার,
রাজা প্রজা পিতাপুত্র যেন এক পরিবার,
রাজা যবে ব্যগ্রমনে, প্রজার হিত সাধনে
নিরত থাকিত রত, তাদেরি কারণ,
প্রজাহিতে হ'ত কত দীঘিকা খনন।

পূর্ব্বকালে হেন কীর্ত্তি কতই সাধিত হ'ত,
অন্ন বস্ত্র জলদানে ধনীরা থাকিত রত;
খনিত হইত সর, প্রতিষ্ঠিত দেবাগার,
(এখন) নুতন দূরের কথা না হয় সংস্কার
কত ভগ্ন দেবালয় শুষ্ক সরোবর।

উপরি পাওনা।

—:*:—

রামদাসের বাড়ী কোথায় কিম্বা তাহার পরিচয় সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তাহার শৈশবে পিতৃবিয়োগ ঘটে। আত্মীয় স্বজন অনেকে ছিল কিন্তু তাহার ভার কেহ গ্রহণ করে নাই। কাজেই তাহাকে তাহার জননীর সহিত পিতৃপরিত্যক্ত গৃহেই বসবাস করিতে হইয়াছিল। সামান্য কিছু জমি জমা ছিল তাহারই সামান্য আয়ে তাহাদের খাওয়া পরা এক প্রকারে চলিয়া যাইত। পল্লীগ্রামের সরল লোকযাত্রার মধ্যে রামদাস বর্দ্ধিত ও পালিত হইয়াছিল। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যৎসামান্য আক্ষরিক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া অথবা লেখাপড়া শিখিয়া রামদাসের মনে আধুনিক বাবুদের ছায়াপাত হইয়াছিল। সে আর কায়িক পরিশ্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহিত না। জমি চাষ আবাদ করা, ঘর গৃহস্থালীর কায কর্ম্ম করা সে অতি হেয় বা নীচ জনের কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিত। এইরূপে বাল্য কৈশোর অতিক্রম করিয়া রামদাস বিংশতি বৎসর জীবনের অতিবাহিত করিয়া ভোগবিলাসের তাড়নায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার জননীও একমাত্র পুত্রের এবম্প্রকার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ শোকে জরাজীর্ণ হইয়া রামদাসকে জীবন সংগ্রামে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইতে সুযোগ দিয়া মানব জীবনের শেষ তীর্থদর্শনে একদিন প্রদোষ কালে চলিয়া গেলেন। রামদাস যথাবিধি জননীর পারলৌকিক ক্রিয়া

ক্রিয় সমাধান করিয়া সমবয়স্কদিগের সহিত পল্লীগ্রামের মধ্যেই বাস করিতে থাকিল। ক্রমে বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতে রামদাসের সমস্ত জমি জমা বিক্রয় হইয়া গেল। রামদাসের আর অশনবসনের কোন উপায় থাকিল না। শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত না থাকায় সে কোনও কায কর্ম্ম করিতে পারিত না সুতরাং তাহার কোন আয়ের পন্থাও ছিলনা। বন্ধুগণও ক্রমে রামদাসের সঙ্গ ত্যাগ করিল। রামদাস তাহাদের বাড়ী গেলেও তাহারা বিরক্ত হইত। রামদাসকে আর কেহ জিজ্ঞাসাও করেনা। অনাহারে তাহাকে থাকিতে হইত। এমন অবস্থায় রামদাসের মনে গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার অভিলাষ হইল। কিন্তু বাহিরে যাইবে কাহার নিকট? সে যে কোন স্থান চিনেনা। বিষম সঙ্কটে পড়িয়া রামদাস পরিচিত লোকের নিকট ও বাল্যবন্ধুর নিকট কিছু পাথেয় স্বরূপ কিছু কর্জ্জ চাহিল। বন্ধুগণ কেহ তাহাকে সাহায্য করিল না। রামদাস বাল্যবন্ধুদিগের উপর বিরক্ত হইলেও তাহাদের পাছে পাছে ঘুরিতে লাগিল। তাহার জীবনোপায় কিছুই ঘটিয়া উঠিল না। গ্রামের মুরুব্বিদের নিকট উপদেশ চাহিলে তাঁহারা বিনা সম্বলে পথ চলিতে নাই এই উপদেশ দিতেন এবং বিদেশের নানা দুঃখ কষ্টের কথা বর্ণনা করিয়া তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিতেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া রামদাস দুঃখকে আপন করিয়া লইয়া গ্রামেই থাকিবে সংকল্প করিল। গ্রামের কয়েকজন মোড়ল ও মুদির হিসাবের খাতা লিখিবার চাকুরী লইয়া কোনরূপে দিন যাপন করিতে লাগিল।

গ্রামে একজন কায়স্থ ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি [illegible]

জমিদারের গ্রাম্য কাছারীর নায়েব ছিলেন। তাঁহার মুনিবের সংখ্যা অনেক ছিল। এই পাঁচজন মুনিবের নিকট দশটাকা মাহিনা বাবত মাসে পাইতেন। যে কাছারীতে তিনি চাকুরী করিতেন তাহার মুনিবদের সেখানে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা আদায় ছিল। জমিদারেরা কেহ কোনদিন তথায় যাইতেন না। নায়েব যাহা করিতেন তাহাই হইত। দেখিবার লোকের অভাবে নায়েবই জমিদার সাজিয়া বসিয়াছিলেন। রামদাসের গ্রামে কেবলমাত্র তিনিই একজন চাকুরে ও যোত্রশালী লোক ছিলেন। তাঁহার ছোট ছোট দুইটি লেখাপড়া শিখার বয়সের ছেলেও ছিল। আমরা নায়েব মহাশয়কে নায়েব মহাশয় নামে অভিহিত করিব। অধুণা তাঁহার নায়েবত্বের সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। নায়েব মহাশয় অনেক দিন পর বাড়ী আসিয়াছেন। ছুটী বেশীদিনের নাই, খাজানা আদায়ের কিস্তিও নিকটে, তাই নায়েবমহাশয় আপনার বাড়ী ঘরের কাজ কর্ম্ম তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহার গ্রাম্য বন্ধুবান্ধবেরা সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকট আনাগোনা করিতেছেন। কেহবা তাঁহার নিকট গ্রামের পথঘাটের কথা বলিতেছেন, কেহবা গ্রামে একটা পাঠশালা স্থাপনের কথাও বলিতেছেন। নায়েবমহাশয় গম্ভীর মূর্ত্তিতে তাহা শুনিয়া যাইতেছেন। যে গ্রামে নায়েবমহাশয়ের বাস সে গ্রামের জমিদার ও তাঁহার মুনিবেরা বিদেশে বহুদূরে সামান্য সম্পত্তির আদায় তহশীলের, জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত না করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ মানসে তাঁহাকেই তাঁহারা তহশীলদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। জমিদার-দিগের তহশীল বাড়ী নায়েবমহাশয়ের বাড়ী হইতে বড় বেশী দূরে নয়।

রামদাস জমিদার বাবুদিগকে বুঝাইতেন উত্তরের প্রজা বড় দুষ্টপ্রকৃতির, তাহারা খাজনা সহজে দেয় না বহু খাজানা বাকী মহালে পড়িয়াছে। বিনা নালিশে খাজনা আদায় হইবেনা। জমিদারেরা কেহই কাহেচারীতে হিসাব পৃথক করেন নাই। সম্পত্তিও বাঁটোয়ারা করেন নাই। কাজেই পাঁচজন একত্র না হইলে আর বাকী খাজনার নালিশ চলেনা। তাঁহারা এযাবৎ পর্য্যন্ত এজমালীতেই নায়েবের দ্বারায় আদায় তহশীলের কার্য্য করাইয়া, আদায়ী টাকা সকলে অংশমত লইতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের কোনও বিষয়ে কাহারও মিল ছিল না। নায়েবমহাশয় এবার বাড়ী আসিয়া গ্রাম্যলোকের অনুরোধে আপন পুত্রদ্বয়ের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য এক আপন বাড়ীর বাহির ঘরে এক পাঠশালা বসাইলেন এবং রামদাসকে ছাত্রদত্ত বেতন সন্তুষ্ট হইয়া সেই পাঠশালার পণ্ডিত হইতে হইল। রামদাস মনোযোগের সহিত পাঠশালার কার্য্য করিতে লাগিল। লোক চক্ষে ঘৃণিত রামদাস পাঠশালার পণ্ডিত হইয়া গ্রামের লোকের নিকট কিছু কিছু আদর যত্ন পাইতে লাগিল। রামদাসও পূর্ব্ব সব কথা ভুলিয়া যাইতে লাগিল। নায়েব মহাশয়ও কিছুদিন বাড়ী থাকিয়া রামদাসের হাতের লেখা ও ধারাপাত ও শুভঙ্করের আর্য্যার জ্ঞানের আলোচনা দেখিয়া তাহাকে আপন নায়েবী কার্য্যের সহকারী করিতে ইচ্ছা করিলেন। রামদাসেরও এইভাবে জীবনের কয়েকমাস কাটিয়া গেল কিন্তু সে তাঁহাকে পাক করিয়া খাওয়াইতে অস্বীকার করায় সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন।

রামদাস অবসর মত নায়েব মহাশয়ের নিকট বসিয়া তাঁহার চাকুরীর কথা শুনিত। কথা বার্ত্তায় রামদাস বুঝিতে পারিল যে প্রজারে নিকট

পার্ব্বনী ছেলামী প্রভৃতিতে অনেক টাকা পাইয়া থাকেন। বিদেশে যৎকিঞ্চিৎ চাকুরীতে "দুধভাত"। রামদাস মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে কিছু পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে পারিলে চাকুরীর অন্বেষণে বাহির হইবে। তাহার সুযোগও আপনা হইতে উপস্থিত হইল। নায়েব মহাশয় তাহার দ্বারায় তাঁহার নিকাসের কাগজ নকল করাইয়া লইবার সংকল্প করিলেন। সমস্ত কাগজ নকল করিয়া দিলে রামদাস দশটাকা পাইবে ইহাই বন্দোবস্ত হইল। অগত্যা রামদাস তাহাই অঙ্গীকার করিল।

রামদাসের কাগজ নকল যত সত্বর সম্ভবে কার্য্য শেষ হইল। নায়েব মহাশয়ও যথা কালে তাঁহার নিকাশী কাগজ দাখিল করিতে গেলেন। জমিদারী সেরেস্তার সনাতন নিয়মানুযায়ী নায়েব মহাশয় সদর আমলাগণকে প্রণামী দিয়া কাগজ দাখিল কার্য্য শেষ করিয়া বাটী ফেরত আসিলেন। হতভাগ্য রামদাস তখনও তাহার পারিশ্রমিক পায় নাই। নায়েব মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "বাপুহে তোমার কাগজে এত ভুল হইয়াছিল যে সদরে যাইয়া আমাকে নূতন করিয়া কাগজ লিখিয়া দাখিল করিতে হইয়াছে।" রামদাস কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইল। নায়েব মহাশয়ও কিছুকাল পরে আপন কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। রামদাস বুঝিতে পারিল এসংসার দরিদ্রকে ঠকাইয়া বড়কে কেবল বড় করিতেই জানে।

নায়েব মহাশয় চলিয়া গেলে কিছুদিন পর রামদাসের পাঁচটী টাকা সম্বল হইল। পাঠশালার কায কর্ম্ম করিয়া মুদির দোকানের হিসাবে খাতা লিখিয়া কাল কাটাইতে লাগিল। মনে সর্ব্বদা তাহার আকিঞ্চন যে সে বিদেশে যাইয়া একবার তাহার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। বিদেশে কেহ পরিচিত নাই, কোথায় কাহার নিকট যাইয়া দাঁড়াইবে, যদি পীড়িত হইয়া পড়ে তবে কি হইবে তাহার এই ভয়ে গ্রামের বাহিরে

যাইতে তাহার সাহস হইত না। মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিত। এইভাবে সে সময় স্রোতে ভাসিয়া চলিল।

সহসা রামদাসের একটা সুযোগ উপস্থিত হইল। রামদাসের প্রতিবেশী একজন কৃষকের জমিদারের খাজনার গোলমাল মিটাইবার জন্য জমিদারের বাড়ী যাইবার দরকার হইল। কৃষক রামদাসের সাহায্য প্রার্থনা করিল। রামদাসও আনন্দে তাহার সহিত যাইতে স্বীকার করিল। কৃষক একদিন সুদিন দেখিয়া রামদাসকে সঙ্গে করিয়া গ্রাম হইতে বাহির হইয়া গেল। রামদাসের অদৃষ্ট পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

কৃষক জমিদার বাড়ী পৌঁছিয়া রামদাসের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার খাজনার হিসাব মিটাইয়া ফেলিল। রামদাস দাখিলা দেখাইয়া প্রমান করিয়া দিল তাহার নিকট জমিদারের খাজনা কপর্দ্দক বাকী নাই। জমিদারের তহশীলদার শত্রুতা করিয়া তাহার নামে বাকী দেখাইয়া ছিল। কৃষকের দরবার শেষ হইলে সে দেশে যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু রামদাস দেশে আর ফিরিয়া যাইতে সাহস করিল না। তহশীলদার অপমানিত হইয়া রামদাসের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। রামদাস জমিদারের বাড়ী থাকিয়া গেল। কোন চাকুরী সে পাইল না তবে জমিদারের এক পুত্রের বিনা বেতনে বাজার সরকারের কাজ পাইল। জমিদারের বাজার সরকার হইবার একমাস পর রামদাসের কাজ কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মুনিব তাহার মাসিক তিন টাকা বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। সন্তুষ্টচিত্তে রামদাস জমিদারের কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহার কোন ব্যয় নাই। জমিদারের বাড়ীতে ভোজন

জমিদারের পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিল।

একদিন তাহার মুনিব মফস্বলে জমিদারী দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন: সকল প্রকার উদ্যোগ আয়োজন শেষ হইল। জমিদার সফরে বাহির হইলেন। রামদাসও জমিদারের সঙ্গে চলিল। তাহার অদৃষ্টচক্র আর এক পাক ঘুরিল।

জমিদার নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আমাদের পরিচিত নায়েব মহাশয়ের কাছারীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রজারা জমিদারের সন্দর্শনার্থে প্রতিদিন দলে দলে কাছারীতে আসিতে লাগিল। কিন্তু নায়েব মহাশয়ের কৌশলে প্রজাদের সহিত আর জমিদারের দেখা সাক্ষাৎ ঘটিয়া উঠিল না। ব্যাপার বুঝিয়া প্রজারা রামদাসের শরণ লইল। তাহারা রামদাসকে তাহাদের দাখিলা দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল জমিদারের খাজনা তাহাদের বাকী নাই।

প্রজাদের সহিত রামদাসের এইভাব দেখিয়া আমাদের নায়েব মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন রামদাস তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রজাদিগকে বশ করিবার জন্য তিনি নানাপ্রকার যত্ন চেষ্টা করিলেন কিন্তু সাধারণ প্রজা কিছুতেই তাঁহার বশে আসিল না। নায়েব মহাশয়ের প্রতারণায় তাহারা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়াছিল।

নায়েব মহাশয় মণ্ডল পরামাণিক ও প্রধান প্রধান প্রজাদের বন্ধু ছিলেন। তাহাদের খাজনা আদায়ে কোন গোলযোগ করিতেন না এবং তাহাদের নিকট পার্ব্বণী ছেলামী প্রভৃতি বাবদ কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন

না, কেবল তাহাদের সাহায্যে গরীব নিরীহ প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে গরীবের প্রতি অত্যাচারই প্রধানের কর্ত্তব্য।

জমিদার বাবু কাছারীতে আসিয়া প্রজার নিকট আগমনী বলিয়া কিছুই লইবেন না বলিয়া ঘোষণা করেন। নায়েব মহাশয়ের নিকট হইতে দৈনিক পাঁচ টাকা লইয়া নিজের উপস্থিত খরচপত্র চালাই রামদাস প্রতিদিন সেই পাঁচ টাকা নায়েব মহাশয়ের নিকট হইতে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনিয়া আনিত ও খরচের রীতিমত রাখিত।

নায়েব মহাশয়ের কাছারীর নিকট মুদিখানার একখানা দোকান ছিল। দোকানখানা বড়। পাড়াগাঁয়ের আবশ্যকীয় সকল জিনিষ দোকানে পাওয়া যাইত। বিলাস সামগ্রীও সে দোকানে বিক্রয় নায়েব মহাশয় সেই মুদির সহিত ষড়যন্ত্র করিলেন। রামদাস দোকান হইতে যত জিনিষ লইত তাহার নগদ মূল্য দিত, কিছুই বাকী রাখিত নায়েব মহাশয়ের কৌশলে ঠিক হইল জমিদার মহাশয়ের কাছারীতে আগমন হইতে রামদাস যে সমস্ত দ্রব্য লইয়াছে সমস্তই বাকী আর নায়েব মহাশয়ের প্রদত্ত দৈনিক খরচা পাঁচটাকা সে বা চুরী করিয়াছে। রামদাস বাজার খরচের পয়সাচোর।

মুদির নাম আমরা বলিবনা, বলিবারও কোন আবশ্যক কেননা তাহাতে আমাদের ঐ "উপরি পাওনার" কোনও হইবেনা। নায়েব মহাশয় একদিন প্রাতঃকালে মুদিকে সঙ্গে জমিদার বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে উপস্থিত মুদি

একজন সন্ন্যাসী শিক্ষিত ভদ্রলোক। তিনি পরের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে হুজুরের কাছারীর নিকট একটা দোকান খুলিয়া কারবার করিতেছেন। জমিদার বাবু মুদী মহাশয়কে বসিবার আসন দিতে বলিয়া তাঁহার কারবারের কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ব্যাবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত জমিদার বাবু বুঝিলেন যে মহাশয় শিক্ষিত বটে। মুদি মহাশয় উঠিয়া যাইবার সময় নায়েব মহাশয়কে বলিলেন যে " আপনি যেজন্য আসিয়াছিলেন তাহাতো হুজুরে বলিলেন না "। জমিদার বাবু ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে মুদি মহাশয় বলিলেন " হুজুরের এখানে আগমনাবধি আমার দোকান হইতে রামদাস হুজুরের জিনিষপত্র আনিতেছে—হুজুরের নাম করিয়া—আজ আমার টাকার দরকার হওয়ায় নায়েব মহাশয়কে হিসাব দেখাইয়া টাকা চাওয়ায় বলিলেন যে হুজুর নগদ টাকায় জিনিষপত্র খরিদ করিয়া থাকেন, প্রতি রোজ খরচ বাবৎ টাকা রামদাসকে দেওয়া হয়। আমি গরীব আমার অনেকগুলি টাকা মারা যায়—রামদাসকে বলিলে সে দোকানের বাকী অস্বীকার করে। এখন আমি কি উপায় করি। রামদাস জিনিষ লইয়া দাম দেয় নাই একথা কেহ বিশ্বাস করিবেনা—লোকে বলিবে হুজুরই জিনিষ লইয়া দাম দিলেন না। মুদির কথায় জমিদার বাবুর চক্ষু রাগে রক্তবর্ণ হইল। রামদাসকে ডাকিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসায় সে দৃঢ়তার সহিত মুদির দেনা অস্বীকার করিল। জমিদার বাবু নায়েব মহাশয়কে ডাকিয়া আপনার সুনাম রক্ষার জন্য ব্যাপারটা কি তাহার অনুসন্ধান বিচার না করিয়া রামদাসকে চোর সাব্যস্ত করিয়া পুলিশে দিবার আদেশ

দিলেন। চক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া একজন নিরপরাধ দরিদ্র ব্যক্তি চোরের শাস্তি গ্রহণার্থে পুলিশে প্রেরিত হইল। সুদূর বিদেশে অসহায় রামদাস সহসা রাজশাসনের জালে পড়িয়া সংসার আঁধার দেখিল।

নায়েব মহাশয়ের সহিত পুলিশের দারগা মহাশয়ের বড়ই ভাব। দারগা বাবুর সাহায্যে নায়েব মহাশয় দরিদ্রের রক্তশোষণ করিয়া থাকেন। যথা রীতি নায়েব মহাশয় দারগা বাবুর নিকট এজাহার লিখিয়া পাঠাইলেন। দারগা বাবু এজাহার পাইয়া নায়েব মহাশয়ের কাছারীতে আসিলেন। নায়েব মহাশয় তাঁহার কাছারীর কাগজ পত্রদ্বারা, জমিদারের খানসামা ও পাইক ও মুদি মহাশয়ের দ্বারা রামদাস যে প্রতি রোজ কাছারীর তহবিল হইতে পাঁচটী করিয়া টাকা বাজার খরচ জন্য গ্রহণ করিত তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন। মুদি মহাশয় প্রমাণ দিলেন যে তিনি জমিদারের দৈনিক আবশ্যকীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করিয়াছেন, রামদাস খানসামা পাইক দ্বারায় তাঁহার দোকান হইতে সকল দ্রব্য লইয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহাকে মূল্য বাবদ এক পয়সাও দেয় নাই সমস্ত টাকাই চুরি করিয়াছে। রামদাস দারগা বাবুর নিকট স্বীকার করিল সে বাজার খরচ বাবদ দৈনিক পাঁচ টাকা নায়েব মহাশয়ের নিকট পাইয়াছে। সে টাকা সে কি করিল জিজ্ঞাসা করায় তাহার প্রতিদিনের খরচের হিসাব দেখাইল। বাজারে মাছ দুধ তরকারী পান প্রভৃতি সে কিনিয়াছে আর সমস্ত জিনিসই সে মুদি মহাশয়ের দোকান হইতে নগদ মূল্যে খরিদ করিয়াছে। খরচ পত্র বাদে তহবিলের কিছু মজুত আছে। রামদাসের বাজার খরচের পয়সা চুরির সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়া দারগা বাবু বিচারার্থে তাহাকে

দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে পাঠাইলেন।

যে দিন রামদাসের বিচার হইবে ঠিক সেই দিনই পুলিশ তাহাকে কোর্টে হাজির করিল। সাক্ষী সাবুদ সব হাজির। এক দিনেই বিচার অভিনয় শেষ হইবে। দারগা বাবু রামদাসের স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ করিবার কারণ ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিচারের পূর্ব্বেই আসামীর স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ হইবার নিয়ম, তদনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে রামদাসকে কোর্টের একজন পুলিশ কর্ম্মচারী লইয়া চলিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে আসামীর স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ করিতেন। কোর্টের দারগার প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল যে স্বইচ্ছায় যে ব্যক্তি স্বীকার করিবে কোর্টদারগা কেবল তাহারই স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ করিবার কারণ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত করিবেন। কোন আসামী তাঁহারই নিকট যাইয়া অপরাধ অস্বীকার করিলে তিনি পুলিশের উপর বড়ই বিরক্ত হইতেন এমন কি কর্ম্মচারীকে শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

রামদাসের স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ করিবার কারণ যে পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে লইয়া যাইতেছিলেন তিনি পথে রামদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আরে তুই বাজার খরচের পয়সা চুরি করিয়াছিস"। রামদাস ক্ষোভে রোষে ম্রিয়মান ছিল। পুলিশের কর্ম্মচারীর এই কথায় যেন চমক ভাঙ্গিল, সে তেজের সহিত বলিল "যাও বাবু যাও, বাবুদের বেলায় লেখা পড়ায় হিসাবের চুরি বাবুদের "উপরি পাওনা, আর আমরা ছোট চাকর, আমরা বাজার

খরচের পয়সা চুরি করিয়াছি । আমরা গরীব ছোট লোক, আমরা চোর, আর বাবুরা বড় চাকুরে বড়লোক" । পুলিশ কর্ম্মচারীর কানে যেন বজ্রধ্বনিতে কে বলিতে লাগিল "বাবুদের উপরি পাওনা" । পুলিশ কর্ম্মচারী কথার ঘাত প্রতিঘাতে বসিয়া পড়িলেন । অনেকক্ষণ কিবা চিন্তা করিয়া রামদাসকে সঙ্গে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সকাশে যাইয়া নিবেদন করিলেন আসামী বাজার খরচের টাকা চুরি করা অস্বীকার করিয়াছে । ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রামদাসকে জিজ্ঞাসা করায় দৃঢ়তার সহিত রামদাসও বলিল "আমি বাজার খরচের টাকা চুরি করি নাই" । ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামী অপরাধ স্বীকার করিলনা লিখিয়া অন্য এক বিচারকের নিকট আসামীকে পাঠাইলেন ।

পুলিশ কর্ম্মচারী রামদাসকে কোর্টে লইয়া কেহ আসিলেন । তাঁহার উপর ওয়ালার নিকট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন । ইতঃপূর্ব্বেই নায়েব মহাশয় সমস্ত সাক্ষী সহ কোর্টদারগার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মোকদ্দমা পরিচালনার উপদেশ দিতেছিলেন । অন্য এক পুলিশ কর্ম্মচারী সে সময়ে মোকদ্দমার কাগজ পত্রাদি মিছিল করিয়া বিচারকের নিকট রামদাসের নথি পাঠাইতে ব্যস্ত ছিলেন, মধ্যে মধ্যে কোর্টদারগা তাঁহাকে তাড়া দিতেছিলেন । রামদাসের কাগজপত্র বিচারকের নিকট পেশ হইল, বিচারার্থ রামদাসও বিচারকের সম্মুখে হাজির হইল । কেবল সেই জনসংঘের মধ্যে একজন লোকের কানে কানে কে যেন বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছিল "বাবুদের লেখাপড়ার হিসাবে চুরির উপরি পাওনা—আর আমরা গরীব, ছোটলোক বাজার খরচের

পয়সা চুরি করিয়াছি আমরা চোর "।

রামদাসের বিচার আরম্ভ হইবা মাত্র—অর্থাৎ নায়েব মহাশয় সাক্ষীর কাটগাড়া হইতে সাক্ষী দিয়া নামিবার পূর্ব্বেই একজন নবীন উকিল কোথা হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—এ মোকদ্দমা ফৌজদারীতে চলিতে পারে না ইহা ফৌজদারীর বিচার্য্য নহে সচকিতে হতভাগ্য রামদাস দেখিল তাহার সেই পুলিশ কর্ম্মচারী স্নেহব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন আমাদের পরিচিত পুলিশ কর্ম্মচারী রামদাসকে কোর্টে রাখিয়া বাহিরে চলিয়া যাইয়া তাঁহার সহপাঠী একজন উকিলের নিকট রামদাসের মোকদ্দমার সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বন্ধুর কথা অবহেলা না করিয়া উকিল বাবু যে কোর্টে বিচার হইতেছিল তথায় ছুটিয়া গিয়া বিচারকের নিকট বিচার সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত করিলেন। বিচারক তাঁহার ওকালতনামা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় উকিলবাবু অপ্রতিভ হইলেন। এমন সময় কে যেন একখানা ওকালতনামা লেখাইয়া রামদাসের দস্তখত লইয়া উকিল বাবুর হাতে দিল। উকিলবাবু সেই কাগজখানা বিচারক সমীপে দাখিল করিয়া আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পুলিশ চালানী মোকদ্দমা এক কথায় উড়িয়া যাইবার নয়। বিচারক বলিলেন এই মোকদ্দমার সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী শুনিয়া তিনি চার্য্য করিবেন কিনা বিবেচনা করিবেন। বিচার চলিতে লাগিল। কোটদারগা তাঁহার সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী করাইলেন। নায়েব মহাশয় তাঁহার জমা খরচের খাতা, মুদি মহাশয় তাঁহার দৈনিক খরিদ বিক্রয়ের খাতা প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করিয়াছিলেন। দারগাবাবু রামদাসের

লিখিত দৈনিক খরচের খাতাখানাও প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছিলেন। লোকের কথায় ও হিসাব পত্রের খাতায় রামদাসের অপরাধের বেশ প্রমাণ হইল। বিচারক উকিল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেন চার্য্য হইবে না। উকিল বাবুর মুখে সেই এক কথা এ মোকদ্দমার বিচার এখানে হইবে না দেওয়ানী আদালতে ইহার বিচার হইবে এ আদালতের বিচার্য্য বিষয় ইহা নয়। বিচারক উকিল বাবুর কোন কথা গ্রাহ্য না করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া চার্য্য করিলেন। আসামী রামদাসকে বিচারক জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "আমি নির্দ্দোষী"। বিচারক উকিল বাবুকে সাক্ষীর জেরা করিতে বলিলেন। রামদাস দেখিল সংসারে তাহার আত্মীয় বলিতে, বন্ধু বলিতে আর কেহ নাই, কেবল একমাত্র এই নবীন উকিল রাজদ্বারে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া আছেন। শৈশবে সে শুনিয়া ছিল উৎসবে বাসনে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে ও শ্মশানে যে ব্যক্তি সহায় হয় সেই বন্ধু। রামদাস আজ ভক্তিভরে তাহার বন্ধুকে প্রণাম করিয়া ঋষি বাক্যের সার্থকতা বুঝিতে পারিল। যে সমস্ত কাগজ পত্র বিচার আদালতে দাখিল হইয়াছিল উকিল বাবু তাহা তাড়াতাড়িতে যতটুকু দেখিয়া লইতে পারা যায় তাহা দেখিয়া লইলেন। রামদাসের হিসাবের খাতায় খরচ বাদে ৪।৶ আনা জমা ছিল। তাহা ছাড়া মুদি মহাশয়ের খাতায় যে সকল জিনিষ রামদাসের মারফত জমিদারের নামে খরচ লেখা ছিল তাহা রামদাসের খাতার সহিত মিল ছিল না। নায়েব মহাশয় জমিদারের আগমনের তারিখে মুদি মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার তহবিলে টাকা না থাকায় খরচের জন্য ৫০৲টাকা

হাওলাত দেখাইয়া তাঁহার জমা খরচে জমা করিয়াছেন সেই টাকা হইতে রামদাসকে প্রতি রোজ পাঁচ টাকা করিয়া জমিদারের খরচের জন্য দিয়াছেন তাহাও দেখিলেন। রামদাসের হিসাবের খাতায় যে চারি টাকা সাত আনা উদ্বৃত্ত ছিল তাহা কি হইল বিচারে সে সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ পাইল না। বাদীপক্ষের কেহ সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিল না।

উকিল বাবু দারগা বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্বীকার করিলেন আসামী এই হিসাবের খাতা সহ তাঁহার নিকট ৩।৶ আনা দাখিল করিয়াছিল। নায়েব মহাশয় সে টাকা পয়সা লইয়াছেন। নায়েব মহাশয়কে জিজ্ঞাসায় বলিলেন ৪।৶ আনা দারগা বাবুর নিকট হইতে খরচের উদ্বৃত্ত তহবিল বলিয়া রামদাসের দাখিলী সূত্রে তিনি পাইয়াছেন। জমিদার একুশদিন তাঁহার কাছারীতে আছেন। দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইল রামদাসের এই চুরি ধরা পড়িয়াছে। তিনি আরও বলিলেন তাঁহার তহবিলে টাকা ছিল না মুদি মহাশয়ের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া জমিদারের খরচ চালাইয়াছেন। মুদি মহাশয়কে সে টাকা তিনি তহবিলে টাকা হইলে শোধ দিয়াছেন। উকিলের প্রশ্ন হইল মুদি মহাশয়কে কত টাকা পরিশোধ করিয়াছেন? উত্তর হইল পঞ্চাশ টাকা। নায়েব মহাশয় উত্তরে আরও বলিলেন মুদি মহাশয়ের নিকট যে টাকা হাওলাত লইয়াছেন তাহা দিনে দিনে রামদাসকে খরচের জন্য দিয়াছিলেন। উকিল বাবু আবার প্রশ্ন করিলেন হিসাব দেখিয়া বল জমিদারের বাবদ কত টাকা তুমি খরচ করিয়াছ"। নায়েব মহাশয় বলিলেন বাজার খরচ দশদিনের পঞ্চাশ টাকা ও মুদি মহাশয়ের হাওলাত দেনা শোধ পঞ্চাশ

টাকা। উকিল বাবু প্রশ্ন করিলেন এই দুই বাবদের খরচই তোমার হিসাবে লেখা পড়িয়াছে বা আছে। নায়েব উত্তর করিলেন হাঁ আছে। উকিল বাবু নায়েব বাবুকে দিয়া এই দুই খরচ দেখাইয়া লইয়া হাকিমকে দেখাইলেন—তসদিগ করাইলেন। উকিল বাবু নায়েবের দ্বারায় স্বীকার করাইলেন একই খরচ দুই রকমে জমা খরচে লেখা পড়ায় পঞ্চাশ টাকা তিনি "উপরি পাওনা" করিয়াছেন বা চুরি করিয়াছেন।

তারপর নায়েব বন্ধু মুদি মহাশয়ের পালা পড়িল। তিনি তাঁহার খাতা পত্রের পাতা ওলটপালট করিয়া দেখাইতে পারিলেন না যে নায়েবকে তিনি ৫০৲ টাকা জমিদারের আগমনে নায়েব মহাশয়কে কর্জ্জ দিয়াছেন। বা নায়েব মহাশয় তাঁহাকে কোন দিন পঞ্চাশ টাকা দিয়াছেন।

রামদাসের জিনিস পত্রের ফর্দ্দের সহিত মুদি মহাশয়ের হিসাবের অনৈক্য হওয়ায় মুদি মহাশয় বলিয়া বসিলেন তাঁহার গোমস্তারা খরিদ বিক্রয় করিয়া থাকে তাহারাই হিসাব পত্র লিখে, তাঁহার রামদাসের বাকী লইবার বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই, তবে রামদাসকে দোকান হইতে জিনিস পত্র লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন। এই প্রকারে মুদি মহাশয়ের মুদিত্বের প্রতিভার বিকাশ পাইল। তবুও বিচারক আসামী যে নির্দ্দোষ তাহার প্রমাণ চাহিলেন। উকিল বাবু বলিলেন জমিদার বাবু যখন তাঁহার টাকার বিনিময়ে দৈনিক ব্যবহারের জিনিস পত্র পাইয়াছেন তখন আর আসামী পয়সা চুরি করিয়াছে বলিয়া তিনি বলিতে পারেন না। মুদি মহাশয়কে প্রতারণা করিয়া রামদাস জিনিস পত্র লইয়াছে তাহার প্রমাণ নাই। তাহার কথায় তাহার দোকানের হিসাব জাল বলিয়া

প্রমাণ হইতেছে। নায়েব তো নিজের লেখা হিসাবে চোর ধরা পড়িয়াছে।

এই সমস্ত তর্ক বিতর্ক হওয়া কালে একজন নিরক্ষর বৃদ্ধ কৃষক আদালতের নিস্তব্ধ ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল ব্যাপার আমি সব জানি আমি কি বলিব। রামদাস দেখিল কাছারীর একজন প্রজা। তাহার মুখে নায়েবের কীর্ত্তি কাহিনী সে সব শুনিয়াছিল। বিচার দেখিতে সে আসিয়াছিল।

উকিল বাবু তাহাকে সাক্ষীর কাটগড়ায় দাঁড় করাইয়া, রামদাসের পক্ষে আদালতে সকল কথা প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ এক বোঝা দাখিলা আদালতে দাখিল করিয়া বলিল নায়েব মহাশয় তাঁহার নিকট সমস্ত খাজনা আদায় করিয়াছে আবার তাহাদের নামে খাজনা বাকী দেখাইয়াছে। তাহা রামদাসের সাহায্যে জমিদারের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিবে স্থির করিয়াছিল। আর নায়েব মহাশয় সেই বিষয় জানিতে পারিয়া রামদাসকে এই বিপদে ফেলিয়াছে। বৃদ্ধের কথা বিশ্বাস করিয়া বিচারক রামদাসকে নির্দ্দোষ সাব্যস্তে খালাস দিয়া মোকদ্দমা মিথ্যা লিখিলেন। রামদাস অব্যাহতি পাইয়া কোথায় গেল কেহ জানিল না। দুই দিন পরে জানা গেল কোন জঙ্গলের এক গাছের সহিত উদ্বন্ধনে রামদাস তাহার জীবন নাট্যের শেষ যবনিকার পাত করিয়াছে। ভদ্র নামধারী নরভুকের রসনার তাড়নায় উপরি পাওনার লোভে কত রামদাস ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইতেছে কেহ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না! এই উপরি পাওনার দেশে রামদাসের কথা কে শুনে।

স্থানীয় সংবাদ।

যাত্রাভিনয়— বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাভিনেতা শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল দাস গত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় দেড়মাস কাল দিনাজপুর সহর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে তাঁহার যাত্রাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতি অভিনয়ে অসংখ্য দর্শক ও শ্রোতার সমাবেশ হইত। মুকুন্দ বাবু স্থানীয় কোন কোন সমিতির সাহায্যদান করিয়াছেন। মহর্ষি ভুবন মোহন দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থে ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর ২৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত অবস্থা ভেদে সাধ্যানুসারে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বদেশসেবা ও মহানুভবতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভগবান ইঁহার মঙ্গল করুন ইহাই প্রার্থনা।

বদলী— শ্রীযুক্ত বনমালী বাগচী এখানে সদর সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি হুগলি আরামবাগে বদলী হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত রাধিকা লাল দে সদর সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। স্থানীয় মহাজন সভা ৬ই তারিখে ধর্ম্মশালা প্রাঙ্গনে বনমালী বাবুর বিদায় উপলক্ষে একটী সান্ধ্যসমিতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বনমালী বাবু এখানে লোকপ্রিয় ছিলেন। সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ষ্টেশনে তাঁহার বিদায় কালীন উপস্থিত ছিলেন।

মহর্ষি ভুবন মোহন— মহর্ষি ভুবন মোহন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছেন। সত্বরেই তিনি দিনাজপুরে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার সেবাব্রত গ্রহন করিবেন। এখানকার ভূতপূর্ব্ব সবজজ (পরে পাবনার ডিষ্ট্রীক্টজজ) শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন রায় বাহাদুরের ভবানীপুরের বাটীতে তিনি আছেন। রায়বাহাদুর আগ্রহ করিয়া নিজবাটীতে তাঁহাকে রাখিয়াছেন। কলিকাতার সমস্ত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধান চন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্রের যত্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকম্প—১২ই শ্রাবণ সকাল বেলা অনুমান ৮টার সময় সামান্য ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। কম্পন এক সেকেণ্ডের কম স্থায়ী ছিল।

কৃষি সমিতি—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রায় নিখিল নাথ রায় বাহাদুর অল্প দিন হইল এখানে আসিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই জেলার হিতকর অনুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। স্থানীয় অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সেনের প্রস্তাবে এখানে একটী কৃষি সমিতি ও মফস্বলে তাহার শাখা সমিতি স্থাপন করা স্থির হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ উৎযোগী হইয়াছেন। আমাদের আশা আছে তিনি এ জেলার স্থায়ী হইয়া জেলার অশেষ কল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবেন।

রেলওয়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা—অত্রত্য উকিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহ হিলি ষ্টেশনের নিকটে দার্জিলিং মেল গাড়ীর নীচে পড়িয়াছিলেন, তাহা পাঠকবর্গ জানেন। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের পার্বতীপুর হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছিল। আশুবাবু ঈশ্বর কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বগুড়ার সবজজ আদালতে ৩০০০৲ টাকা দাবিতে তিনি খেসারতের মোকদ্দমা করিয়াছিলেন। রেলকর্ত্তৃপক্ষ ৩০০০৲ টাকায় ঐ মোকদ্দমা মিটাইয়াছেন।

দেওয়ানী আদালতের আমলা শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার নিয়োগী দিনাজপুর ষ্টেশন ঘরের উত্তর রেলওয়ের যে পাকা ড্রেণ হইয়াছে, ঐ ড্রেণ খনন করার সময়ে অন্ধকার রাত্রিতে ষ্টেশনে টিকিট দিয়া বাহির হইবার কালে পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছিলেন। তৎকালে ঐ ড্রেণের নিকটে আলো ছিল না বা ড্রেণের দক্ষিণে কোন বাঁশের বেড়া দেওয়া ছিলনা। তিনি ৬০০৲ দাবিতে রেলওয়ের নামে মোকদ্দমা করেন। ৩০০৲ টাকা ও হারাহারি খরচায় ডিক্রী হইয়াছে।

ক্ষমা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার প্রতিনিধিকে আদেশ দিয়াছেন এবং যে [illegible] সম্রাট অনুপ্রাণিত হইয়া এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা ভাষা ও [illegible] সমুজ্জ্বল মণিখণ্ডের ন্যায় দীপ্তিময়। তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি "এই সন্ধিক্ষণে আমার বড় সাধ যে যতদূর [illegible] আমার প্রজা ও শাসক সম্প্রদায় মধ্যে যে কটু বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়াছিল তাহা [illegible] অন্তর্হিত হয়। যাঁহারা রাজনৈতিক উন্নতি সাধনের আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হইয়া আইনের শৃঙ্খল লঙ্ঘন করিয়া অত্যাচার উপদ্রব করিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। আর আমার কর্মচারী যাঁহারা ভারত-বর্ষের শান্তি ও আইনের বিধি রক্ষা করিবার ভার লইয়া [illegible] প্রজাপুঞ্জের উৎপাত ও উপদ্রব কঠোর হস্তে দমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহারাও যেন স্মৃতিপট হইতে অতীতের প্রকার আতঙ্ক মুছিয়া [illegible] একটা নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে; এই সময়ে আমার প্রজা ও রাজকর্মচারী গণের মধ্যে সদ্ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—যেন শাসক ও শাসিত উভয়েই [illegible] সংকল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া এক যোগে কার্য্য করিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা [illegible] হইবে। সেই জন্য আমি আমার রাজপ্রতিনিধিকে আদেশ করিতেছি [illegible] আমার পক্ষ হইতে ও আমার প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে শান্তি ও [illegible] বিবেচনা করিয়া তিনি দয়া ও ক্ষমা প্রকাশ করুন অর্থাৎ যে সকল রাজনৈতিক অপরাধী দণ্ডিত হইয়াছেন, দেশের শান্তি রক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা [illegible] তাহাদিগকে মুক্ত দেওয়া হউক। যাহারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইন [illegible] অপরাধে অপরাধী হইয়া কোনও বিশেষ আইনের ধারা অনুসারে অথবা কোনও বিধির বিধান অনুসারে কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত বা অন্য কোন [illegible] অনুসারে স্বাধীনতা উপভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাদিগকে [illegible] রূপে অব্যাহতি দিতে হইবে।"

আমাদের সম্রাটের এই আদেশের ফলে বহু রাজনীতিক অপরাধী মুক্তিলাভ [illegible]

করি না। আইনে যে সমুদয় অধিকার একণে আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনও পরিবর্ত্তন কিংবা পরিবর্দ্ধন আশু সম্ভব নহে। আমাদের প্রদত্ত অধিকারের যথোপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া এবং আইন পূর্ণভাবে ও সফলতার সহিত পরিচালনা না করিয়া যদি আমরা কলহ ও বিবাদে আত্ম শক্তির অপচয় ও ক্ষয় করি তবে সত্য বলিতে হইবে ভগবান এদেশের উপর নিতান্তই বিরূপ। যখন সমস্ত শক্তি একান্ত প্রয়োজন, যখন এই প্রণালীতে দুর্দ্দমনীয় প্রবাহে আমাদের কার্য্যকরী শক্তির পরিচালনার উপর আমাদের জীবন মৃত্যু নির্ভর করিতেছে সেই সময়ে এই আত্ম কলহ প্রত্যেক স্বদেশ সেবকের প্রাণে যে ক্ষোভ ও কষ্টের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য। ভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিতেছি যে নূতন আইনের কার্য্যকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই যেন এই হতভাগ্য দেশের মাথার উপর হইতে এই আত্ম কলহ প্রস্থান করে এবং সমস্ত ভারতবাসী যেন একমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতের ভবিষ্যতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা গৌরব মণ্ডিত করিবার জন্য জাগ্রত হইয়া উঠেন।

বন্ধুগণ,

এই আইনের বিধান অনুযায়ী ভারতবাসী যে সমুদয় ক্ষমতা লাভ করিয়াছে তাহার যথাযোগ্য প্রয়োগ যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। এই আইনের নিয়ম বলে কতকগুলি বিষয়ের ব্যবস্থার ভার ভারতবাসীর উপরেই ন্যস্ত হইয়াছে। প্রাদেশিক ও ভারত শাসন যে প্রণালীতে স্থাপিত ছিল তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি সংক্ষেপে এই পরিবর্ত্তনের কথঞ্চিৎ আভাষ যাঁহারা এই আইন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই তাঁহাদের অবগতির জন্য দিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রথমতঃ ভারতীয় সর্ব্বোচ্চ কার্য্য নির্ব্বাহক মন্ত্রী সভায়

ভারতবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে গভর্ণর জেনেরালের যে ব্যবস্থাপক সভা আছে তৎস্থলে দুইটী সভা স্থাপিত হইবে—একটীর নাম কাউন্সিল অফ্ ষ্টেট এবং অপরটী ব্যবস্থাপক সমিতি।

কাউন্সিল অফ্ ষ্টেটে ৫০ জন মেম্বর থাকিবেন, ২১ জন নির্ব্বাচিত সভ্য থাকিবেন। ২৯ জন গভর্ণর জেনেরাল কর্তৃক মনোনীত হইবেন, এই মনোনীত সভ্য মধ্যে অন্ততঃ ৪ জন বেসরকারী সভ্য থাকিবেন এবং বাকী সভ্য রাজ কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবে।

ব্যবস্থাপক সভায় ১০০ জন সভ্য থাকিবে, তন্মধ্যে ⅘ সংখ্যক নির্ব্বাচিত সভ্য ও ⅕ মনোনীত সভ্য থাকিবে। যাবৎ আইন কানুন ব্যবস্থাপক সভায় প্রথমতঃ পাশ হইয়া কাউন্সিল অফ্ ষ্টেটে পাশ হওয়া আবশ্যক। উভয় সভা মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গভর্ণর জেনেরেলের ও সম্রাটের সকল বিধি ব্যবস্থায় সম্মতি দিবার ও পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের অধিকার থাকিবে।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট—

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিজ বিধিব্যবস্থা ও রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং এই প্রাদেশিক শাসন কার্য্য সম্বন্ধেই দায়িত্বমূলক শাসনাধিকার ভারতবাসীগণকে দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের যে সমুদয় বিষয়ে অধিকার আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের পরিচালনার ভার ভারতবাসীগণের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, এবং তাহা Transferred Subjects অর্থাৎ অর্পিত বিষয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এবং যে সমুদয় বিষয় একণে সম্পূর্ণরূপে গভর্ণমেণ্টের হস্তে রহিল তাহা Reserved Subjects অথবা রক্ষিত বিষয় নামে অভিহিত হইয়াছে।
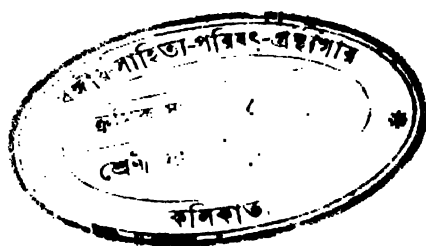
দিনাজপুর পত্রিকা।

মাসিক

সপ্তবিংশতি ভাগ } ভাদ্র, ১৩২১। } ১০ম সংখ্যা

প্রণয়।

প্রণয়ের তরে প্রণয় বিনাতে
জীবনের মাঝে কিছুই নাই।
সকলি আমার তটিনীর মত
চলিয়া গিয়াছি তাহার ঠাঁই।

তাহারি তরেতে কতই বেদনা
তাহার স্মৃতিতে আমার সুখ।
তাহারই তরে কাঁদিয়া কাটিয়া
সারাটী জীবনে পেয়েছি দুঃখ।

১।

তাহারই তরে সকলি আমার
স্বপনের মত ভাসিয়া গেছে।
সারাটি জীবন নিরাশ আঁধারে
ঘুরিনু কেবলি আলেয়া পিছে॥

আঘাতের মাঝে আঘাত লাগিয়া
ভাঙ্গা বীণা মোর বাজেনা সই।
তাহারই পায় প্রণয় বিলায়ে
ফিরে শুধু আর চাহিল কই॥

তারি কাছে আর প্রতিদান কভু
এতটুকু মোর ছিলনা আর।
গভীর হুতাশ বুকেতে বহিয়া
জীবন হয়েছে বড়ই ভার॥

আজি তোমা ডাকি হে আমার প্রভু
এতটুকু আজ আমারে দিও।
এ অভাগা শুধু কাঁদিয়া গিয়াছে
মরণের দিনে ডাকিয়া নিও॥

ভ্রাতৃ।

হরিনারায়ণ হঠাৎ কলেরা রোগে মারা যায়। তাঁহার স্ত্রী অন্ধ ছিল, তাহার উপর তিনটী কন্যা সন্তান লইয়া বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের উপায় কি হইবে ইহা গ্রাম্য সমাজে প্রথমতঃ কয়েক দিন আলোচনা চলিতে থাকিল, কিন্তু ইত্যবসরে হরিনারায়ণের সংসারের যা কিছু সামান্য তৈজস পত্র ছিল তাহা তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মালতী দ্বারা হরিনারায়ণের স্ত্রী দিনের পর দিন বিক্রয় করিয়া শিশু সন্তান দিগের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে থাকিল। হরিনারায়ণ নিঃস্ব ছিল। সে সামান্য একটি চাকুরী করিত এবং তাহার মৃত্যুর সঙ্গেই আয়ের পথও বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন গতি কি হইবে। ক্রমে হরিনারায়ণের ভদ্রাসন খানি বিক্রয় হইয়া গেল। গ্রামবাসী সমালোচনা ও সহানুভূতি যথেষ্ট প্রকাশ করিল বটে, তবে অনাথা অন্ধ বিধবাকে কেহ সাহায্য করিল না বা করিতে পারিল না।

এদিকে হরিনারায়ণের জ্যেষ্ঠা কন্যা মালতী চতুর্দশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল। জননী অন্ধ থাকা গতিকে কন্যা যে বড় হইয়াছে তাহা দেখিতে পাইলনা বটে তবে বুঝিতে পারিল। মালতীই এখন বলিতে গেলে সংসারের অভিভাবক। যেদিন ঘরে চাল না থাকে মালতী বন হইতে শাক সংগ্রহ করিয়া আনে এবং নিজেই তাহা রন্ধন

করে এবং জননী ও কনিষ্ঠা ভগ্নী দুটীকে তাহা খাওয়াইয়া প্রতিপালন করে। হরিনারায়ণের ভদ্রাসন খানি যিনি খরিদ করিয়াছিলেন তিনি প্রথম প্রথম কয়েক দিন এই অনাথ পরিবারের জন্য বেশ মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার আশা ছিল যে শীঘ্রই এই অনাথ পরিবার ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেক। ফলে, যখন তিনি দেখিলেন যে ইহাদের সংসারে আর দাঁড়াইবার জায়গা নাই, সুতরাং ভদ্রাসন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগের সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি মনে মনে বিরক্ত হইলেন। এবং সেই বিরক্তি ব্যঞ্জক ভাব প্রকাশের পথ প্রথমতঃ তিনি কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, তারপর যখন তিনি দেখিলেন মালতী বড় হইয়াছে অথচ একাকিনী সকাল সন্ধ্যায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় তখন তিনি সুযোগ পাইলেন এবং গ্রাম্য সমাজে সে কথা তিনি এই ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার খরিদা সম্পত্তিতে ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের বাসস্থান দিতে তিনি মোটেই রাজী নহেন। গ্রামবাসীগণ প্রথমতঃ একথা শুনিয়া অনেকেই মালতীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল, কিন্তু পরিণামে আর কেহই মালতীর মুখের প্রতি তাকাইল না: জন্ম দুঃখিনী মালতী গ্রাম্য সমাজে ভ্রষ্টা বলিয়া পরিগণিতা হইল।

ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে কেইবা স্থান দিবে? মালতী তাহার অন্ধ মাতা ও অপোগণ্ড শিশু ভগ্নী দুটীকে লইয়া পথের ভিখারিণী হইল বটে, তবে গ্রামবাসী কেহ তাহাদিগকে ভিক্ষা দিতে চাহিলনা। সে যে ভ্রষ্টা তাহাকে ভিক্ষা দিয়া কাহার পূর্ব্বপুরুষ নরকগামী হইবে? মালতী তাহার অন্ধ মাতা ও শিশু ভগ্নী দুটীকে লইয়া গ্রাম প্রান্তে

যে বারোয়ারী কালী পূজার জন্ত একখানি ঘর তৈয়ারী হইয়াছিল উক্ত ঘরের বারান্দায় আশ্রয় লইল। ঘরের মধ্যে জগন্মাতা কালীর মূর্ত্তি তখনও বিরাজিত ছিল। যদিও পূজা বহুদিন পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল কিন্তু ঘরখানি এখনও বাতাসের অনুকম্পায় পড়িয়া যায় নাই। মালতী আজ তিন দিন পর্য্যন্ত তাহার অন্ধ মাতা শিশু ভগ্নী দুটীকে একমুঠা অন্ন সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে নাই। শুধু বনের শাক খাওয়াইয়া আর কদিন রাখা চলে, কিন্তু উপায় কি, তাহাকে যে সকলে ভ্রষ্টা বলে, তাহার যে কি অর্থ তাহা মালতী আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই। সে মনে করিত ভ্রষ্টা অর্থ কুলক্ষণে স্ত্রীলোক। প্রকৃত প্রস্তাবে মালতীর সংসার জ্ঞান তখনও হয় নাই। এই অবস্থায় মালতী একদিন তাহার শিশু ভগ্নী দুটীর জন্ত কিছু আহার্য্য সংগ্রহের নিমিত্ত রামনিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে সতী ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন এবং যদিও সে দিন তাঁহার বাটীতে কোন পর্ব্ব উপলক্ষে গ্রামবাসী সকলের নিমন্ত্রণ ছিল তথাপি ভ্রষ্টার কপালে অন্ন জুটিল না।

মালতী সেই সর্ব্বপ্রথম রামনিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে ভ্রষ্টার অর্থ শুনিতে পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ জননীর নিকট ফিরিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে উক্ত নিমন্ত্রণে শশাঙ্ক বাবু বলিয়া একটী যুবক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রমুখাৎ মালতীকে প্রদত্ত তাবৎ উপদেশ শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না, কেবল রুমাল দ্বারা দুই তিন বার চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। পরে নিমন্ত্রন খাওয়া হইয়া গেলে শশাঙ্ক বাবু যখন ফিরিলেন তখন তিনি

রামনিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মালতী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, "আরে রাম বল, সেই ভ্রষ্টা মেয়েটার জন্ম শশাঙ্ক বাবু আপনার মত ব্যক্তির কি আর অনুসন্ধান করা উচিত? আপনি শুনিতেছি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, আপনার এরূপ মতিচ্ছন্ন হইল কেন?" শশাঙ্ক একে যুবক, তাহাতে যুবতী সম্বন্ধে কথা, কাজেই উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে মালতীর একবার অনুসন্ধান করিতে প্রয়াসী হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় হইলেন। উহার কয়েক দিন পরে মালতী, তাহার অন্ধ মাতা ও শিশু ভগ্নী দুটীকে সে গ্রামে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। সকলে কহিল "ভ্রষ্টা বেরিয়ে গিয়েছে বেঁচেছি, গ্রামে কি আর এমন দুষ্টা স্ত্রীলোককে কেহ স্থান দিতে পারে! না দেওয়াই উচিত?"

শশাঙ্ক বাবু জেলায় ওকালতি ব্যবসা করিতেন। যদিও তিনি নূতন উকিল ছিলেন, তথাপি সেই অল্প সময় মধ্যে তিনি বেশ পশার করিতে পারিয়াছিলেন। শশাঙ্ক বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনোদ বাবু উক্ত জেলার বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন এবং উভয় ভ্রাতাই একত্র বসবাস করিতেন। জেলার সদরে শশাঙ্ক বাবু একখানি বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন, উক্ত বাটীখানি খরিদের পর হইতে তাহারা থাকিত, কেননা শশাঙ্ক বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনোদ বাবু বলিতেন "শশাঙ্ককে ফেলিয়া ভাত খাইব কি করিয়া, দুই ভাই পৃথক হইলে আমার অন্ন জল বন্ধ হইবে"। শশাঙ্ক বাবু তাই দাদার মনস্তুষ্টির জন্ম এবং ভ্রাতৃবধূর উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া একত্রই বাস করিতেন। শশাঙ্কের স্ত্রী চপলাও, তাহার দিদি

বিন্দুবাসিনী অর্থাৎ বিনোদ বাবুর স্ত্রীকে ফেলিয়া একা বাস করিতে ইচ্ছুক ছিল না। এক কথায় বলিতে এ সংসারে ভ্রাতৃ সৌহার্দ্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা বিনোদ বাবুর সংসারেই ছিল। শশাঙ্ক, রামনিধি ভট্টাচার্য্যের বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলে একদিন তাহার ভ্রাতৃবধূ তাহাকে কহিল " ঠাকুরপো, কাল তোমার ভাড়াটিয়া উঠিয়া গিয়াছে. তোমার দাদা অন্যত্র বাড়ী ভাড়া লাগাইবার চেষ্টায় আছেন. তুমিও একটু চেষ্টা কর " শশাঙ্ক কহিলেন " বৌদি ভালই হইয়াছে, দুচার দিনের মধ্যেই ভাড়াটিয়া পাওয়া যাইবে, তার জন্য কোনই চিন্তা করিতে হইবে না। ইহার পর শশাঙ্কের ভ্রাতৃবধূ বিনোদ বাবুকে সেইরূপ জনাইলে, বিনোদ বাবু আর বাড়ী ভাড়া লাগাইবার কোনই চেষ্টা করিলেন না। অল্প দিনের মধ্যেই মালতী ও তাহার অন্ধ মাতা ও শিশু ভগ্নী দুটী সেই বাড়ীর ভাড়াটিয়া হইয়া রহিল।

সময় সুযোগ মত শশাঙ্ক একদিন বিনোদ বাবুর নিকট সেই অনাথ পরিবারের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিতে গিয়া যখন দাদার নিকট হইতে কোন উৎসাহ পাইলেন না, তখন তিনি বিনোদ বাবুকে আর নূতন ভাড়াটিয়াদিগের কোন পরিচয় দিলেন না, এবং মাস মাস ভাড়ার টাকা তাঁহার ভ্রাতৃবধূর নিকট জমা দিতে লাগিলেন। বিনোদ বাবু বাড়ী ভাড়ার টাকা পাইয়া আর কোন তথ্যানুসন্ধান অনাবশ্যক মনে করিলেন। এ রূপে এক বৎসর কাল মালতী ও তাহার মাতা শশাঙ্কের বাটীতে নিরাপদে বাস করিলে একদিন মালতীর মাতা শশাঙ্ককে কহিলেন " বাবা, তোমার দয়ার শরীর, আমি নিজে অন্ধ কি বলিব এখন মালতীর

একটা উপায় তুমি না করিয়া দিলে আর কতকাল তুমি আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে ?" শশাঙ্ক পূর্ব্ব হইতেই সে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু এমন কোন সহৃদয় পাত্রকে খুঁজিয়া পাইলেন না যে সে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ মালতীকে বিবাহ করিয়া মালতী ও তাহাদের পরিবার সকলের প্রতিপালনের ভার লয়। ফলে, শশাঙ্ক বহুচেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না, অধিকন্তু এইরূপ বিবাহের চেষ্টার ফলে দাঁড়াইল এই যে লোকের নিকট শশাঙ্ক বাবু হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িলেন, কেননা যাহারা ক'নে দেখিতে আইসে, তাহারা ক'নের পিতৃকুলের পরিচয় লইবার জন্য যখনই হরিনারায়ণের ভদ্রাসন যে গ্রামে ছিল সেখানে যায়, গ্রামবাসী সকলেই মালতীকে প্রকাশ্যে ভ্রষ্টা বলিয়া পরিচয় দেয়। তারপর শশাঙ্ক বাবুর বাটীতে তাহারা বাস করে, এবং শশাঙ্ক বাবু নিজে রূপবান যুবক। এইরূপ নানাপ্রকারে কাজে কিছুই হয় না। অথচ শশাঙ্ক বাবুর দুর্নাম হয়। ক্রমে শশাঙ্ক হতাশ হইয়া পড়িলেন।

মালতীর অন্ধ মাতাকে শশাঙ্ক মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং তিনি ও শশাঙ্ককে নিজ পুত্রের মত আদর করিতেন। বহু চেষ্টাসত্ত্বেও যখন মালতীর বর মিলিল না, তখন একদিন মালতীর মাতা শশাঙ্ককে কহিলেন " বাবা এখন কি উপায় হইবে ?" ইহা বলিতে অন্ধ জননী কাঁদিয়া ফেলিলেন। শশাঙ্ক সেই অনাথা বিধবার ক্রন্দনে এবং নিজ অকৃত কার্য্যতায় বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন বটে, তবে রামনিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত কোন উপদেশ কাহাকেও দিলেন না। কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শশাঙ্ক কহিলেন " মা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আজ হ'তে

এক সপ্তাহের মধ্যে ইহার একটা প্রতিবিধান করিব।” ইহা বলিয়া শশাঙ্ক বিধবার হস্তে তাহাদের পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহের খরচ বাবদ কিছু টাকা দিয়া বিদায় হইলেন, মালতীর মাতা মালতীকে ডাকিলেন। মালতী এখন বড় হইয়াছে, সে শশাঙ্কের সাক্ষাতে বাহির হয় না। তার পর শশাঙ্ক তাহাদের একটী ঝি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং মালতীকে এখন আর বাড়ীর বাহিরে যাইবার দরকার হয় না। মালতী তাহার মাতার সাক্ষাতে আসিলে মাতা কহিলেন “ মালতী, আমি অন্ধ, ধর্ম্ম সাক্ষী, যদি তুই কোন পাপ না করিয়া থাকিস্, তবে ভগবানের ইচ্ছায় এবার শশাঙ্কবাবুর চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না ” মালতী অধোমুখী হইয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার মতন দুরদৃষ্ট জগতে কাহার হয়, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। অন্ধ জননী আবার কহিলেন মালতী, আমি ত অন্ধ, আচ্ছা শশাঙ্ক বাবু দেখিতে কেমন? মালতী কোন উত্তর দিল না, কিন্তু মালতীর ছোট ভগ্নীটী কহিল “ বেশ সুন্দর ”। মালতীর মাতা আর কোন কথা কহিলেন না।

শশাঙ্ক বাবু যে পথ দিয়া প্রতিদিন কাছারী যাইতেন সেই পথের পার্শ্বেই মালতীদের বাসস্থান ছিল, সুতরাং শশাঙ্ক বাবু কাছারী হইতে প্রত্যাগমন সময় প্রায় দিনই মালতী ও তাহাদের পরিবারবর্গের খবরা খবর লইতেন। শশাঙ্ক বাবু যে দিন মালতীর মাতার নিকট সপ্তাহের মধ্যে মালতীর বিবাহের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইয়া বাসায় ফিরিয়াছিলেন, সে দিন তাঁহাদের বাসায় শশাঙ্ক বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনোদ বাবু, শশাঙ্কের ছেলেটীর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বিস্তর লোক জন

খাওয়াইয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অনেক ভদ্র পরিবারের মহিলাগণ সমবেত হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক বাবু অন্য অন্য দিন অপেক্ষা সকালেই কাছারী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। বাসায় পৌঁছাইয়া শশাঙ্ক বাবু দেখিলেন তাঁহার পত্নী চপলা খোকাকে কোলে লইয়া নির্জ্জনে একাকী বসিয়া আছে। চপলা শশাঙ্ক বাবুকে কাছারী হইতে প্রত্যাগত দেখিয়া খোকাকে কোলে লইয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিল " আজ খোকার অন্নপ্রাসন তা তুমি কাছারী গেলে কেন, আমার ভারী রাগ হয় যে তুমি এমন কর? " শশাঙ্ক তাহার প্রত্যুত্তরে খোকার হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিলেন। খোকা নোটখানি লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলে, চপলা তাহার হাত হইতে নোটখানি লইয়া নিজের কাপড়ের অঞ্চলে বাঁধিল, শশাঙ্ক ততক্ষণ নিজ পোষাক পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন এবং পোষাক ছাড়িয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া কহিলেন " এখনত বুঝিলে কি জন্য কাছারী গিয়াছিলাম "। চপলা কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিল " সেই নচ্ছার ছুঁড়ীকে দেখিতে গিয়াছিলে কিনা, তাই টাকার ছুতো দিচ্ছ। তা আজ তাদের আনলে না কেন?" শশাঙ্ক বিষণ্ণ বদনে কহিলেন " তাদের ত নিমন্ত্রণ করা হয়নি "। চপলা কহিল " কেন তুমি কি রামনিধি ভট্টাচার্য্য হলে নাকি? " শশাঙ্কের মনে পড়িল যে মালতী রামনিধি ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে কিরূপ অপদস্থ হইয়াছিল। তাই চপলাকে কহিলেন " তুমি ত সব জান, তবে বল, দেখি মালতীদের নিমন্ত্রণ করিলে তাহাদের অপমানিত হইবার ভয় নাই

কি ?" চপলা গম্ভীর ভাবে কিছুকাল চিন্তা করিয়া কহিল "রাত্রে তাহাদের ডাকাইব মনে করিতেছি।" শশাঙ্ক কহিলেন "তোমার যেমন অভিরুচি"। চপলা এতক্ষণ স্বামীর সহিত আলাপ করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে স্বামীর মুখপানে তাকাইতেছিল, লক্ষ্য করিল যে স্বামী অদ্য বড়ই চিন্তিত, হঠাৎ যেন স্বামীর মুখে বিষম চিন্তার দাগ পড়িয়াছে। শশাঙ্ক বাবু এতক্ষণ প্রকৃতপক্ষে মনের ভাব গোপন করিয়াইছিলেন কিন্তু চপলার তীব্র দৃষ্টিতে সে ভাব গোপন রহিল না। কতক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন "চপলা, মালতী সম্বন্ধে তোমাকে দুই একটি কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে, এখন শুনিবে কি ?" চপলা কহিল "তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না আমিই আজ রাত্রে তোমাকে একটি কথা বলিব স্থির করিয়া রাখিয়াছি।" শশাঙ্ক ইহার পর বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন, চপলা ঝিকে ডাকিয়া মালতীদের রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। এমন সময় বিন্দুবাসিনী আসিয়া চপলাকে কহিল "হাঁরে চপলি, আজ কাজ কর্ম্মের দিন তুই ঝিকে কোথায় পাঠালি ?" চপলা কহিল "কেন কোন কাজ পড়েছে নাকি ? তা দিদি, আমি করে দেব এখন।" বিন্দুবাসিনী কহিল "সে কথা হচ্ছে না, আমি বলি তোতে আর ঠাকুরপোতে কি যেন একটা কিছু হয়েছে।" চপলা লোকমুখে তাহার স্বামীর নিন্দা সকলি শুনিয়াছে এবং এরূপ ক্ষেত্রে যে তাঁহার নিন্দা হইবেক তাহাও পূর্ব্ব হইতে জানিত। শশাঙ্ক চপলাকে কোন কথাই গোপন করেন নাই সুতরাং চপলার স্বামীর উপর বিরক্তি ছিল না। মালতীদের বিষয় সকলই চপলার সহিত পরামর্শ করিয়া করা হইয়াছিল।

চপলাই তাঁহার স্বামীকে পরামর্শ দিয়া মালতীকে আনাইয়া তাহাদের নিজ বাড়ীতে স্থান দিয়াছে এবং মাসিক ২০৲ করিয়া টাকার সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে চপলা বিন্দুবাসিনীর কথা শুনিয়া হাসিয়া কহিল " দিদি, তোমার ঠাকুরপো লোক মন্দ নয়, সে দেবতাকে যাহারা মন্দ বলে তাহারা তাহাকে জানে না। " বিন্দুবাসিনী গম্ভীরভাবে কহিল " তুই দেখ্‌ছি ক্ষেপেছিস্‌ চপলি, লোকে মন্দ বলিলে যদি কিছু না হয় তবে কিসে যে কি হয় আমি তা জানিনে। চপলা কহিল " যাক্‌ আর সে কথায় কাজ নেই, আজ রাত্রেই তোমার সন্দেহ দূর করব, কি বল দিদি ? বিন্দুবাসিনী দুঃখিতভাবে কহিল " আমার সন্দেহ নেই, তুই যখন ঠাকুরপোকে ভাল জানিস্‌ তখন বুঝিতেছি ঠাকুরপো নির্দোষী, যাই হক্‌ সাবধান ভাল বোন্‌ তাই বলি " ইহা কহিয়া বিন্দুবাসিনী চলিয়া গেল। চপলা খোকাকে ঘুম পাড়াইতে শয্যায় শুইয়া গান জুড়িল এবং গান করিতে করিতে খোকা ও তাহার মাতা উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িল।

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

মালতী রামনিধি ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে শশাঙ্ক বাবুকে সর্ব্বপ্রথম দেখিয়াছিল। শশাঙ্ক রূপবান এবং পরে যখন সে তাহার মাতা ও কনিষ্ঠা ভগীদ্বয়কে লইয়া জেলার সহরে আসিল তখন হইতে প্রতিদিন পোষাক পরিয়া শশাঙ্ক বাবুকে তাহাদের বাসার নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া তাহাকে গুণবান বলিয়া বুঝিতে পারিল। বিশেষতঃ তাহাদের প্রতি শশাঙ্ক বাবুর অসীম দয়া সর্ব্বদাই মালতীর হৃদয়কে ব্যতিব্যস্ত করিত। সে নিজে কলঙ্কিনী বলিয়া যে দুর্নাম ভোগ করিত তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করা অবধি মালতী সাবধানে থাকিত এবং শত ইচ্ছা সত্বেও কখন শশাঙ্ক বাবুর সাক্ষাতে বাহির হইত না। তার পর তাহার বিবাহ উপলক্ষ

করিয়া শশাঙ্ক বাবুর চেষ্টার ফলে যখন শশাঙ্ক বাবুর উপরই সে কলঙ্ক ভার অর্পিত হইল, মালতী লজ্জায় মরিতে চাহিল। সে শশাঙ্ক বাবুকে গোপনে দেখাও বন্ধ করিল। এ সব সত্বেও মালতী নিজের মন পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল, সে শশাঙ্ক বাবুকে যে ভাবে দেখে তাহার প্রকৃত দূষনীয় ভাগ এই যে সে শশাঙ্ক বাবুকে মনে মনে ভালবাসে। সে প্রথম ভাবিল আমার মনে শশাঙ্ক বাবুকে ভাল লাগে কেন, সুতরাং আমি পাপিনী, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিয়া বুঝিল শশাঙ্ক বাবুকে ভাল না বাসা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র। মালতী এইরূপ পাপিনী হইতে রাজী, তবু অকৃতজ্ঞতা প্রকাশে রাজী হইল না। যে আমার ভালর জন্ত নিয়ত চেষ্টা করে তাহাকে মন্দ ভাবিতে পারাও যে দায়, তবে যদি মালতী শশাঙ্ক বাবুকে কোন স্বার্থের বশীভূত দেখিতে পাইত তবে তাহার মন্দ ভাবিবার কারণ ছিল, কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ পরোপকার। সুতরাং মালতীর মনে শশাঙ্ক বাবুকে মন্দ ভাবিবার স্থান নাই, লোকে মন্দ বলে, মালতী তাহার কি করিবে, লোকে তাহাকে চিরকালই মন্দ বলিয়া আসিয়াছে। মালতীর চিন্তাস্রোত এইরূপ সমালোচনার ফলে যখন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল তখন সে তাহাদের ক্ষুদ্র পরিবারের গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। মালতীর মাতাও এতক্ষণ শশাঙ্ক বাবুর কথা ভাবিতেছিলেন। শশাঙ্ক বাবু যদিও তাঁহার নিকট কোন কথাই প্রকাশ করেন নাই, তথাপি তিনি এরূপ অবস্থায় শশাঙ্ক বাবুর চেষ্টার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে বড় বেশী আশা করিতে পারিলেন না, কিন্তু অন্ত উপায়ও কিছু নাই তাহা বুঝিতে পারিয়া অন্ধ জননী যুক্তকরে

ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে ভগবান যেন তার মালতীকে সৎপাত্রের সহিত মিলিত করিয়া দেন।

মালতী ও তাহার মাতা যখন এইরূপ চিন্তা করিয়া কাল কাটাইতেছিল, তখন চপলার ঝি তাহাদের অন্দরে প্রবেশ করিয়া কহিল "শশাঙ্ক বাবুর স্ত্রী তাহার ছেলের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন।" মালতীর মাতা তাহা শুনিয়া ঝিকে বসিতে বলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মালতী ও তাহার দুই ভগ্নীকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই পরিচারিকার সঙ্গে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে শশাঙ্ক বাবুর বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলে বিন্দুবাসিনী তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া চপলার শয়ন কক্ষে লইয়া বসিতে দিল। চপলার শয়ন কক্ষের পার্শ্বেই আর একটী ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। সেটী শশাঙ্ক বাবুর পড়িবার ঘর ছিল। সেখানে শশাঙ্ক বাবুর সহিত চপলার তখন কথোপকথন চলিতেছিল, কিন্তু আগন্তুকদের সাড়া পাইয়া চপলা ছুটিয়া আসিয়া প্রথমতঃ মালতীর অন্ধ জননীকে প্রণাম করিল পরে মালতী ও তাহার ভগ্নী দুটীকে আলিঙ্গন করিয়া সকলকে বসিতে অনুরোধ করিল। মালতীর অন্ধ জননী সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। শশাঙ্ক বাবু এই আগন্তুকদের সাড়া পাইয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন, বিন্দুবাসিনী অন্ধ জননীকে লইয়া সেই ক্ষুদ্র পড়িবার ঘরটীতে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করাইয়া কহিল "আমরা আপনাদের স্বশ্রেণীর"। মালতীর অন্ধ জননী কহিলেন "তাহা ত শশাঙ্ক বাবুর সহিত আলাপেই জানিতে পারিয়াছি"।

বিন্দুবাসিনী কহিল " আজ মালতীর বিবাহ দেওয়াইব বলিয়া আপনাদিগকে এখানে আনাইয়াছি, এখন আপনার অনুমতি হইলেই হয় "। অন্ধ জননী ইহা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বিন্দুবাসিনী তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল এবং কহিল " আমার ছোট বোন চপলাকে আপনি জানেন না ওর অসাধ্য কোন কর্ম্ম নেই, ঠাকুরপোর সহিত আজ তার এই বিষয় বোঝা পাড়া হইয়া গিয়াছে। " অন্ধ জননী কহিলেন " বাছা, মালতীকে তোমাদের দিলাম, আমি অন্ধ, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি তোমাদিগকে সুখে রাখুন। " বিন্দুবাসিনী ইতিমধ্যে কিছু খাবার আনিয়া অন্ধ জননীকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল মালতীর কনিষ্ঠা ভগ্নী দুটী তাহাদের মাতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বিন্দুবাসিনী তাহাদিগকেও খাওয়াইতে লাগিল।

চপলা মালতীকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিল " কিরে নচ্ছার ছুঁড়ি, তুই আমার বাবুকে বিবাহ করিতে রাজী কিনা তাই বল দেখিনি? মালতী চপলার পদপ্রান্তে পতিতা হইয়া কহিল " দিদি তোমার দয়া না পাইলে ভ্রষ্টার গতি কি হইত? " চপলা রাগ করিয়া কহিল " এমন সতী লক্ষ্মীকে যাহারা ভ্রষ্টা বলে তাহাদের নরকে গতি হইবে। তুই প্রস্তুত হয়ে নে, আমি স্বামীকে ডাকিতেছি, তোকে বিয়ের আগে খেতে দেব না "। মালতী চপলার পায় পড়িল " দিদি, রাগ কর আমার বিয়েতে কাজ নেই "। চপলা তাহা শুনিল না সে অনতিকাল মধ্যে বিন্দুবাসিনীকে দিয়া শশাঙ্ককে অন্তঃপুর মধ্যে ডাকাইল। অন্ধ জননীকে

দিয়া চপলা কন্যা সম্প্রদান করাইল। মালতীর প্রকৃত বিবাহ হইয়া গেল, তবে সামাজিক নিয়ম রক্ষার জন্য পরদিন শশাঙ্কের সেই ভাড়াটীয়া বাড়ীতে আবার বিবাহের আয়োজন হইল। কিন্তু লোকে মালতীকে চপলাই বলিয়া জানিয়াছে, আমরা তাই তাহার দুইটা নাম দিয়াছি।

(সত্য ঘটনার ছায়াবলম্বনে লিখিত)

স্থানীয় সংবাদ।

হরতাল—খেলাফত প্রসঙ্গে ১৭ই শ্রাবণ (১লা আগষ্ট) রবিবার ভারতব্যাপী হরতালের অনুষ্ঠান মহাত্মা গান্ধি কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল। এখানে যাঁহারা ঐ আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক, তাঁহাদের উদ্যমে সে দিন রেলবাজারের হাট পর্য্যন্ত বসে নাই। বাজারের দোকান পাটও বন্ধ ছিল। বৈকালে জেলখানার সংলগ্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে এক সভা হইয়াছিল।

স্বর্গীয় লোকমান্য তিলক—মহোদয়ের দেহত্যাগের সংবাদে সাধারণের শোক প্রকাশ নিমিত্ত স্থানীয় নাট্যসমিতির গৃহে ১৯শে শ্রাবণ তারিখে এক সভা আহুত হয়। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন সভাপতি ছিলেন। দুঃখের বিষয় সভাক্ষেত্রে আশানুরূপ লোক সমাগম হয় নাই। ৺তিলক মহোদয়ের স্মৃতির সম্মানার্থ দেহত্যাগের দশাহে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় ১২॥ টায় সময় বন্ধ হইয়াছিল।

সহকারিতাবর্জ্জন সভা— নাট্য সমিতির গৃহে ২২শে শ্রাবণ একটী সাধারণ সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র নিয়োগী সভাপতি হইয়াছিলেন। সভার কার্য্য বিলম্বে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যভাগে গৃহ জনপূর্ণ হইয়াছিল। শেষে ভোটের সময় সহকারিতাবর্জ্জনের বিরুদ্ধে মাত্র ৭। ৮ জন হস্তোত্তোলন করিয়াছিলেন। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে সভাতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, পরদিন হইতেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে সহকারিতাবর্জ্জন ব্যবস্থা সভার অনুমোদিত এই পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমান যুবরাজ মহোদয়ের এবৎসরে ভারতবর্ষে শুভাগমন হইতে পারিল না। তিনি আগমন করিলে বর্জ্জননীতি অবলম্বনকারীগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন না। যে নীতির শিক্ষা এইরূপ আমরা তাহার অনুমোদন করিতে পারি না। ভারতবাসী চিরদিন রাজভক্ত। শ্রীশ্রীমান যুবরাজ মহোদয়ের সোৎসাহে ও সানন্দ অভ্যর্থনা যে আগামী বৎসরে নিশ্চয়ই হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্জ্জননীতি দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই, বরং ইহাতে অনিষ্টের কারণ আছে বলিয়া মনে করি।

নূতন সবরেজেষ্টারী আফিস— গঙ্গারামপুর থানার রেজেষ্টারী কার্য্য সদরে হইত। আগষ্ট মাস হইতে গঙ্গারামপুরে একটী সবরেজেষ্টারী আফিস খুলিয়াছে।

বর্ষা— আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস এ অঞ্চলে বৃষ্টির একান্ত অভাব গিয়াছে। শ্রাবণের একেবারে শেষ হইতে বৃষ্টি হইতেছে। আবাদের অবস্থা এক্ষণে কতকটা আশাপ্রদ হইয়াছে।

দায়রার বিচার— পত্নীতলা থানার অন্তর্গত যোগীরভাঙ্গার মোহন্তের অনেক চেলাকে হত্যা করার অপরাধে করিমদ্দিন পণ্ডিত ও

বছির পণ্ডিত দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছিল । গত জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকাতে এ হত্যা সংবাদ আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম । জুরীগণ কারমদ্দিনকে এক বাক্যে নরহত্যার অপরাধী সাব্যস্ত করায় তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে । অপর আসামী খালাস হইয়াছে । দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে আপীল হইবে । জজ আদালতে আসামী পক্ষে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনকে সরকার হইতে উকিল নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।

মিউনিসিপালিটী—মেথরদিগের জমাদার যেরূপ একখানা খাতায় মেথরাণীরা কিরূপ কার্য্য করে তৎসম্বন্ধে করদাতাদের নিকট হইতে লিখাইয়া লইয়া যায়, আমাদিগের বিবেচনায় মিউনিসিপালিটীর বাহিরের কাজের (out door work) প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে যদি সেইরূপ ওয়ার্ড কমিশনার বা ওয়ার্ড কমিটীর মেম্বরের নিকট হইতে তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যের পরিচয় লিখাইয়া লইতে বাধ্য করান হয়, তবে ভাল হয় । ঐ সকল কর্ম্মচারী বড়দরের চাকর, সুতরাং করদাতাদের নিকট হইতে তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্য লিখাইয়া লইতে তাঁহাদের আপত্তি হইতে পারে । কিন্তু এই ব্যবস্থা হইলে উক্ত কর্ম্মচারীগণ নিজ নিজ জিম্মার কোন রাস্তা পরিদর্শনে বাদ দিলেন কিনা (রাস্তা পরিদর্শনের মধ্যে মেরামত, ড্রেণ, আলো, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সবই থাকিবে) এবং কি ভাবে পরিদর্শন কার্য্য সম্পন্ন করিলেন তাহা চেয়ারম্যান ভাইসচেয়ারম্যান মহাশয়েরা ঘরে বসিয়া জানিতে পারিবেন । ইহাতে উক্ত কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞানও উদ্বুদ্ধ হইবে ।

স্বামী শুদ্ধানন্দ—তত্ত্ববিদ্যা সভার পক্ষে স্বামীজী ইতোমধ্যে এখানে আসিয়া বক্তৃতা ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া গিয়াছেন ।

মহর্ষি ভুবনমোহন—মহর্ষি ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন কলিকাতা হইতে এখানে চলিয়া আসিয়াছেন । আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে এখন তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ।

এই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী সভা গবর্ণর, কার্য্য নির্ব্বাহক কাউন্সিল এবং নির্ব্বাচিত সভ্যগণ মধ্য হইতে মনোনীত ভারতবাসী (যিনি মন্ত্রী নামে অভিহিত হইবেন) দ্বারা গঠিত হইবে। এবং কার্য্য নির্ব্বাহক কাউন্সেলে দুইজন সভ্য থাকিবেন, তন্মধ্যে একজন ভারতবাসী থাকিবেন, পূর্ব্বে যে Reserved Subjects বা রক্ষিত বিষয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহা গভর্ণর ও এই কার্য্য নির্ব্বাহক কাউন্সেলের হস্তে থাকিবে এবং Transferred Subjects অথবা অর্পিত বিষয়ের পরিচালনের ভার গভর্ণর ও মন্ত্রীর অধিকারে থাকিবে। এবং যদিও Reserved Subjects বা রক্ষিত বিষয়ের ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ মত প্রকাশ করিয়া তৎসম্বন্ধে কোনও ব্যয় না মঞ্জুর করিতে পারিবেন তথাপি গভর্ণরের ব্যবস্থাপক সভার সে নির্দ্দেশ অতিক্রম করিবার ক্ষমতা থাকিবে—যদি ঐ সকল বিষয়ের ব্যয় তাহার মতে অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু Transferred Subjects সম্বন্ধে তাহাদের মতামত অক্ষুন্ন থাকিবে—এবং আবশ্যক হইলে Transferred Subjects এর কোনও বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা টেক্স ধার্য্য করিতে পারিবেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কতগুলি অধিকার এই আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার দীর্ঘ তালিকা দিবার অবসর হইবে না।

যে সমুদয় Transferred Subjects বলিয়া গৃহীত হইল তাহার পরিচালনার ভার ভারতবাসী মন্ত্রীর প্রতিই অর্পিত হইল এবং তৎসম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতবাসীগণের পূর্ণ অধিকার থাকিবে। এবং প্রতি দশ বৎসর অন্তর একটী কমিশন নিযুক্ত হইবে, ঐ কমিশন অনুসন্ধান করিয়া Transferred Subjects বা অর্পিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে ভারতবাসী কিরূপ যোগ্যতা দেখাইয়াছেন তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবেন, এবং যদি তাহাদের অভিমত অনুকূল হয় তবে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের যে সমুদয় Reserved Subjects আছে তন্মধ্য হইতে আরও কয়েকটী বিষয় ভারতবাসীগণ কর্ত্তৃক পরিচালনার জন্য

Transferred Subjects বা অর্পিত বিষয় মধ্যে আনিয়া দেওয়া হইবে, এবং যদি কমিশনের মত অনুকূল না হয় তবে Transferred Subjects এর মধ্যে হইতে কতকগুলি ভারতবাসীর হস্ত হইতে লইয়া তাহা Reserved Subjects বলিয়া গণ্য করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। যদি ভারতবাসী যোগ্যতা দেখাইতে পারে তবে প্রতিদশ বৎসর অন্তর যে কমিশন বসিবে তাহার অনুকূল মত লাভ করিয়া ভারতবাসী প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের Reserved Subjects অবং বিষয়গুলি ক্রমে ক্রমে Transferred Subjects এর মধ্যে লাভ করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত অবং বিষয়ের পরিচালনার ভার নিজ হস্তে লইতে পারিবেন এবং এমন এক সময় আসিবে যখন Reserved Subjects বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না, সমুদয় বিষয়গুলিই Transferred Subjects এ পরিগণিত হইবে। ভদ্রমহোদয়গণ, বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কতক কতক বিষয়ের পরিচালনার ভার লাভ এবং ভবিষ্যতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অবং বিষয়েই পরিচালনাধিকারই ভারতবাসীগণের Responsible Government অথবা দায়িত্বযুক্ত শাসনাধিকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। যদি ভারতবাসী স্বার্থ, বিবাদ, বিসম্বাদ পরিহার করিয়া একাগ্রমনে স্বদেশের সেবার জন্য আমাদিগকে প্রদত্ত এই অধিকার পরিচালনা সম্বন্ধে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারেন, তবে ভারতের পূর্ণ স্বাধিকার লাভের সুযোগ উপস্থিত হইবে।

আপনারা সকলেই জানেন যে এবং আমিও পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ব্যবস্থাপক সভার বৃদ্ধি করা হইল এবং এই প্রসার বৃদ্ধির ফলে আমাদেরও ঐ সভার প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা মনোনীত সভ্য সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইবে। দিনাজপুর জেলা দুইজন সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার পাইয়াছেন, তন্মধ্যে একজন সভ্য মুসলমান ও অপর একজন সভ্য মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতির মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। যাঁহারা এই নির্ব্বাচন কার্য্যে অধিকার

লাভ করিবেন তাঁহাদের যোগ্যতাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা ইন্‌কমট্যাক্স দেন কিম্বা যাহারা অন্ততঃ ২৲ টাকা চৌকিদারী ট্যাক্স দেন কিম্বা যাঁহারা অন্ততঃ ১৲ টাকা পথকর পাবলিককর দেন কিম্বা যাঁহারা সৈনিক বিভাগে কাজ করিয়াছেন কিম্বা করিতেছেন তাঁহারাই নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করিবেন। কিন্তু কেহ একাধিক ভোট দিতে পারিবেন না।

বন্ধুগণ, শীঘ্রই দিনাজপুরে নির্ব্বাচনের সময় উপস্থিত হইতেছে, এবং এখন হইতেই ভোটের তালিকা প্রস্তুতের আয়োজন হইতেছে এবং গভর্ণমেণ্ট তজ্জন্য পঞ্চাইতগণের নিকট কাগজপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভারতের এই নূতন পরিচিত বিষয়টী সম্বন্ধে পল্লীগ্রামের লোকের মধ্যে অজ্ঞতা এত অধিক যে তাহারা কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে এবং তাহা কিরূপেই বা সম্পন্ন করিবে তাহার কোনও জ্ঞান তাহাদের নাই। এই সময় দিনাজপুর সভার প্রধান কার্য্য এই যে সভা শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া এই নূতন আইনের কার্য্য প্রণালী ও ভোটারগণের অধিকার বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান জন্মান এবং যাহাতে প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তির নাম ভোটারের তালিকায় সন্নিবিষ্ট হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, যে ভাবে এই আইন প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে এই আইনের বিধান অনুযায়ী যদি ভারতবাসী নিজ যোগ্যতা দেখাইতে পারে তবেই আমরা পূর্ণ আত্মাধিকার লাভ করিতে পারি; আর যদি আমাদের অযোগ্যতা প্রতিপাদন করি তবে আমরা যে অধিকারটুকু এখন পাইয়াছি তাহাও হারাইয়া আমাদের দেশের দারুণ দুর্ভাগ্য আনয়ন করিব। এই ভীষণ পরীক্ষা সময়ে আমাদের চেষ্টা আমাদের কার্য্য, স্বার্থ ও অভিমানের গণ্ডী যদি অতিক্রম না করি তবে আমরা কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইব? আমাদের এই নির্ব্বাচন সময়ে সর্ব্ব প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য এই হইবে যে আমরা যোগ্যতম ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিব,

যিনি জ্ঞানে ও চিন্তায় শ্রেষ্ঠ, যিনি নির্ভীকভাবে দেশের কল্যাণে নিবিষ্ট, যিনি স্বার্থের গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র মাতৃভূমির পূজায় আত্মত্যাগী, যিনি ভারতের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করিবার জন্য সচেষ্ট। এখনও কোনও সভ্যপদ প্রার্থী উপস্থিত হয়েন নাই, কিন্তু সকল দেশে যাহা হয় তাহা যে এই দেশে হইবে না এরূপ নহে। এই নির্ব্বাচনের সময় এরূপ অনেক লোক সভ্য প্রার্থী হইতে পারেন যাঁহারা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তা শ্রেষ্ঠ শক্তি মাতৃভূমির সেবার জন্য ব্যয় করিতে সমর্থ হইবেন না, এবং মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভের জন্যও অনেকে যে এ পদের প্রার্থী হইবেন তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদিগকে ধীর ও স্থিরভাবে এই দুঃসময়ে তরণী পরিচালন করিতে হইবে এবং আপনাদের নিকট এই ভিক্ষা, যে প্রকৃতরূপে মাতৃপূজার যোগ্যতম অধিকারী তাহাদিগকে আপনারা নির্ব্বাচন করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবেন।

সভ্য মহোদয়গণ, এই স্বাধিকারের যে অংশটুকু আমরা লাভ করিয়াছি তাহার সফলতার জন্য আমাদের কার্য্যকরী শক্তিকে এখন এক নূতন পথে চালনা করিতে হইবে। একথা আমাদের মধ্যে স্বীকার করিতে দোষ কি যে আমরা জনসাধারণের সঙ্গে পথ চলিতে অভ্যাস করি নাই। প্রতীচ্য শিক্ষার ঢেউ শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহার শিক্ষা—ইহার আলোক, ইহার আবর্ত্তন উচ্চ ও শিক্ষিত সমাজে আবদ্ধ। ভারতে ইতঃপূর্ব্বে জনসাধারণের স্থান যে সর্ব্ব নিম্নে ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে শিক্ষিত সমাজে যে পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে জনসাধারণ তাহা পারে নাই। চিরপ্রচলিত প্রথা চির আরামে চাষ আবাদ অথবা মজুরী দ্বারা কোনও রূপে উদরান্নের সংস্থান করিয়া ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সহিত কখনও কখনও যুদ্ধ করিয়া কখনও বা তাহাদের আক্রমণ মাত্র মৃত্যুতে বরণ করিয়া আপনার ক্ষীণ ও নিস্তেজ দেহে

মনুষ্য নাম মাত্র রক্ষা করিতেছে। কোথায় বা রাজনৈতিক সামাজিক বা অর্থ সমস্যার নূতন আন্দোলন কোথাই বা তাহার সমাধান? আপনাদিগকে তৎসমুদয় হইতে দূরে রাখিয়া তাহারা এই বিরাট ও বিপুল ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষ এই বিপুল জনসঙ্ঘ লইয়া নূতন পথে অগ্রসর হইবার জন্য আয়োজন করিতেছে। প্রশ্ন এই—এই অজ্ঞানতার বিপুল ভারবহন করিয়া ভারত কি অগ্রসর হইতে পারিবে? বন্ধুর ও কঠিন পথে কি দারুণ অন্ধতা নির্ম্মমভাবে গতি শক্তিকে রুদ্ধ করিয়া দিবে না? এই অজ্ঞানতার মাত্রা যে কিরূপ তাহা আপনারা সকলেই জানেন; আর তাহার বিস্তৃত উল্লেখ দ্বারা আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। গত সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের সমুদয় অধিবাসীগণের মধ্যে প্রতি হাজারে মাত্র ৫৯ জন লিখিতে পড়িতে পারে, ঐ সমুদয় লোক বন্ধুবান্ধবগণের নিকট পত্রাদি লিখিতে পারে ও তাহা পাঠ করিতে পারে। শুধু নাম লেখা দ্বারা যদি লেখাপড়া জানার পরিমাণ করা হয় তবে পুরুষ অধিবাসীগণের মধ্যে প্রতি হাজারে ১০৬ জন ও স্ত্রীলোকগণের মধ্যে প্রতি হাজারে ১০ জন পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্গদেশের লেখা পড়া জানা পুরুষের সংখ্যা প্রতি হাজারে ৭৭ জনের অধিক নহে এবং লেখা পড়া জানা স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজারে ১১ জন মাত্র।

এই বিরাট অজ্ঞানতায় সমস্ত দেশ জড় ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে; কেবল মাত্র উদরান্নের সংস্থানে সচেষ্ট হইয়া এই অগণিত লোক সমূহ মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ ও মানবের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধনের কোনও সুযোগ লাভ করিতে পারিতেছে না। পুরুষ মানুষ যে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইতেছে স্ত্রীলোকগণ তাহার বিন্দু মাত্র সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেছে না। সামান্য বর্ণপরিচয় মাত্র করিয়া যখন খেলা ও ধুলা ব্যতীত অন্যবিধ দায়িত্ব গ্রহণের তাহাদের কোনও শক্তি থাকে না, জীবনের সেই উষার মাতৃত্বের কঠোর

কর্ত্তব্য মস্তকে ধারণ করিয়া যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদের আনন্দ আরাম ও স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিয়া জীবন্মৃত্যু অথবা অকাল বার্দ্ধক্য বরণ করিয়া আপনাদের নারী লীলা শেষ করে। ভগবানের শ্রেষ্ঠদান আলো ও বাতাস তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। মানবের শ্রেষ্ঠ চিন্তা শ্রেষ্ঠ আকাঙ্খা তাহাদের পরিবর্জ্জনীয়। আপনাদের সঙ্কীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আপনাদের ক্ষুদ্র আয়োজন ও ক্ষুদ্র কামনার আত্ম বিক্রয় করিয়া তাহারা গৃহিনী নামের সার্থকতা সম্পাদন করে। আর ভারত এই দারুণ অজ্ঞানতার বেড়ী পায়ে লইয়া চলিতেছে-কোথায় কোন পথে?

আজ কোনও সামাজিক প্রশ্নের উত্থাপন করিবার কোনও অধিকার আমি দাবী করিতেছি না; কিন্তু এ কথা কিছুতেই ভুলিলে চলিবে না যে কতগুলি সামাজিক প্রশ্নের সমাধান না করিলে আমাদের গতির প্রতিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

এই বিপুল জনসমাজের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা বিস্তার হয় তাহার চেষ্টা আমাদের করিতেই হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিম্নস্তরে যাহারা বাস করিতেছে তাহাদিগকে উত্তোলিত করিতে হইবে। চির প্রচলিত কতগুলি আচার ও ব্যবহারমূলে আমরা এইরূপ সংস্কারাপন্ন হইয়াছি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিলে আমাদের অনেক বিষয়ের স্বার্থের হানি হইবে এরূপ ধারণাও যে কাহারও কাহারও নাই তাহা বলা যায় না। শিক্ষা সমাজের উচ্চস্তরে বহুকাল হইতে আবদ্ধ থাকায় নিম্ন শ্রেণীর লোকও তাহার স্পর্শ যতদূর পারে পরিহার করিবার চেষ্টা করে এবং অন্ধকারে অভ্যস্ত প্রাণীর ন্যায় এই আলোকের আভাও সহ্য করিতে পারে না। তাহার ফলে শিক্ষিত সমাজ দ্রুতবেগে যতই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে সন্তরণ কার্য্যে অশিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় ততই তাহারা সমাজকে বাধা দিয়া

গতি রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। যত রকম আতিশয্য যাহা কিছু অশান্তি-কর তাহা শিক্ষার অভাবেই হইতেছে। আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, সিপাহী বিদ্রোহের সময় অশিক্ষিত মুসলমানগণ জ্ঞানহীন হইয়া দেশে যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়া আলিগড় কলেজ স্থাপন করেন। আজ কাল ধর্ম্মাচরণ অথবা সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বিষয় লইয়া আমাদের দেশে যে আত্মকলহ আতিশয্য ও পরস্পরের প্রতি অত্যাচারের বৃত্তান্তে আমরা লজ্জিত হই ও আপনাদিগকে ধিক্কার দেই সেই সব ঘটনার কতটুকু অংশের জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় দায়ী? যে শিক্ষার অভাব আমাদের জনসাধারণের গতি ও দেশের গতি স্থবির করিয়া রাখিয়াছে সেই শিক্ষার অভাবই আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে অস্বাস্থ্যকর ও মৃত প্রায় করিয়া তুলিয়াছে। শাস্ত্রে স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী নামে অভিহিত করা হয়, আমাদের এই অংশকে নির্ম্মম ভাবে পঙ্গু করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনে অর্দ্ধাঙ্গ রোগের সৃষ্টি করিয়াছি। কোথায় সেই পারিবারিক শিক্ষা—কোথায় সেই জীবনের উষা কালে মাতার জীবনের সর্ব্বোচ্চ আশা ও আকাঙ্খার প্রেরণা যাহা মানসিক ও নৈতিক জীবনকে সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্য ও আনন্দ ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া সংসার ক্ষেত্রে ও কর্ম্মময় জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যে যোগ্য করিয়া দেয়—কোথায় যৌবনে ও প্রৌঢ়ে সহধর্ম্মিনীর নামের সার্থকতা, কোথায় বিপদে তাহার সাহায্য লাভ?

এই ভারতের, এই বঙ্গদেশের এই পাষাণ ভার দূর না করিতে পারিলে কিছুতেই ইহার উন্নতি নাই। তাই আজ অতি ব্যগ্রতা সহকারে এ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে যাহাতে শিক্ষার প্রসার লাভ হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং যাহাতে শিক্ষা অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক হয় তাহার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। যে

সকল আত্মত্যাগী মনস্বী আমাদের দেশের নিম্নস্তরের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতেছেন ও শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের অনুকরণযোগ্য; ভগবান্ তাঁহাদের সকল চেষ্টা, সকল পরিশ্রম সফল করুন, এই প্রার্থনা অন্তরের সহিত করিতেছি।

প্রিয় বন্ধুগণ, এই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আমাদের গতিশক্তি প্রচুর পরিমানে রুদ্ধ করিয়াছে কিন্তু মৃত্যু এই হতভাগ্য দেশে যে অত্যাচার করিতেছে তাহা যদি আমরা দূর না করিতে পারি তবে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যে ভাবে মৃত্যু আমাদের দেশকে গ্রাস করিতেছে তাহার কতক পরিচয় আমি গত সেন্সাস রিপোর্ট হইতে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। ১৯১১ পর্য্যন্ত দশবৎসরে বঙ্গদেশে পুরুষ জন্ম সংখ্যা প্রায় ৭২½ লক্ষ স্ত্রীলোকের জন্ম সংখ্যা প্রায় ৬৮ লক্ষ। মোট ন্যূনাধিক ১৪০½ লক্ষ। মৃত্যু সংখ্যা পুরুষ ৬৬ লক্ষের কিছু বেশী স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা প্রায় ৫৮ লক্ষ মোট ১২৪ লক্ষ। বঙ্গদেশের এই দশবৎসরের হিসাবে আপনারা নিশ্চয়ই বিচলিত হইয়াছেন কিন্তু আপনাদিগকে যদি আমি আরো ঘরের কাছে আসিয়া দিনাজপুর জেলার কয়েক মাসের জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব উপস্থিত করি তাহা হইলে আপনারা শঙ্কায় ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন। কলিকাতা গেজেটে যে সমুদয় হিসাব বাহির হইয়াছে তাহার কয়েকটী অঙ্ক আপনাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদের বঙ্গদেশে অকাল মৃত্যুর হার যে কত অধিক তাহাও একটু আপনাদিগকে শুনাইব। প্রত্যেক লক্ষ মৃত ব্যক্তির মধ্যে ৭১০০০ লোক ৩০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ভবলীলা সাঙ্গ করেন এবং ৮৫০০০ লোক ৪০ এর পূর্ব্বে এবং ৯৩০০০ লোক ৫০ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হন। ধরিতে গেলে মাত্র ৭০০৬ হাজার লোক ৫০ বৎসরের পরে মরিবার অধিকার পান। গত কয়েক মাসের কলিকাতা গেজেট হইতে যে সকল অঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছি তাহা এই—

(দিনাজপুর জেলা—)

	জন্ম	মৃত্যু	জ্বরে মৃত্যু
গত সেপ্টেম্বর মাসে	৪২২৯	৫৮০৫	৫৩০০
অক্টোবর————	৩৬৯৭	৫২৪৮	৪৮০৩
নবেম্বর ————	৬৪৮০	৭৮০৬	৬১৩২
ডিসেম্বর————	৬১৯১	১১৭৭৪	১০৭৬৭

এই ভয়াবহ মৃত্যু দূতের অবাধগতি ভঙ্গ না করিতে পারিলে এদেশ যে শ্মশানে পরিণত হইবে। তাই আজ আপনাদের নিকট করযোড়ে আমার বিশেষ প্রার্থনা যে প্রাণপাত করিয়া মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে এই দেশ হইতে তাড়াইবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হউন। এই ভীষণ মৃত্যুহার সঙ্কোচ করিতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ উপযুক্তরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচার করিতে হইবে।

বন্ধুগণ এই দেশের চিকিৎসা সঙ্কটের অভিজ্ঞান সকলেরই আছে কিন্তু পল্লীগ্রামে যে চিকিৎসার অভাব কি ভয়াবহ আকার ধারণ করে তাহা মনে করিলেও প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। দেশে উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসকের প্রধান অভাব। বঙ্গদেশে যে চিকিৎসক আছেন তাহাতে যে অনুপাত হয় তাহাতে দেখা যায় যে প্রতি ৪১০০০ লোকের জন্য একজন চিকিৎসক আছেন। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের কথা বলিব না কিন্তু যদি এই দিনাজপুর জেলার কথাই ধরা যায় তবে দেখা যাইবে যে দিনাজপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অথবা স্থানীয় জমিদারগণের স্থাপিত যে সকল ঔষধালয় আছে তৎব্যতীত বড় সহর ছাড়া পল্লীগ্রামে যে সকল ঔষধালয় আছে তাহার সংখ্যা নগণ্য। পল্লীগ্রামে ব্যাধিগ্রস্ত লোকের চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা একান্তই অসম্ভব। অতি বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ ব্যতীত দূর হইতে চিকিৎসক আনিবার ক্ষমতা

কাহারও নাই। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও জমিদারগণের স্থাপিত ডিসপেনসারীর সুযোগ মাত্র নিকটবর্ত্তী লোকেই পাইতে সমর্থ। উপযুক্তরূপ চিকিৎসার অভাবে এই জিলার অধিবাসীগণের সাহায্যের আশ্রয়ে পরমায়ু বিসর্জ্জন করিতে হইতেছে। চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে গ্রামে গ্রামে যাহাতে ঔষধাদির ব্যবস্থা করা হয় তৎসম্বন্ধেও আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। আজকাল চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার যথেষ্ট অন্তরায় ঘটিয়াছে, বঙ্গদেশে উপযুক্ত সংখ্যক উন্নত চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার কলেজ ও বিদ্যালয়ের অভাব। সৌভাগ্য ক্রমে কলিকাতায় একটী নূতন কলেজ ও বৰ্দ্ধমানে একটী নূতন স্কুল হওয়াতে দেশের কথঞ্চিৎ অভাব বিমোচন হইবে বটে এবং এই সকল স্থান ও অন্যান্য শিক্ষালয় হইতে যে সংখ্যক বিদ্যার্থী নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে তদ্দৃষ্টে ও দেশের অভাব স্মরণ করিয়া অন্ততঃ আমাদের প্রতি জেলায় অথবা দুই তিনটী জেলার কেন্দ্রস্থলে যাহাতে চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তজ্জন্য আমাদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইতেছে।

ভদ্র মহোদয়গণ, এই প্রসঙ্গে আমি আর একটী অতি আবশ্যকীয় বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হার যে কত অধিক তাহা আপনারা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শিশু মৃত্যুও প্রসূতীর স্বাস্থ্যহীনতা ও বহু সংখ্যায় তাহাদের মৃত্যুর কারণ উপযুক্ত ও শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব।

পল্লীগ্রামে যে সকল ধাত্রী পাওয়া যায় তাহাদের অসাবধানতায় ও অজ্ঞানতায় আমাদের দেশের কত শিশু ও প্রসূতী যে অকালে জীবলীলা সাঙ্গ করে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে রাইগঞ্জ মত স্থানেও উপযুক্ত ধাত্রী পাওয়া যায় না, যে শ্রেণীর স্ত্রীলোক এই কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহাদের বিভীষিকাময় আচরণ ও চিকিৎসা প্রণালী দেখিলে আমাদের নিজেদের শিক্ষা ও দীক্ষার উপর ধিক্কার উপস্থিত হয়।

দুর্ভাগ্য ক্রমে এই যে অতি আবশ্যকীয় এবং জীবন মৃত্যুর বিষয়ীভূত ব্যাপার, তাহার ভার কোনও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু কিম্বা মুসলমান গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন না এবং ধাত্রী কার্য্যে অন্ততঃ পল্লীগ্রামে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সম্মত হন না। অনেক বিষয়ে জাতিগত ঘৃণা দূরীভূত হইলেও শিক্ষিত হিন্দু কিম্বা মুসলমান ঘরের কেহ এই বৃত্তি অবলম্বন করেন না। এই বিশেষ অভাবটীর প্রতি আমাদের একরূপ দৃষ্টি নাই। গ্রামে গ্রামে শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব মোচন করিতে হইলে শিশু ও প্রসূতির মৃত্যুহার কমাইতে যে আমরা সমর্থ হইব তাহার সন্দেহ নাই। অশিক্ষিত ধাত্রীর অসাবধানতার যাহারা ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া কোন মতে প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহারাও দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। এই ধাত্রীর অভাব কিরূপে ভাবে মোচন হইতে পারে তাহাও স্থির করিবার জন্য আমি আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। প্রত্যেক জেলায় জেলায় স্ত্রীলোকদের জন্য যে সকল হাঁসপাতাল আছে তাহাতে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে কিনা এবং সম্ভব হইলে অতি শীঘ্রই তাহার বন্দোবস্ত করা আমাদের আবশ্যক হইয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই আপনাদের নিকট বলিয়াছি যে অকাল মৃত্যুর প্রতিরোধ করিতে হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি ও রোগের উৎপত্তি ও তাহার প্রতিকারের উপায় পল্লীগ্রামে প্রচার করা বিশেষ আবশ্যক। শিক্ষার অভাব ও তৎফলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ঔদাস্য অকাল মৃত্যুর অন্যতর কারণ। আমাদের দেশের জনসাধারণ কেন যাঁহারা একটু শিক্ষার অভিমান করেন তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশ লোক রোগের সময় বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন এবং যথাবিহিত সাবধানতা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করেন না। কতকটা আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর দোষ কতকটা স্বাস্থ্যরক্ষা নিয়ম ও রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা, কতকটা অবশ্য আমাদের সংস্কার ও সামাজিক প্রথাও দায়ী যে শিশুর জন্ম মাত্র গৃহস্থ ঘরে

আনন্দ ও উৎসবের কোলাহল পড়িয়া যায় এবং গৃহস্বামী দাতাকর্ণ হইয়া বসেন সেই শিশু ও তাহার মাতা তখন যে কি অবস্থায় থাকে তাহা মনে করিতেও প্রাণ অবসন্ন ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। যে সকল কদাচার আমাদের দৈনন্দিন আচার ব্যবহারের অঙ্গ হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইলেও আমাদের স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম ও তাহা উল্লঙ্ঘনের ফলাফল বহুভাবে গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে হইবে। এই জন্য সম্পূর্ণভাবে আমাদের গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিলে হইবে না। যাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায়ী তাঁহারা গ্রামে কথাচ্ছলে উপদেশ ইত্যাদি দিতে পারেন, যাঁহারা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারা এই সকল বিষয় প্রচার দ্বারা প্রভূত উপকার করিতে পারেন। কিন্তু আজ এই দিনে আমাদিগকে আর এক শ্রেণীর লোক প্রস্তুত করিতে হইবে যাঁহারা এই মহৎব্রত মস্তকে লইয়া ধর্ম্ম প্রচারের মত দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গিয়া এই মৃত সঞ্জীবনী সুধা বিতরণ করেন।

কিন্তু বন্ধুগণ, আমি বলিতে ভুলি নাই যে চিকিৎসার ব্যবস্থাই হউক আর ধাত্রী সম্বন্ধে সুব্যবস্থাই হউক অথবা দেশে স্বাস্থ্যবিধি পালনের নিয়ম প্রচারই হউক, পেটে যথোপযুক্ত অন্ন না পড়িলে আমরা যমদূতের কৃপা হইতে কিছুতেই উদ্ধার লাভ করিতে পারিব না। আজ অন্ন সমস্যা বঙ্গদেশের প্রধান সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির সন্তান অন্নের কাঙ্গাল হইয়াছে, আজ "জলাভাবে আকুল মোরা সিন্ধুকূলে রয়ে।" এই মহাযুদ্ধের সময় আমাদের নিরন্নতা ও নিঃসহায়তা সম্বন্ধে যে রূঢ়জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহা যদি আমরা ভুলিয়া যাই তবে মৃত্যু ভিন্ন আমাদের গতি নাই। লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্য দ্রব্য আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে এবং কৃষক অর্থ লোভে তাহা হস্তান্তরিত করিতেছে, মধ্যবিত্ত লোক এই দেশবাসী হইয়াও ক্রয় বিক্রয়ের বাজারে এই দেশ জাত খাদ্য দ্রব্যের দুর্মূল্যে অন্ধকার দেখিতেছে। বিদেশীয় ও ভারতের অন্যান্য লোক

আসিয়া আমাদের দেশে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইল দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসী পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তি ও উৎসাহ সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া চিরদাসত্ব বরণ করিয়া লইল। এই চাকুরীর মোহপাশ হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। জাতিগত কতকগুলি মান ও অপমানকে ব্যবসা করিবার অন্তরায় মনে করিয়া আমরা চিরগতানুগতিকের ন্যায় চাকুরীর সঙ্কীর্ণ পথে ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতেছি। এই মহাযুদ্ধের ফলে আমরা একটু সচেতন হইয়া উঠিয়াছি সত্য কিন্তু তাহাতে কি আমাদের কার্য্যকারী শক্তি জাগ্রত হইয়াছে? আমরা কি অন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য উঠিয়া পড়িয়াছি? এই মহাযুদ্ধ সময়ে ও তাহার অবসানেও আমাদের মাড়ওয়ারী বন্ধুগণ যাহা করিয়া লইলেন তাহা শিক্ষণীয়। সুদূর দেশ হইতে বঙ্গদেশে সামান্য সম্বল মাত্র আপনাদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা তো আমাদের চক্ষের সম্মুখে দিবারাত্র ভাসিতেছে এবং যে দেশ হইতে তাঁহারা এত অর্থ লইয়া যাইতেছেন সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকেরা বিশিষ্ট শিক্ষালাভ করিয়া ও অন্ন যো অন্নকরিয়া সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আপনাদের অমূল্য প্রতিভা ও শক্তি ও স্বাধীনতা বিক্রয় করিতেছেন। এই চাকুরীর মোহে আমাদিগকে যে কতদূর দুর্গতির মধ্যে আনয়ন করিয়াছে তাহার স্মরণও অত্যন্ত ক্লেশকর। কলিকাতার মত সহরের কথা ছাড়িয়া দেই, আজকাল সামান্য ২৫্ টাকা বেতনে পল্লীগ্রামে গ্রাজুয়েট পাওয়া অসম্ভব নহে। দেশের অভাব দিনে বাড়িয়া যাইতেছে, এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে তাঁহাদের জীবন সংগ্রাম কেন এত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে এই প্রশ্নটীর উত্তর অতি সহজ। বঙ্গদেশের যত শ্রেষ্ঠ শক্তি ও প্রতিভা তাহা সমুদয়ই অপব্যয়িত হইতেছে। যে মহাশক্তি অন্যভাবে চালিতে হইলে আজ দেশ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত যে শক্তি, আমাদের দেশের ধনবৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা ও কৃষি বিজ্ঞান সম্মত

উপায়ে উন্নতি কার্য্যে নিয়োগ করিলে বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত লোক নিরন্নতার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিত, হায় কি পরিতাপের বিষয় আজ সেই সকল শক্তিই হয় চাকুরী না হয় আইন ব্যবসায়ের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ক্ষীণ দীপশিখার ন্যায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া অন্ধকারকে আরও অন্ধকারময় করিতেছে। যে আইন ব্যবসায় লোকে অতি সম্মান ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পরিচালনা করিতেন, একথা অস্বীকার করিবার কারণ নাই যে জীবন সংগ্রামে প্রার্থীর সংখ্যাধিক্য বশতঃ সেই ব্যবসায়েই এক্ষণে আত্মমর্য্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ন রাখিয়া পরিচালনা করা অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এবং তৎফলে যে আমরা শুধু নিরন্নই হইতেছি তাহা নহে, আমাদের আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ায় যথার্থ পুরুষত্ব ও সম্মানের সহিত আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমান সময়ে য়ুনিভার্সিটীতে যে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে জীবন সংগ্রামে তাহা কিছুতেই কার্য্যোপযোগী হইতেছে না। য়ুনিভার্সিটী কমিশনের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে বিশেষজ্ঞগণ যে অভিমত দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে য়ুনিভার্সিটীর শিক্ষায় আমাদের সকল শক্তিরই অপচয় ঘটিতেছে, আমাদের যাবৎ চেষ্টা ও শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াসে ব্যয়িত হইতেছে। এবং যখন আমরা য়ুনিভার্সিটীর ডিগ্রীর মাকাল ফল লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই তখন আমরা দেখি যে আমাদের মন নিস্তেজ ও কার্য্যকরী শক্তি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ, আমাদের সমুদয় জাতীয় জীবনের এই মহাজাগরণের দিনে আমাদের সমুদয় রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই ঘোর অন্ন সমস্যার সময় আমাদের কল্পিত মান অভিমানের হিসাব নিকাশ করিয়া যাহাতে দেশে শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি শিক্ষার ও তাহার প্রচলনের ব্যবস্থা হয় তাহা করিতে হইবে। আমাদের আত্মজাগরণ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের কোনও শিক্ষা না থাকায় আমাদের চেষ্টা কোন্ দিকে পরিচালনা করিব তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। সুখের বিষয় যে

আমাদের দেশে অসংখ্য যৌথকারবারের সূচনা হইয়াছে এবং চারিদিকেই ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সমুদয় ব্যবসা বাণিজ্যে সফলতা লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক জাতীয় জীবনেও একটা শিক্ষানবিশী সময় আছে। সেই শিক্ষানবিশীতে কালক্ষেপন করিবার আবশ্যকতা আমরা মনে করিতেছি না। এই যে যৌথ কারবারের অসংখ্য মুকুলোদগম হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটা কুঁড়িতেই যে ফল ধরিবে এমন আশা করা দুরাশা। কিন্তু যদি তাহার কিয়দংশ ও ফলবান্ হয় তবে তাহাও আমাদের আনন্দের কারণ হইবে। আমাদের দেশে এক্ষণে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়াই আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে এক্ষণে আমাদের প্রত্যেক জেলায় জেলায় যাহাতে Technical Institution স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এবং প্রত্যেক হাই স্কুলের সঙ্গে যাহাতে কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা হয় তদ্বিষয়ে আমাদের উদ্যোগী হইতে হইবে। কুটীর শিল্পের দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। প্রত্যেক জেলা সমিতির নিজ নিজ জেলায় কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। প্রথমতঃ জেলায় বিভিন্ন স্থানে কোন্ কোন্ কুটীর শিল্পের প্রচলন আছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং সেই সমুদয় কুটীর শিল্পজাত জিনিস যাহাতে উন্নত উপায়ে করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহা বাজারে কিরূপে বিক্রয়োপযোগী করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইবে। আজকাল প্রত্যেক জেলায় জেলায় এবং অনেক বড় পল্লীগ্রামে অনেক যৌথ দোকান জন্মলাভ করিতেছে। এই সকল যৌথ দোকানে যাহাতে কুটীর শিল্পজাত জিনিসের প্রচলন হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে বোধ হয় বিশেষ কোনও কষ্ট হয় না। এই

দিনাজপুর জেলায় যে সমুদয় সুন্দর মোটা বোনছি চট কি অন্যান্য অনেক সুন্দর অথচ স্থায়ী জিনিস পল্লীতে পল্লীতে উৎপন্ন হয় তাহার কয়খানা আপনারা সহরের দোকানে দেখিতে পান ? যদি কাহারও আবশ্যক হয় তবে তাহাকে বন্ধুবান্ধবগণের দ্বারা পল্লীগ্রাম হইতে আনাইয়া লইতে হয়। বাজারে তাহাদের বিশেষ প্রচলন না থাকাতে উৎপন্ন জিনিসের সংখ্যাও কম। যদি সহরের বড় বড় দোকানগুলি প্রত্যেক জেলার উৎপন্ন জিনিসগুলি চালাইবার চেষ্টা করেন তবে দেশের বহুসংখ্যক কুটীর শিল্প যে অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারে তৎসম্বন্ধে কোনও দ্বিধা নাই। আমার মনে হয় এই দিনাজপুর জেলা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের সময় যদি তৎসম্বন্ধে একটী এই জেলার উৎপন্ন শিল্প ও কৃষিজাত জিনিসের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন তবে অনেকাংশে সফলতা লাভ করা যাইতে পারে।

বন্ধুগণ, বহুদিবস হইতে আমাদের দেশে বহুলোকের জন্ত একটী অসুবিধার বিষয় অবতারনা করিতেছি। আপনারা জানেন যে বঙ্গদেশে দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট জোত হস্তান্তরের অযোগ্য এবং বাস্তভূমি সম্বন্ধেও আমাদের স্বত্বাধিকার এত অনিশ্চিত যে তাহাতে আমাদের স্থায়ী স্বত্ব নাই ; আমাদিগের তাহা হইতে উচ্ছেদ করা সম্বন্ধে কোনও বাধা নাই। কোন ভাল জমি বিক্রয় করিয়াও বিক্রেতা আশানুরূপ মূল্য প্রাপ্ত হয় না। ক্রেতা জমিদার কর্তৃক উচ্ছেদের ভয়ে সামান্য মূল্য মাত্র প্রদান করেন এবং পরিশেষে জমিদারের কৃপা পাত্র হইয়া বহু অর্থ জমিদার সরকারে প্রদান করিতে হয়। বাস্তভূমিরও স্থায়ী কোন উন্নতি করিবার অধিকার নাই এবং যাহাদের বাস্ত আছে তাহারাও সামান্য দিনের নোটীশেই তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্ত বাধ্য হয়। জমিদারের স্বার্থ বজায় রাখিয়া যাহাতে দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট জোত হস্তান্তরের যোগ্য হয় এবং যাহাতে বাস্তভূমি হইতে উচ্ছেদ না হইতে পারে তজ্জন্ত গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ নানারূপ বাধা ও

বিষের জন্য তাহা প্রচলিত হইতে পারে নাই। এই দুই বিষয়ে আইন পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আমাদের এই নূতন ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে এবং আগামী নির্ব্বাচনের সময় যাঁহারা জনসাধারণের পক্ষে নির্ভীক ভাবে ও স্বার্থহীন হইয়া কাজ করিতে সমর্থ হইতে পারে সেইরূপ চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমরা এক মহাযুগের মহাসন্ধি স্থানে দণ্ডায়মান। এই সন্ধিস্থলে আমাদের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ ও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে হইবে। যাহাদিগকে বহুদিন ভুলিয়াছিলাম যাহারা আমাদের সঙ্গে এক পথে চলিতে পায় নাই-তাহাদিগকে টানিয়া তুলিতে হইবে, তাহাদিগকে ভারতের এক মহাগৌরবময় ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের জন্য আহ্বান করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে কৃষককুলের মধ্যে আমরা যাহাদিগকে অনুন্নত শ্রেণী বলি তাহাদের মধ্যে আমাদের শক্তি প্রেরণ করিতে হইবে; জ্ঞান বিতরণ করিয়া, সম্মান ও সভ্যতার আলোক দিয়া, মনুষ্যত্বের অন্ত তাহাদের যাহা জ্ঞান উদবুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে এই ভারতের মঙ্গল মন্দির গঠন করিতে হইবে। এই সাধনার মূল মন্ত্র প্রেম। এই প্রেমের সুধা দিয়া এই মৃতপ্রায় দেশকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের মান ও অভিমানের দোহাই দিয়া তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিলে কি এই দেশ উঠিতে পারিবে? প্রেমের সহিত শক্তি প্রতিষ্ঠা না করিলে আমাদের জাতীয় জীবন কি গঠন করিয়া তুলিতে পারিব?

আবার কি এ দেশ জাগিবে? আবার কি আমাদের মলিনা ছিন্নবসনা অবমানিতা মাতৃভূমিকে আমরা শোভা সম্পদ ও রাজশ্রী মণ্ডিত করিয়া জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারিবে? হে ভারতের নবকর্ম্মী নবীন তাপস তোমরা কি মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া এই প্রেমের মন্ত্রের আবাহনে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত করিতে পারিব? ভগীরথ যেমন মহা তপস্যা দ্বারা একদিন জাহ্নবীধারা প্রবাহিত করিয়া ভস্মস্তূপের মধ্য হইতে কোটী কোটী মানবের উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ আত্মত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কি তোমরা এই ভালবাসার সুধাধারা লইয়া ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে পল্লীতে পল্লীতে গোঠে গোঠে তাহা বিতরণ করিয়া ভারতকে সৌন্দর্য্যের অগণিত পত্রে পুষ্পে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবে না? আজ পূর্ব্ব দিগন্তে অরুণ আভা দেখা দিয়াছে, হে নবভারতের ভবিষ্যৎ সাধক " উত্তিষ্ঠত

জাগ্রত"। ঐ অরুণ রাগের পবিত্র ধারায় স্নাত হইয়া আনন্দের বার্ত্তা দিক্ দিগন্তে প্রচার করিয়া এই মুগ্ধ ও নিদ্রিত ভারতকে জাগাও; কর্ম্মের রুদ্ধ স্রোতধারা খুলিয়া দিয়া ভারতের ধমনী পরিপূর্ণ করিয়া ইহাকে বলিষ্ঠ ও সজীব শক্তি প্রদান কর। তোমাদের নবীন মুখের দিকে তাকাইয়া, তোমাদের আশা ও আকাঙ্খার আনন্দ কোলাহল শ্রবণ করিয়া ভারতের যে ক্ষীণ দেহলতায় উৎসাহের ও জীবনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। আজ কি তাহার সমুদয় আশা ও ভরসা নির্ব্বাপিত হইবে? হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া গভীর ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়া বলিতেছে, "না—না—এবার আমাদের সাধন বিফল হবে না। আজ আমরা সত্য সত্যই জাগিয়াছি"। তবে এস—এস বহ্নির মত ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠ বিদ্যুতের ন্যায় শক্তি সঞ্চার কর—উন্মুক্ত পবনের ন্যায় হুঙ্কার করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া পড়। তোমাদের সাধনায়, তোমাদের কর্ম্মে, তোমাদের প্রেমে এই ভারতের শতকোটী মানব জ্ঞানে গরীয়ান, তেজে উজ্জ্বল এবং ভক্তিতে পবিত্র হইয়া জগতের বক্ষে ভারতের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন স্থাপন করুক। আর তোমরাও এস, বঙ্গের ভবিষ্যত বংশের জননী ও ভগিনী সকল, এই প্রসন্ন প্রভাতে তোমরা আমাদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও। বহুদিন তোমাদিগকে আমরা অনাদর করিয়া দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছি; বহুদিন ধরিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। আমাদের হৃদয়ে তোমরা শক্তি সঞ্চার কর। তোমাদের ভক্তি, তোমাদের অনাবিল হৃদয়ের অপূর্ব্ব পবিত্রতা, তোমাদের স্বার্থত্যাগ, তোমাদের সেবাব্রত আজ ভারতের গৃহে গৃহে প্রাণে প্রাণে সঞ্চার করিয়া আমাদিগকে এই মহৎ ব্রত সাধনার উপযোগী করিয়া গঠন কর।

আর যিনি সর্ব্বকাল ধরিয়া জগতের উত্থান পতনের নিয়ন্তা, যিনি কখনও প্রেমের সাধনা জগতে ব্যর্থ হইতে দেন না, তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে পাষাণ ফাটিয়া মন্দাকিনী উৎসারিত হউক; এই মরুভূমি শ্যামল হউক। উঠুক, আর আমাদের এই অনাদৃতা মাতা সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হউন।

বন্দেমাতরম্